Presented to the Bagbazar Reading Library by the author

D N Basu

24. 9. 30

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী

(হিমালয়ে উপরোক্ত স্থানদ্বয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

কলিকাতা

সন ১৩৩০ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা।

PRINTED AND PUBLISHED BY S. B. CHAKRAVERTTY,

AT THE

TEMPLE PRESS,

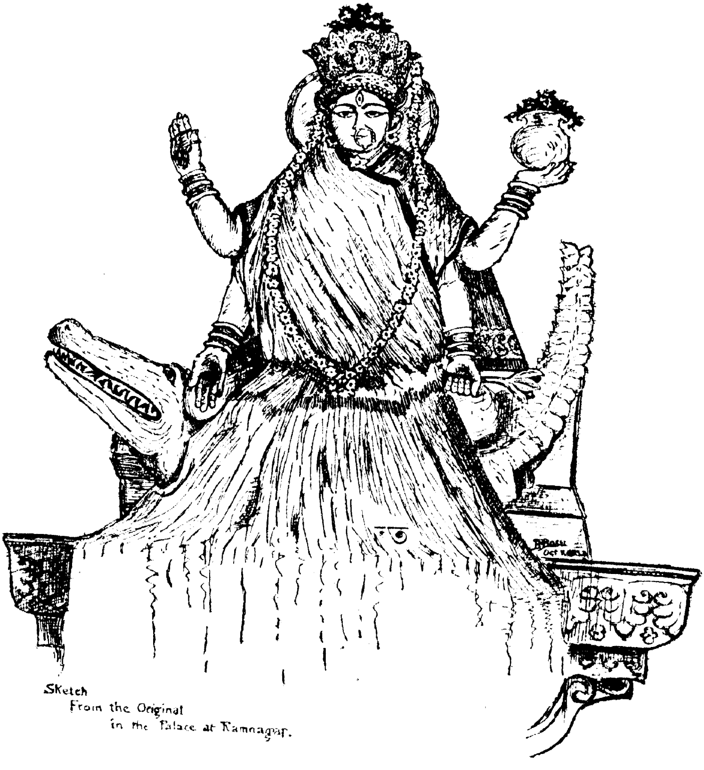
2, Lyons Range, Calcutta.

সূচীপত্র।

চিত্রের সূচী।

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী

(হিমালয়ে উপরোক্ত স্থানদ্বয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত)



"পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে"

ভূমিকা

ইংরাজী ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে আমি কয়েক জন বন্ধু ও আত্মীয়ের সহিত গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী বেড়াইয়া আসিয়া ভাবিয়াছিলাম যেন কোন অদ্ভুৎ কাজ করিয়াছি। নিজের মনে এরূপ ভাবিয়াই সন্তুষ্ট হই নাই আর পাঁচ জনের নিকট আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশংসা লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; সেটা বোধ হয় মানুষের স্বভাব। বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন সকলের নিকট কিছুদিন ক্রমান্বয়ে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর গল্প করিয়াছিলাম, তাঁহারা গল্প ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই হউক কিম্বা ভদ্রতার খাতিরেই হউক মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের নিকট একবারের অধিক গল্প করি নাই তাঁহারা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ও ঐ সকল স্থানে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমারও মনে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথে কি দেখিয়াছি তাহার একটি বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই

পথে ভ্রমণকালে আমি দৈনিক ঘটনা একটি ডায়ারীতে লিখিয়া ছিলাম। এই ডায়ারী অবলম্বন করিয়া বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দ বৰ্দ্ধনের জন্যই এই বিবরণ লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, উত্তরকাশী প্রভৃতি হিন্দুদিগের কতকগুলি প্রধান তীর্থ স্থান। এ সকল স্থানের বিবরণ ও তথায় যাইবার উপায় বাঙ্গালা দেশের অতি অল্প লোকই জানেন। এই সকল তীর্থস্থান হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে হওয়ায় তথাকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম ও জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। অবকাশের সময় বেড়াইতে যাইবার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। পাহাড়ে যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার জলন্ত আদর্শ দেখিতে যান অথবা পাশ্চাত্য বিলাসের মদিরায় আকৃষ্ট হন এ সকল স্থান তাঁহাদের আকর্ষণ করিবে কিনা জানিনা; তবে যাঁহারা পাহাড়ের পর পাহাড়ের গম্ভীর ও নগ্ন সৌন্দর্য্যে মগ্ন হন, যাঁহারা বিশাল দেবদারু শ্রেণীর নিস্তব্ধ মহিমায় আকৃষ্ট হন, যাঁহারা বেগবতী নির্ঝরিণী ও গিরি নদীর উদ্দাম নৃত্য ও সঙ্গীতে মোহিত হন তাঁহারা অল্প আয়াসে ও অপেক্ষাকৃত কম খরচায় এই সকল স্থান দেখিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন। তবে পদদ্বয় শরীর বহনে অপটু

হইবার আগেই এ সকল স্থানে যাওয়াই প্রশস্ত। আমাদের গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী ভ্রমণের বিবরণ পাঠ করিয়া যদি কেহ ঐ সকল স্থানে যাইতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আমার এই বিবরণ লিখার পরিশ্রম স্বার্থক মনে করিব। এই বিবরণে আমার ডায়ারী হইতে দিনের পর দিন যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছি, যদি কেহ ইহাতে রোমান্স বা গল্প খোঁজেন তবে তিনি বিফল মনোরথ হইবেন। যাঁহারা এই পথে যাইতে চান তাঁহাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সর্ভে ডিপার্টমেণ্ট হইতে একটী ম্যাপ্ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম। মুসূরী হইতে হিমালয়ের যে সকল তুষারময় চূড়া দেখা যায় তাহারও একটি ম্যাপ্ এই পুস্তকে দিলাম। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দেখিয়া আসিবার পরই এই বিবরণটি লিখিয়াছিলাম, বিবরণ সে সময় যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহাই প্রকাশ করিলাম।

গঙ্গোত্তরী যাইবার কথাবার্ত্তার সূচনা ও গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী সম্বন্ধে খোঁজ খবর।

কলিকাতা হাইকোর্টের পূজার অবকাশ অতি প্রশস্ত। ছুটি হইলে কোথাও বেড়াইতে যাওয়া একটা প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। আদালত বন্ধের পূর্ব্ব হইতেই সকলের মুখে একই প্রশ্ন "এবার কোথা যাচ্চ"। ইংরাজী ১৯১৪ সালে ছুটি হইবার পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি নাই কেননা মতলবের কিছুই স্থির ছিল না। তবে হিমালয় পর্ব্বতে চলা রাস্তায় বেড়াইতে যাইব এইরূপ মনস্থ কিছু দিন হইল করিয়াছিলাম। ছুটিতে পাহাড়ে গিয়া ত্রিসন্ধ্যা কেবল উদরের পূজা করা ও ব্রীজ্ খেলা যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল, আর এ মতলবের সূত্রপাত প্রায় বৎসরাবধি হইয়াছিল। ইংরাজী ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে আমরা কয়েক জন মিলিয়া শিমলা শৈলে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমার বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র বসুর সহিত দেখা হয়। তিনি শিমলার

নিকট "তারাদেবী" বলিয়া যে একটি পাহাড় আছে সেখানে থাকিতেন, কখনও কখনও শিমলায়ও আসিয়া থাকিতেন। সেই পাহাড়ের মাথায় "তারা দেবীর" এক মন্দির থাকাতে সে পাহাড়ের নাম "তারাদেবী"। একদিন তিনি আমাদের "তারা দেবী" যাইবার নিমন্ত্রণ করিলে আমরা সদলবলে সেখানে উপস্থিত হইলাম। "তারাদেবী" নামে কাল্‌কা-সিমলা রেলওয়ে একটি ষ্টেশন আছে। "তারাদেবীর" মন্দির সেই ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে পাহাড়ের উপর। এই তিন মাইলের মধ্যে এক মাইল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, ক্রমাগতঃ চড়াই ও রাস্তায় ভাঙ্গা পাথর অনেক পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার পর রাস্তাটি পাহাড়ের ধার দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, রাস্তার ধারে ফুল ফারণ্‌ লতা পাতা অতি সুন্দর। "তারাদেবীর" সেই সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা দেখিয়া পাহাড়ে পায়ে চলিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রথম মনে হইয়াছিল। এ রাস্তা শিমলা ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি হিল্‌ ষ্টেশনের রাস্তার মত নহে। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নাই, পাহাড়ে ভ্রমণকারী ফ্যাশানেবল নর নারীর ভিড় নাই, চতুর্দ্দিকে ইউরোপীয়দের উপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ দোকান নাই। ইহা নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, কখন কখন সুমিষ্ট পাখির স্বর শোনা যায় কিন্তু পাখিটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, চতুর্দ্দিকেই নূতন

ফুল পাতা গুল্ম দ্বারা পাহাড়ের গা ঢাকা, কোথাও একটি ঝরণার নির্ম্মল জল পাহাড়ের গা বহিয়া নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ রাস্তা দেখিয়া পাহাড়ী রাস্তায় বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেমন ইচ্ছা হইল তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলাম। সেই বৎসরই শিমলা হইতে পাহাড়ী রাস্তা দিয়া চলিয়া "চাক্রাতা" হইয়া মুসূরী যাওয়া মনস্থ করিলাম। এই রাস্তা প্রায় ১৪০ মাইল লম্বা মধ্যে মধ্যে ফরেষ্ট বাংলা আছে কিন্তু খাইবার ও অপরাপর ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র সবই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। তখন প্রায় অক্টোবর মাস শেষ হইয়াছে, আমার সেবারকার সিমলার সঙ্গীরা কেহই আমার সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন না বরং সকলে মিলিয়া না যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, এমন কি একজনের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া একটু বচসাও হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "গোঁয়ার্ত্তমী করিয়া জীবনটাকে বিপদগ্রস্ত করা বিশেষ কিছু বাহাদুরী নহে"। আমি কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিলাম আমার সঙ্গী ও উৎসাহদাতা পূর্ব্বোক্ত সতীশ বাবু। অবশেষে স্থির হইল যে দিন আমার অপর সঙ্গীরা নীচে অর্থাৎ দেশে ফিরিবেন আমি ও সতীশবাবু তারপর দিন পাহাড়ী পথে সিমলা হইতে মুসূরী যাত্রা করিব। সঙ্গীদের

যাইবার দিন আসিল তাঁহাদের সহিত ষ্টেশনে যাইতে পথে সতীশের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার পায়ে নূতন নাগরা জুতা, পাহাড়ে চলিবার জন্য তিনি পাম্প ছাড়িয়া "নাগরা" কিনিয়াছিলেন, কিন্তু মুখ অতি শুষ্ক ও তাহাতে কষ্টের রেখা অঙ্কিত, একটি পা যেন কষ্টে টানিয়া চলিতেছেন। তিনি বলিলেন "আমি বাসায় গিয়া অপেক্ষা করিতেছি তুমি উহাঁদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া এস"। তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া আমার উৎসাহ কিছু কমিল কিন্তু সঙ্গীদিগকে সে কথা জানিতে না দিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি সতীশচন্দ্র একটি কোচে শয়ান কম্বলে আপাদ মস্তক আবৃত, নিকটে পরিত্যক্ত "নাগরা" বিদ্যমান গায়ে হাত দিয়া জ্বর অনুভব করিলাম। তিনি তখনও যাইবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার পদদ্বয়, নূতন "নাগরা" ও পার্ব্বতীয় পথ এই তিনটিতে বিরোধ বাঁধিয়া যুদ্ধে বঙ্গীয় পদ যুগলেরই পরাভব হইয়াছে, ফলে পায়ে ফোস্কা গলিয়া বিষম ঘা হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহার পাহাড়ী পথে চলিয়া যাওয়া অসম্ভব, রাত্রে আবার মেঘ করিয়া *"বজ্‌রী" আরম্ভ হইল। অতএব সেবারকারমত হিমালয়ে পদব্রজে যাত্রা স্থগিত রহিল।

* বৃষ্টি জমিয়া দানা দানা বরফ হইয়া পড়িলে তাহাকে পাহাড়ীরা বজরী বলে।

এবার অবকাশে আবার হিমালয় ভ্রমণের কথা উঠিল। আমার কনিষ্ঠ শৈলেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইলেন, ক্রমে আমার পিতৃব্য পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আমাদের বন্ধু ফণীন্দ্রলাল দে দলে জুটিলেন। গত বৎসরে পূর্ব্বোক্ত সতীশ বাবুর আগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকেও সংবাদ দেওয়া গেল, তিনিও বর্দ্ধমান জেলা হইতে উপস্থিত হইলেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহার শরীর কিছু কৃষ ও ক্ষীণ দেখিলাম। চেহারা দেখিয়া মনে হইল যে পদব্রজে হিমালয় পরিভ্রমণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু তিনি কিছুতেই হটিবার লোক নহেন, বলিলেন "বরং হিমালয়ের বিশুদ্ধ বাতাসে আমার ম্যালেরিয়া সারিয়া যাইবে"।

কিঞ্চিৎ গবেষণার পর গঙ্গোত্তরী যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু গঙ্গোত্তরী গঙ্গার উৎপত্তি স্থান বলিয়াই জানা ছিল, সেখানে কোন রাস্তায় যাইতে হইবে তাহার সন্ধান কিছু জানা ছিলনা। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা গোমুখাকৃতি শিলার অভ্যন্তর হইতে বেগে বহির্গত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিতা, হরিদ্বারের ঊর্দ্ধে গঙ্গাকে আর দেখা যায় না। বাল্যকালের সে ধারণা একাল পর্য্যন্ত ছিল। ইংরাজী ১৯১১ সালে মুসূরী হইতে ফিরিবার পথে হরিদ্বার ও হৃষীকেশ দেখিয়া সে ধারণা যায়।

মুসূরীতে অবস্থানকালীন দূরে এক পর্ব্বতের তুষারাবৃত চূড়া দেখাইয়া কেহ বলিয়াছিল "ঐ গঙ্গোত্তরী"। সে ভুল বলিয়াছিল, কেন না মুসূরী হইতে গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের চূড়া ঠিক দেখা যায় না; যাহা হউক সে সময় যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে ধারণা হইয়াছিল যে কচিৎ কখনও সাধু সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত অপর লোক সে স্থানে যাইতে পারে না। মুসূরী হইতে ফিরিবার পথে হরিদ্বারে বাল্যকালের কল্পনার গোমুখ দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। সেখানে প্রথম শুনিলাম যে আসল গোমুখ হরিদ্বার হইতে প্রায় ২০০ শত মাইল পথ।

কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইলাম। "গাইড্ টু মুসূরী" (Guide to Mussoorie Mafasalite Printing Works Re 1/–) এই পুস্তকে গঙ্গোত্তরী যাইবার একটি পথের বিবরণ আছে। এই পথে সাহেবেরা শীকার করিতে যান। "উত্তরাখণ্ড পরিক্রম" শ্রীসারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কৃত, ৩৯নং স্কট্স লেন হইতে শ্রীসুধাংশু প্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ১৩১৯ সালে প্রকাশিত, মূল্য ১॥০ টাকা। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং গঙ্গোত্তরী গিয়াছিলেন। আমরা এই পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম। তিনি যে পথে গিয়াছিলেন আমরাও প্রায় সেই পথই অবলম্বন

করিয়াছিলাম। সেইজন্য তাঁহার এই পুস্তক আমাদের সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। তিনি যমুনোত্তরী ও গোমুখ যান নাই সেই জন্য এই দুই স্থানের বিবরণ যাহা তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত আছে তাহা সব ঠিক নহে। আর এক কথা, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অভাব অল্পই ছিল। যাঁহারা পূজার অবকাশে বেড়াইতে যাইতে চান তাঁহাদের সব খবর এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা সারভেয়ার জেনারেল অফিস্ হইতে আমরা একখানি ম্যাপ্ আনিয়াছিলাম তাহাতে গঙ্গোত্তরী দেখান আছে কিন্তু তাহা হইতে পথের বিশেষ কোন খবর পাই নাই! এ পুস্তকে যে ম্যাপ্ সন্নিবেশিত হইল তাহা অনেক পরে পাইয়াছি। আমরা বিখ্যাত হিমালয় পর্য্যটক জলধর সেন মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। ইনি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গোত্তরী গিয়াছিলেন। সে পথের কথা তাঁহার স্পষ্ট মনে ছিল না। উপরি উক্ত পুস্তক ইত্যাদি হইতে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথের যাহা সন্ধান পাইলাম তাহাই সম্বল করিয়া মুসূরী হইয়া যাওয়াই স্থির হইল।

যমুনোত্তরী

মুস্সূরীর পথে।

২৪শে ও ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

আমার ভ্রাতা শৈলেন্দ্রনাথ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ তারিখে মুসূরী যাত্রা করিলেন। স্থির হইল তিনি দুই দিবস আগে গিয়া কুলীর বন্দোবস্ত করিবেন ও অপরাপর বিষয়ে সন্ধান করিবেন। বক্রী দল ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুসূরী যাত্রা করিল। সতীশ বাবু দিনের গাড়ীতে গেলেন, উদ্দেশ্য লাক্‌নউ সহরে তাঁহার ভ্রাতা অ্যাসিস্‌টাণ্ট সার্জ্জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার আমাদের সঙ্গে জুটিবেন। আমি ফণী ও সত্যেন রাত্রে বম্বে মেলে যাত্রা করিলাম। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বার্থ রিজার্ভ করিয়া ছিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম ফণী ও সত্যেনকে এক গাড়ীতে দিয়াছে ও আমাকে অপর এক গাড়ীতে দিয়াছে। সকলেরই বার্থ উপরের বাঙ্কে পড়িয়াছে। নীচে যাহাদের বার্থ তাহারা বোধ হয় সকলেই আমাদের পূর্ব্বে বার্থ রিজার্ভ করিয়াছিলেন। রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়ম আগে যাহারা বার্থের জন্য দরখাস্ত করিবে তাহারা নীচের বার্থ পাইবে, কিন্তু এই নিয়ম সব সময় খাটে না, এমন দেখা গিয়াছে

যে সাহেবেরা পরে দরখাস্ত করিয়াও প্রায়ই নীচের বার্থ পান। আরও শুনা যায় যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মন স্তুষ্টি করিতে পারিলেও ভাল বার্থ পাওয়া যায়। ফণী ও সত্যেনের গাড়ীতে নীচের দুই বেঞ্চ্ একজন মিষ্টার দাঁর নামে রিজার্ভ ছিল। তৃতীয় বেঞ্চে একজন মিষ্টার মুখার্জ্জি অধিষ্ঠান ছিলেন। তাঁহার সহিত অল্প আলাপ হইলে বলিলেন যে তিনি রয়েল মেরীণ ডক্‌সে ওভারসিয়ারের কাজ করেন। লোকটি বেশ চট্‌পটে ও কথা বার্ত্তা ফিরিঙ্গিদের মত, বোধহয় তাঁহার কাজে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে খুব মেশামেশি করিতে হয় *। আমার গাড়ীতে অপর সব বার্থে সাহেব ও মেমেরা ছিলেন। ইহার মধ্যে একজন সাহেবের সঙ্গে আমার অল্প পরিচয়ও ছিল। তাঁহারা কিন্তু সে গাড়ীতে আমায় যাইতে দেখিয়া যেন একটু সঙ্কুচিত হইলেন। আমার সাহেবী কাপড় পরা ছিল তাহাতেই সঙ্কোচের ভাব দেশী কাপড় পরা থাকিলে হয়ত উদ্ধত ভাব দেখিতাম। এদেশে আসিয়া সাহেবেরা "প্রেষ্টিজ্" বলিয়া একটা জিনিস শিক্ষা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে দেশী লোকের

* কিছুদিন আগে আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা ফিরিঙ্গিদের চাল চলন অনুকরণ করিতে পারিলে আপনাদের ধন্য মনে করিতেন ও অপরের চক্ষেও ধন্য হইতেন। শুনিয়াছি নাকি বাঙ্গালা পার্টিসানের পর হইতে আমাদের চাল চলন সব খাঁটি দিশি হইয়াছে, কিন্তু দেখিতেছি "যথা পূর্ব্বং তথা পরং"।

সহিত নিঃসঙ্কোচে মিশিলে এই "প্রেষ্টিজ্" নষ্ট হয়। আমরাও অনেক সময় ভুল বুঝি, সাহেব দেখিলেই আগেই স্থির করিয়া বসি যে আমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করিবেন না। উভয় জাতীর ভুলের জন্যই অনেক সময় একটা বিদ্বেষের ভাব আসিয়া পড়ে। সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি ও আমরা প্রায় সব সময়েই হটিয়া যাই কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিতে পারি যে রাজার জাতি বলিয়া আমাদের উপর একটা জুলুম হইল, ও বিদ্বেষের ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। এ বিষয়ে সাহেবদেরই দোষ বেশী। দেশী লোকে সাহেবদের উদ্ধত ভাবেই বিশেষ অভ্যস্থ, সেইজন্য সাহেব দেখিলেই সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু সাহেবেরা দেশী লোকের নিকট ভদ্র ব্যবহারই পাইয়া থাকেন। আমরা সাহেবের সঙ্গে দুটা কথা কহিতে পারিলেই ও তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই যেন আপ্যায়িত হই। এ জন্য ইচ্ছা থাকিলে আমাদের সহিত আলাপ পরিচয় করা সাহেবদের পক্ষে অতি সহজ, কিন্তু প্রেষ্টিজ্ যাওয়ার ভয়ে তাঁহারা সেটুকুও করেন না। আমার গাড়ীতে জিনিষ পত্র রাখিয়া ফণা ও সত্যেনের গাড়ীর নিকট আসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। তাহাদের গাড়ীতে যে মিষ্টার দাঁর কথা বলিয়াছি তাঁহার তখনও দেখা পাওয়া গেল না। আমাদের ইচ্ছা যদি মিষ্টার দাঁ না আসেন ত তাঁহার জন্য যে

দুইটা নীচের বার্থ আছে আমরাই অধিকার করিব ও আমি তাহা হইলে সাহেবদের গাড়ী ছাড়িয়া এই গাড়ীতেই আসিব। কিন্তু ট্রেণ যতক্ষণ না ছাড়ে মিষ্টার দাঁর আসিবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার স্থানটি অধিকার করিতে পারিতে ছিলাম না। সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল মিষ্টার দাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন হয়ত তাঁহার বাড়ীতে হঠাৎ কেহ পীড়িত হইয়াছে, কেহ বলিলেন রাস্তায় আসিতে হয়ত ঘোড়া ক্ষেপিয়াছে কিম্বা গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের মনে ক্রমে আশা বলবতী হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল যে কোন কারণে হউক মিষ্টার দাঁ আর উপস্থিত হইবেন না। কিন্তু কোন অপরিচিত ভদ্র বাঙ্গালীকে প্ল্যাট্‌ফরম্ দিয়া ত্রস্তভাবে আসিতে দেখিলেই মনে হইল ঐ বুঝি মিষ্টার দাঁ আসিতেছেন, আবার তিনি সেই গাড়ী পার হইয়া গেলে আশ্বস্ত হইলাম। এইরূপে আশা ও আশঙ্কার মধ্যে গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রায় উপস্থিত হইল, আর দুই মিনিট বাকী, আমি সাহেবদের গাড়ী হইতে আমার বিছানা লইয়া আসিলাম, অপর জিনিষ সেই গাড়ীতেই রহিল, সাহেবদের বলিয়া আসিলাম। তাঁহারা আমি চলিয়া আসাতে বেশ খুসী হইলেন ও বলিলেন "আপনার জিনিসের জন্য কোন ভাবনা

নাই। অপর গাড়ীতে আসিয়া উঠিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমি একটি নীচের বেঞ্চ আশ্রয় করিলাম মনে করিলাম নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইব কিন্তু তাহা হইল না। রেলওয়ে কোম্পানী ভাড়া লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন তাঁহারা যাত্রীদের রক্ত শোষণেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শুইতে না শুইতেই রক্ত শোষক ছারপোকার দল আক্রমণ করিল অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত অসমান যুদ্ধ করিলাম। কতকগুলিকে ধরিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিলাম কিন্তু, "একা রামে কি করিবে" শত্রু অসংখ্য, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলাম, সৌভাগ্য ক্রমে নিদ্রাদেবী আসিয়া সংজ্ঞা হরণ করিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা ১১টার সময় গাড়ী মোগল সরাই পৌঁছিল। মোগল সরাই ছাড়াইয়া কিছু পরেই কাশী। পুলের উপর হইতে কাশীর শোভা অতি মনোহর। নদী এস্থলে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সমস্ত বারানসী পুলের উপর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। কাশী সৌধ মালায় পরিপূর্ণ। অসংখ্য মন্দিরের চূড়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেণীমাধবের ধ্বজা আপনার পৃথক অস্তিত্ব জাহির করিতেছে। নদীর ধারে যতদূর চক্ষু যায় ঘাটের পর ঘাট ; নিকটের ঘাটে দেখা গেল অসংখ্য নরনারী গঙ্গা জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইতেছে অন্ততঃ সেই

বিশ্বাসে স্নান করিতেছে। কিন্তু আমরা আজ এ কাশী দেখিয়াই সন্তুষ্ট নয়, গঙ্গোত্তরীর পথে "উত্তর কাশী" বলিয়া এক স্থান আছে, আমরা আজ সেই পথের পথিক। বেলা ৫টার সময় লাক্‌নাউ পৌঁছিলাম, ষ্টেশনে উপস্থিত শ্রীসতীশচন্দ্র বসু। তিনি ইতিমধ্যে লাক্‌নাউ আসিয়া ভ্রাতার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন ও সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। সেদিন রাত্রে আর রেলওয়ে কোম্পানীর ডাইনিং কারে শুষ্ক মাংস খাইতে হইল না। ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে ডেরাডুন্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ডেরাডুন ও মুস্সূরী।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ডেরাডুন হইতে মুসূরী যাইতে হইলে পর্ব্বতের তলস্থ রাজপুর নামক জায়গা হইয়া যাইতে হয়। এই স্থান হইতেই চড়াই আরম্ভ ও প্রায় ৮ মাইল চড়াই পার হইয়া মুসূরী পেঁছান যায়। ডেরাডুন হইতে রাজপুর প্রায় ৭ মাইল। এই ৭ মাইল, লম্বা এক অতি প্রশস্ত ও সুন্দর রাস্তা আছে, টঙ্গা করিয়া যাইতে হয়, এক ঘণ্টার কিছু উপর সময় লাগে। রাজপুরে ৫।৬টি হোটেল আছে। সেই সব হোটেল হইতেই মুসূরী যাইবার জন্য কুলী, ডাণ্ডি ইত্যাদি সকল জিনিসেরই বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের লোক ডেরাডুন ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে, ট্রেণ আসিলেই তাহারা যাত্রীদিগকে আপন আপন হোটেলে লইয়া যাবার জন্য ব্যস্ত হয়। আমরা ডেরাডুনে গাড়ী হইতে নামিতেই "ক্যালিডোনিয়া" হোটেলের একটি লোক শৈলেনের কার্ড আমাদের দেখাইয়া বলিল 'তিনি আমাদের হোটেলেই উঠিয়া ছিলেন ও আপনারা যে আসিতেছেন সে কথা আমাকে বলিয়া

গিয়াছেন, আপনারা "ক্যালিডোনিয়া" হোটেলে চলুন। কোন একটা হোটেলে যাইতেই হইবে, অতএব আমরা তাহার প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিলাম। একটা টঙ্গাতে আমি, সত্যেন ও ফণী সওয়ার হইলাম। টঙ্গার দুই চাকার উপর যে মড্‌গার্ড থাকে তাহার উপর আমাদের বিছানা ও বাক্স দড়ী দিয়া উত্তমরূপে বাঁধা হইল। ছোট ছোট কিছু জিনিস টঙ্গার ভিতরেও লওয়া হইল। সতীশ ও অবশিষ্ট জিনিস অপেক্ষাকৃত একটি ছোট যান, যাহা টম্‌টম্‌ নামে পরিচিত, তাহাতে চলিল। যথাসময়ে আমরা রাজপুর "ক্যালিডোনিয়া" হোটেলে উপস্থিত হইলাম। প্রত্যুষে ডেরাডুন হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত টঙ্গায় যাত্রা বেশ ভাল লাগিয়াছিল। টঙ্গা চালকের নিকট একটি ভেরী (bugle) থাকে। পথে কোন বাধা দেখিলে সে সেই ভেরী ধ্বনি করে। এই ভেরী বাজাইবার একটা কায়দা আছে। কেবলমাত্র জোরে ফুঁ দিলেই হয় না এবং অভ্যাস না থাকিলে সহজে বাজান যায় না। ডেরাডুন হইতে মুসূরীর পাহাড় বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে টঙ্গা যত রাজপুরের নিকটবর্ত্তী হয় পাহাড়ের বাড়ীগুলিও বেশ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। রাত্রিকালে মুসূরীর বৈদ্যুতিক আলোক দেওয়ালীর রাত্রের আলোকমালার ন্যায় দেখায়। হোটেলের কর্ত্তা একটি বৃদ্ধ সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার লোক যিনি

ডেরাডুনে আমাদের "পাক্‌ড়াইয়াছিলেন" তিনি অগ্রেই আমাদের সম্বন্ধে টেলিফোন করিয়া সংবাদ দিয়াছিলেন। আমাদের জন্য প্রাতের খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে আহার সম্বন্ধে আমরা পরমহংস বলিলেই হয়, অর্থাৎ কোন খাদ্যেই কোনরূপ বাধা নাই, মুখরোচক হইলেই হইল। সাহেবী খানায় কিম্বা হোটেলে ও সাহেবদের সঙ্গে খাইতে কোনরূপ আপত্তি নাই। আমাদের পরিধানেও সাহেবী পোষাক কেবল সতীশ বাবু ছাড়া। যদিও খাদ্য বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধা নাই তিনি কিন্তু তাঁহার ধুতি ছাড়িতে কোন মতেই রাজি নহেন। হোটেল কর্ত্তা বেকার সাহেব বেশ মিষ্টুক লোক। হোটেলের ব্যবসা করিতে গেলে বোধ হয় ও গুণটির বিশেষ দরকার। তবে এরূপ দেখা গিয়াছে যে পয়সা দিয়াও সাহেবী হোটেলে দেশী লোক নিগ্রহিত হইয়াছেন। বেকার সাহেব আমাদের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন, তাহার পুত্র লড়াইয়ে গিয়াছে সে কথা বলিলেন। জর্ম্মানির সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিতেই ইঁহার পুত্র যুদ্ধে গোরা হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই সহরে কাজ করিতেন। তিনি যুদ্ধে যাইতেছেন কেবলমাত্র এই সংবাদ বৃদ্ধ বাপ মাকে লিখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কোথায় গিয়াছেন, কোন ফৌজে যোগ দিয়াছেন,

কোথায় লিখিলে তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায়, এ সকল কথা কিছুই লেখেন নাই। বৃদ্ধ বাপ অনন্য উপায় হইয়া যে সৈন্যাধ্যক্ষ নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিবার কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ছিলেন। পত্রের জবাবে সেই সৈন্যাধ্যক্ষ পুত্রকে পত্র লিখিবার ঠিকানা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বৃদ্ধ পত্র খানি আমাদের দেখাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন সে তাঁহার একমাত্র পুত্র, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন "যাহা হউক সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে"। তখন মনে ভাবিয়া ছিলাম বাঙ্গালীর বাপকে পুত্র সম্বন্ধে এরূপ বলিতে কবে শুনিব। কিন্তু তখন জানিতাম না কত শীঘ্র সে ইচ্ছা সফল হইবে। উপরি উক্ত ঘটনার দুই বৎসরের মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্গালী মাতার সৈনিক পুত্রকে বিদায় আশীর্ব্বাদ দিবার যে মহৎ দৃশ্য দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছি, তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। এখানে ব্রেক্‌ফাষ্টএর পর আমরা মুসূরীর চড়াই আরম্ভ করিলাম। আমাদের জিনিস পত্র এখানে ওজন করিয়া কুলি পৃষ্ঠে অগ্রেই পাঠান হইয়াছিল। আমি ও সত্যেন এক একটি ঘোড়া লইলাম, ফণী ও সতীশ দাণ্ডী লইল। চড়াইয়ের সময় অশ্বারোহণ সহজ, ঘোড়ার যদিও

অত্যন্ত পরিশ্রম হয় আরোহীর বিশেষ কিছুই কষ্ট করিতে হয় না, কোনরূপে অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিলেই হইল। "হাফ্ ওয়ে হাউস" (Half-Way house) নামে অৰ্দ্ধ রাস্তায় বিশ্রামের জন্য একটি ছোট হোটেলের মত আছে। এখানে অল্প আহার্য্য বস্তু ও পানীয় পাওয়া যায়। আমি দলের সর্ব্বাগ্রে বেলা প্রায় ৩টার সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া মনে করিলাম একটা লেমনেড কিম্বা অন্য কোন পানীয় কিছু পান করিব ও সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিব। আমি আসিবার অল্প পরেই আমার সহিস আসিল। এই সহিস একটি ছোক্‌রা, বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে, প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে এইরূপ এক একটি ছোক্‌রা আসে। ইহাদের পাহাড় চড়িবার ক্ষমতা অদ্ভূৎ, সমানে ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ায়, পথে "পাক্‌ডাণ্ডী" (পাহাড়ীদের রাস্তা) পাইলেই তাহা অনুসরণ করিয়া অনেক সময় ঘোড়ার আগে চলিয়া যায়। কোন কোন ছোক্‌রা ঘোড়ার লেজ ধরিয়া সঙ্গে দৌড়ায়, ইহাতে ঘোড়ার টানে তাহাদের পাহাড়ে উঠিবার সুবিধা হয়। ঘোড়া ছাড়িয়া হোটেলে উঠিয়া দেখি ঘরের মধ্যে শৈলেন ও কলিকাতা নিবাসী অপর দুইটি বাঙ্গালী বন্ধু। শেষোক্ত বন্ধুদ্বয় মুসূরীতে হাওয়া খাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে

আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, আমাদের বিলম্ব দেখিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন, অর্থাৎ কিছু আহার করিতেছেন। ক্রমে সত্যেন, ফণী ও সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থলে অল্প বিশ্রাম করিয়া আমরা সকলে মুসূরী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আমাদের বিশ্রামের তত আবশ্যক ছিলনা কিন্তু কুলীরা অল্প বিশ্রাম না করিলে চলিতে চাহিল না বিশেষ ফণীর কুলীরা। ইহাদের বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না, ২॥০মণ ওজনের বোঝা লইয়া সমানে চড়াই উঠিতে হইলে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দরকার।

আমরা প্রায় বেলা ৪টার সময় মুসূরী আসিয়া পৌঁছিলাম। শৈলেন "কেনিল্‌ওয়ার্থ" (Kenilworth) নামে একটি বোর্ডিং হাউসে (Boarding House) উঠিয়াছিল। সেখানে আর জায়গা না থাকাতে "গ্লেনলিওন্" (Glenlyon) নামক আর একটি বোর্ডিং হাউসে আমাদের জন্য ঘর ঠিক করিয়াছিল। এই বোর্ডিং হাউসটিতে একটি ঘর ছাড়া অপর সব ঘর খালি ছিল। ইহার কিছু উপরে আর একটি বোর্ডিং হাউস ছিল। এই বোর্ডিং ও "গ্লেনলিওন্" একই কর্তৃত্বাধীনে ছিল। "গ্লেনলিওন্" খালি থাকায় বোর্ডিং হাউস কর্তৃ আমাদিগকে তথায় ঘর দিতে নারাজ ছিলেন, তার উপর যখন আমরা বলিলাম

আমাদের আহার্য্য আমাদের ঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে তখন তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন। যাহা হউক অনেক অনুনয় বিনয়ের পর "গ্লেনলিওনে" আমাদিগকে দুইটি ঘর দিতে রাজী হইলেন, ও সতীশবাবুর খাবার ঘরে দিবেন বলিলেন। আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট, ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল অপর ঘর খুঁজিবার সময় বড় বেশী ছিলনা। ঘর দুইটিও পরিষ্কার ছিল ও তাহাতে ইলেকট্রিক লাইট ও পার্শ্বেই কলের জল ছিল। আর আমাদের কেবল মাত্র দুই এক দিনের জন্য মুসূরীতে থাকা, কাজেই আমরা আর ইতস্ততঃ না করিয়া সেই ঘর লওয়াই স্থির করিলাম। আমাদের জিনিষ পত্রও শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরাও রাত্রের মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

দার্জ্জিলিং ছাড়া অপর কোন হিল্ ষ্টেশনে (Hill station) দেশী অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় লোকেদের জন্য থাকিবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। যাঁহারা দেশী পোষাকে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের ইংরাজী হোটেলে কিম্বা বোর্ডিং হাউসে সুবিধা হয় না। ফিরিঙ্গিদের বোর্ডিং হাউসে ত তাঁহাদের থাকা অসম্ভব। সকল হিল্ ষ্টেশনেই দেশী লোকদের জন্য ধরমশালা আছে কিন্তু সেখানে তীর্থ যাত্রী ছাড়া অপর লোকের বিশেষ সুবিধা হয় না।

লোকজন ও জিনিস পত্র সংগ্রহ।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ফণী ও সত্যেন পূর্ব্ব রাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গোত্তরী যাওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিল, আজ যাওয়াই স্থির করিল, সঙ্গে এক একটি ডাণ্ডি লইবে ঠিক হইল। ডাণ্ডি জিনিস্‌টা কি তাহা অনেকেই জানেন। ইহাতে চেয়ারের মত বসিতে হয়, পা রাখিবার যায়গা আছে, অগ্রে দুইজন ও পশ্চাতে দুইজন কুলি কাঁদে করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। যাহাদের পদদ্বয় শরীর বহনে অপটু পাহাড়ী রাস্তায় ডাণ্ডি ভিন্ন তাহাদের গতি নাই কিন্তু পা পটু থাকিলে ডাণ্ডি অপেক্ষা পা'ই নিরাপদ। গঙ্গোত্তরীর পথে নাচার হইয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে ডাণ্ডিতে উঠিতে হইয়াছিল, কিন্তু যখনই এইরূপে কুলি হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতাম তখনই প্রাণে সর্ব্বদা যে একটা অদম্য উৎসাহ ও সাহস ছিল তাহা কমিয়া যাইত। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে ডাণ্ডির কুলীরা হীনবল ও তাহারা প্রায়ই বিপদ ঘটায়। এক কথায় সচরাচর তাহারা

নিরাপদ ও প্রাণ দিয়া আরোহীকে রক্ষা করে। কিন্তু আমরা যে পথে গিয়াছিলাম স্থানে স্থানে তাহা অতি দুরূহ, সে পথে যদি তাহাদের পদস্খলন হইয়া থাকে তাহা মার্জ্জনীয়।

স্থানীয় লোকেদের নিকট সংবাদ নিয়া জানিলাম সাহেবেরা মধ্যে মধ্যে শীকারের জন্য গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় গিয়া থাকেন ও তাঁহারা সঙ্গে শিকারী, কুলী, তাম্বু ইত্যাদি লইয়া যান। তাহারা একজন শিকারী ও একটি কুলীর সর্দ্দারকে আমাদের নিকট লইয়া আসিল। ইহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় আমরা গন্তব্য পথের সংবাদ, কুলীদের মাহিনার হার ও অন্য অন্য আবশ্যকীয় বিষয়ের কতক সন্ধান পাইলাম। শিকারীটি প্রাচীন ও কিছু ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইল, যাহা হউক আমাদের সময় অতি কম তখন বাছাবাছির আর বড় অবকাশ ছিলনা। এই শিকারী ২০৲ টাকা মাহিনা ও গরম কাপড় চাহিল। আমরা তাহাকে লোকজন জোগাড় করিতে বলিলাম। সে যাইবার অল্প পরেই অপর একজন শিকারী ও অন্য একজন কুলীর সর্দ্দার আসিল। এই শিকারীর নাম গৌরী ইহার বয়স পূর্ব্ব শিকারী অপেক্ষা কম, ৫০এর নিম্নে বলিয়া বোধ হইল। কথায় বার্ত্তায় লোকটিকে সাদা সিধা ও সরল বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল, সেও ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে যাইতে রাজি হইল। তাহার সঙ্গে

যে কুলীর সর্দ্দার আসিয়াছিল তাহার নাম রথি। এখানকার কুলীর সর্দ্দারেরা সচরাচর "টাণ্ডেল" নামে পরিচিত। সব কুলীর সরদারকেই "টাণ্ডেল" বলে। এই কুলীর সর্দ্দারকেও ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হইল। আমরা আর ইতস্ততঃ না করিয়া গৌরীকে শিকারী ও রথিকে "টাণ্ডেল" নিযুক্ত করিলাম। রথির মাহিনা ঠিক হইল ১৮৲ টাকা এবং সে ৷৷০ আনা রোজে আমাদের যত কুলী আবশ্যক দিতে রাজি হইল। অমারা তাহাকে ২৫ জন কুলীর বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। তাহার পর আমরা একটি চাকর নিযুক্ত করিলাম। সে যে সকল চাকরকে ইংরাজীতে "বয়" বলে সেই শ্রেণী ভুক্ত। আমাদের ইচ্ছা ছিল গঙ্গোত্তরীর পথে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইব, ও অপরাপর যাহা কিছু কার্য্য নিজেরাই করিব। তবে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা কতদূর কষ্টসাধ্য, সে কষ্ট আমরা সহ্য করিতে পারিব কিনা, এ সকল বিষয় বিশেষ কোন চিন্তা করি নাই। মোটামুটি মনে মনে আমরা সকল কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সমুদ্র হইতে ১৩,০০০ ফুট উপরে প্রাতে ৭টার সময় বাল্‌তি হইতে বরফ ভাঙ্গিয়া জল নিয়া আগুণ জালাইয়া চা প্রস্তুত করিতে ঠিক পারিতাম কিনা জানিনা, তবে সে পরীক্ষা আমাদের কাহারও হয় নাই। এই চাকর বা "বয়" আমাদের সকল রকম কার্য্যে

সাহায্য করিবে এই উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইল। এইরূপ বলিয়া রাখা হইল যে অপর কাজ ছাড়া তাহাকে অল্প সল্প রাঁধিতেও হইবে। সে বলিল রন্ধন কার্য্যে সে সিদ্ধ হস্ত, অনেক সাহেবের সার্টিফিকেট্ দেখাইল। পাহাড়ে সকল চাকরেরই সার্টিফিকেট্ আছে। এই সার্টিফিকেটের যে কি দাম তাহা বলা কঠিন। কার্য্য শেষ হইলে সকলেই সার্টিফিকেট্ চায়। অনেকে আপদ বিদায় করিবার জন্য, অনেকে বক্‌সিসের বদলে সার্টিফিকেট্ দিয়া থাকেন। আমাদের এই "বয়ের" সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঠকিয়াছিলম। সে একটি অপদার্থ লোক ও ছিঁচকে চোর। তবে ও সব লোক যেমন হইয়া থাকে, সে গালাগালি ও তিরস্কার অতি ধীর ভাবে সহ্য করিত। যাহা হউক আমরা এই সার্টিফিকেট্ যুক্ত "বয়"কে ১৬৲ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করিলাম।

আমাদের সঙ্গে লইবার জন্য জিনিষ পত্র যাহা কিনিতে বাকি ছিল তাহাও আজ সংগ্রহ করা হইল। আমাদের সঙ্গে মোটামুটি নিম্নলিখিত সরঞ্জাম গিয়াছিল। দুইটি ছোট তাম্বু, প্রত্যেক তাম্বু দুইজন করিয়া লোক থাকিবার জন্য, এক একটি তাম্বুর ওজন দাণ্ডা ছাড়া প্রায় ৩০ সের। একজন কুলী একটি তাম্বু লইতে পারে। প্রত্যেকের এক একটি "হোল্ড অল্," বিছানা

ও এক একটি "ক্যাম্প বেড্"। এই "ক্যাম্প বেড্" গুলি আমাদের কিরূপ কার্য্যে লাগিয়াছিল তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না, খুলিলে ৬×২॥০ ফিট্ একটি সুন্দর খাট প্রস্তুত হয়, বন্ধ করিলে সমস্ত জিনিষটা একটি ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে রাখা যায়, আয়তন ২॥০ ফিট্ × ৬ ইঞ্চ্। খাট লাগাইতে ২।৩ মিনিট, খুলিতে এক মিনিট সময় লাগে। জমীতে যখন বরফ তখন এই খাটে শুইয়া আমরা নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছি। এক একটি ক্যাম্বিসের "কিট-ব্যাগ," সৈন্যিকেরা যেমন ব্যাগে জিনিষ পত্র লইয়া যায় কতকটা সেইরূপ, আমরা আমাদের ময়লা কাপড়ের ব্যাগগুলিকেই "কিট্ ব্যাগে" পরিণত করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের প্রত্যেকের আসবাব যাহা কিছু থাকিত। ইহা ছাড়া তৈজস পত্র, চাল, ডাল, মস্‌লা, ঘী, তৈল, ময়দা, আটা, চা, কফি, কোকো, চিনি, আলু, পেয়াঁজ, টিনের দুধ, মাংস, ও মাছ, ইত্যাদি একটী চামড়ার পেটারী ও চারিটি পাহাড়ীদের লম্বা লম্বা ঝুড়িতে করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অপর জিনিসের মধ্যে কেরসিন তৈল দুই টিন, বাল্‌তি, হ্যারিকেন ল্যাণ্টারান্, প্রাইমাস্ ষ্টোভ, ইক্‌মিক্ কুকার ইত্যাদি দ্রব্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।

মুস্থরী হইতে ধনৌটি।

প্রায় ১৬ মাইল।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

আজ আমরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া জিনিস পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলাম। বেলা ৮টার সময় শিকারী ও টাণ্ডেল আসিল ও তাহাদের সঙ্গে কতক কুলীও আসিল। কুলীরা আসিয়াই আপন আপন মোট বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সকলেই লঘু ভার লইতে ব্যস্ত। এ বিষয়ে এই সকল অশিক্ষিত কুলীদের মধ্যে ও শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি কোন প্রভেদ দেখিলাম না। সংসারে সকলেই আপন ভার লঘু করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। আমরা যেরূপ ভাবে মাল এক কুলীর জন্য ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা তাহারা এক কুলীর পক্ষে ভারি বলিল। ২৫ জন কুলী আমরা আন্দাজ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার স্থলে ২৯ জন কুলীর মোট হইল। মহা একটা গোলমাল লাগিয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে রাঁধিবার জিনিস পত্র একটা টুক্রীতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত "বয়" লইয়া যাইবে কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ছিলনা। সে একটি লোক ঠিক করিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট টুক্রী

সেই লোকটির ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। আমরা সম্ভবতঃ তখনই তাহার উপর একটা জুলুম স্বরু করিয়া দিতাম, কিন্তু সে এক উপায়ে আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিল। বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে আমাদের খাওয়া শেষ হইলে, সতীশ বলিল, যে সে তখনই অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে চলিবে, পথে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমরা স্থির করিয়াছিলাম সেদিন আমরা মুসূরী হইতে ধনোটি নামক স্থানে যাইয়া রাত্রি বাস করিব। ধনেটি মুসূরী হইতে ১৬ মাইলের কিছু উপর। আমাদের তখন অদম্য উৎসাহ, ১৬ মাইল পথ অতি সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এই দিনেই আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া ছিল, তাহার পর আমরা আর এক দিনে ১৬ মাইল চলিবার চেষ্টা করি নাই। সতীশের অগ্রে যাওয়া যদিও আমাদের তত মনোমত না হউক কিন্তু তাহাতে আমরা বিশেষ বাধা দিলাম না। যাইবার সময় সতীশ বলিল "বয়" তাহার সঙ্গে যাইবে ও তাহার যে একটি মোট আছে তাহা লইয়া যাইবে। সতীশের নিজের মোটটি অতি লঘু ছিল, ৪।৫ সেরের বেশী হইবে না। "বয়" যখন দেখিল একটি মোট লইয়া না গেলে তাহাকে আমরা ছাড়িব না তখন সে সতীশের কৃপা ভিখারী হইয়াছিল ও যতদূর সম্ভব উপরোক্ত উপায়ে তাহার মোট লাঘব করিয়া লইয়াছিল। যাহা হউক সতীশ

ও "বয়" বেলা ৯টার সময় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। কুলী ও মোট ঠিক করিতে আমাদের আরও ১॥ ঘণ্টা সময় লাগিল। এই কুলীদের ঠিক করিয়া চালান একটি অতি কঠিন ব্যাপার। আমাদের কুলীদের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বিবাদি ছিল, তাহারা মুখ বুজিয়া আপন মোট লইয়া চলিত, কিন্তু অপর কতকগুলি নানা রূপ গোলযোগ উপস্থিত করিত। শেষোক্ত দলের ৪ জন যাইবার সময় দিন আট আনার স্থলে বারো আনা চাহিয়া বসিল, এ ৪ জন ডাণ্ডির কুলী। এই ৪ জনকে আমরা ছাড়িয়া দিলাম। টাণ্ডেল বলিল যাইবার রাস্তায় সে ৪ জন কুলী করিয়া লইবে। কুলীদের মাল তুলিতে বলা হইল, এক এক জন কুলীর পৃষ্ঠে প্রায় ২০ সের হইতে ৩০সের মাল দেওয়া হইল। ইহার বেশী মাল কুলীদের পৃষ্ঠে দিতে সাহস হইল না, ভয় পাছে মাল ও কুলী উভয়ই নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছায়। সর্ব্বসমেত আমাদের ২৯ জন কুলী হইল, ইহার মধ্যে ১৪ জন ফণী ও সত্যেনের ডাণ্ডির জন্য ও বাকি মোটের জন্য। এই ২৯ জন কুলী ছাড়া শিকারী, টাণ্ডেল ও "বয়কে" লইয়া আমাদের দলে ৩২ জন লোক ও আমরা ৫ জন পর্য্যটক মোট ৩৭ জন। যেন ছোট খাট একটি "পোলার এক্সপিডিসানে" যাইতেছি বলিয়া বোধ হইল। বেলা ১০॥টার সময় মাল সমেত কুলীদিগকে লাইন বাঁধিয়া দাঁড় করান

হইল। আমরাও সকলে ভ্রমণের বেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইলাম। পরিধানে গরম "হাফ্ প্যাণ্ট," গায়ে ফ্লানেল্ সার্ট, পায়ে "ফক্সের পট্টি" ও মোটা শিকারী বুট, তলা প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ মোটা তার উপর লোহার স্ক্রু লাগান, মাথায় সোলার হ্যাট, এক কাঁধ হইতে জলের বোতল ও অপর কাঁধে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিতেছিল, হস্তে পাহাড়ীলাঠি ও ফটোগ্রাফ্ তুলিবার ক্যামেরা; এক কথায় আড়ম্বরের ত্রুটি কিছুই হয় নাই। পরে দেখা গিয়াছিল উপরোক্ত সকল জিনিসই পাহাড়ে ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ও নিতান্ত আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ মোটা তলা যুক্ত মজবুৎ ও ওয়াটার-প্রুফ্ চামড়ার বুট জুতা, মোটা তলা না হইলে পাথরের সংঘর্ষণে তলা শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আর পথে স্থানে স্থানে পাথর এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে মোটা তলা না হইলে তাহা পদতলে বিঁধিবার সম্ভাবনা। সু জুতা অপেক্ষা বুটই ভাল কেননা তাহাতে পদস্খলন ও পা মুচ্ড়াইবার সম্ভাবনা কম। এ সকল রাস্তায় অধিক সময় যেন পথের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। চক্ষু অধিক অভ্যস্ত না হইলে পথ হইতে উঠাইবার বা ফিরাইবার অবকাশ থাকে না, ফিরাইলেই উচ্চ কিম্বা নীচু জমীতে বা আল্গা পাথরে পা পড়িয়া পা পিছলাইয়া বা মুচ্ড়াইয়া যাইবার

সম্ভাবনা। কোথাওবা পথে ছোট ছোট পাথর পড়িয়া আছে তাহাতে পা দিলে পা অথবা পাথর সরিয়া যায়। অনেক সময় মনে হয় যেন পথের এই পাথর গুলিই সজীব, আমাদিগের পদদলনে বিদ্রোহী হইয়া আমাদের পা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতেছে। বিশেষতঃ যে স্থলে উৎরাইয়ের মুখে আল্‌গা পাথর পাওয়া যায় সেখানে সত্যই উপরোক্ত ভাব মনে উদয় হয়। জুতার চামড়া ওয়াটারপ্রুফ্‌ হওয়া বিশেষ দরকার কেননা অনেক স্থলে ঝরণার জল রাস্তার উপর দিয়া কিছু স্থান অধিকার করিয়া গড়াইয়া নীচের পাহাড়ে পড়িয়াছে, এরূপ স্থলে কোথাও ছোট ছোট পাথরের সাহায্যে জুতা না ভিজাইয়া বা অল্প ভিজাইয়া পার হওয়া যায় কিন্তু আবার কোথাও জলের মধ্যে জুতা ভিজাইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক সময় ইচ্ছা পূর্ব্বক আমরা জুতার তলা ভিজাইয়া লইতাম। সূর্য্যের উত্তাপে ও পাহাড়ের ঘর্ষানিতে জুতার তলা এক এক সময় অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইত সে সময় জলে ডুবাইলে তলা অপেক্ষাকৃত নরম হইত। তারপর পট্টি অনেক উপকারে লাগে ইহা থাকিলে লতা পাতা ও কাঁটা যুক্ত নীচু বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইলে কিম্বা কোন কারণে পদদ্বয় প্রস্তরে বা অন্য কোন কঠিন পদার্থে ঘর্ষিত হইলে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা কম। "ফক্সের পট্টি"

নরম উলের প্রস্তুত ও দেখিতে সুন্দর। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিয়া আমি একটি অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলাম যাহার জন্য কিছু দিন পরে আমি আর পট্টি ব্যবহার করি নাই। পট্টি পায়ে যেরূপ ভাবে শক্ত করিয়া জড়ান প্রথা সেরূপ ভাবে জড়াইলে পায়ের শিরা সমুহের রক্ত চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয় এবং তাহাতে চলিতেও কষ্ট হয়। প্রথম তিন চারি দিন চলিবার পর আমি এই অসুবিধা ভোগ করাতে আর পট্টি ব্যবহার করি নাই, কিন্তু পট্টি ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে পারিলে অনেক সুবিধা। হাফ্ বা পা কাটা ছোট পেণ্টালন এ পথের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিধেয়; ইহাতে বসিতে উঠিতে কষ্ট নাই, লঘু ও হাঁটুর নিকট খোলা থাকাতে বসিবার সুবিধা হয়। ফ্ল্যানেলের সার্ট (বেশ নরম জাতীয় ফ্ল্যানেল) বেশ লঘু ও শীত নিবারক, রৌদ্রের সময়ও শরীর অপেক্ষাকৃত শীতল রাখে ও অনেক পরিশ্রমের পর পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে দেহকে রক্ষা করে। বড় বড় চড়াইয়ের সময় গলদ ঘর্ম্ম হইয়া যখন দম লইবার জন্য দাঁড়াইতাম ও পাহাড়ের শীতল ও সুমিষ্ট বায়ু আগ্রহে সেবন করিতাম তখন এই ফ্ল্যানেল সার্ট অনেক সময় সর্দ্দি হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছে। জলের বোতল এ পথে এক পরম বন্ধু, ইহা হইতে চলিতে চলিতে জল পান করা সহজ

ও এরূপ জল পানের প্রয়োজন চড়াইয়ের মুখে প্রায়ই হয়, বিশেষ যে পথে ঝরণা বিরল সে পথে জলের বোতল না হইলে চলা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য, পথে ঝরণা থাকিলেও তাহা হইতে হস্ত দ্বারা জল পান করা সহজ নয়। আর ক্যাম্বিসের একটি ছোট ব্যাগ থাকাতে পথে চলিবার সময় আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য তাহাতে লওয়া যায়, যেমন ছোট তোয়ালে, ছুরী, পেনসিল, কাগজ বা নোটবুক ইত্যাদি। আর একটি জিনিস এই ব্যাগে লইয়াছিলাম যাহাতে চলিবার সময় বড় উপকার হইয়াছিল। আমরা দুই শিশি নেবুর লজেঞ্জ্ সঙ্গে লইয়াছিলাম তাহারই কিছু কিছু এই ব্যাগে লইতাম, চলিতে চলিতে গলা শুখাইয়া আসিলে দুই একটা মুখে দিলে জিহ্বা সরস হইত। এই লজেঞ্জ্ জিনিসটার আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষ পক্ষপাতী এখনও সুবিধা পাইলেই বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের সহিত ভাগ বসাই। ইহাতে আমার সঙ্গীদের বিশেষ আগ্রহ না থাকিলেও আমার ছিল ও অবশেষে শিশি দুইটা আমিই অধিকার করিয়াছিলাম। সর্ব্বশেষ মাথায় সোলার হ্যাট্। যদিও হিমালয়ের উপর ৩,০০০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে ভ্রমণ করিয়াছি সূর্য্যের উত্তাপ সর্ব্বত্রই পাইয়াছি তবে উচ্চতা অনুসারে কম বেশী। সোলারটুপি থাকাতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই।

গঙ্গোত্তরী ও

উপরোক্ত পরিচ্ছদ ছাড়া এক একটি ওভারকোট ও বৃষ্টির কোট আমরা সঙ্গে লইয়াছিলাম, সময় সময় চলিতে চলিতে পথে বৃষ্টি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে বৃষ্টির কোট না থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইত। এ পথে ছত্র ব্যবহার করা সুবিধা নয়, এক হস্তে পাহাড়ী লাঠি থাকে অপর হস্ত খালি থাকা আবশ্যক। পাহাড়ী লাঠির কথা বলিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম, পাহাড় ভ্রমণে ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি অপর লোকে পাহাড়ী লাঠিকে তৃতীয় পদ স্বরূপ বলিয়াছেন, আমি বলি ইহা তৃতীয় পদ অপেক্ষা অধিক। এই পাহাড়ী লাঠি ৪ ফুট হইতে ৫॥০। ৬ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, ইহা পাহাড়ী নিরেট বাঁশ কিম্বা শক্ত কাঠের দ্বারা প্রস্তুত, নিচে লৌহ কিম্বা পিতল নির্ম্মিত বর্শার ফলকের মত ২।৩ ইঞ্চ পরিমিত একটি ফলক বা গোঁজ্ থাকে। আবশ্যক হইলে এই লাঠি বর্শার কার্য্য করিতে পারে। বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া একলা যাইবার সময় হস্তে এই লাঠি থাকায় মনে কতক সাহস থাকিত। দুরূহ পর্ব্বত গাত্র দিয়া যাইবার সময় যখন পর্ব্বত গাত্রে পা রাখা দুষ্কর হইত তখন এই লাঠির উপর শরীরের সম্পূর্ণ ভর রাখিয়া ধীরে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। গোমুখ যাইবার সময় অগ্রে এই লাঠি দিয়া প্রস্তর খণ্ড নড়ে কিনা পরীক্ষা করিয়া তবে তাহার উপর চলিয়াছি,

পদস্খলন হইলে পর্ব্বত গাত্রে লাঠির অগ্রভাগ বসাইয়া দিয়া তাহার উপর ভর করিয়া আত্মরক্ষা করা গিয়াছে, এক কথায় অন্ধের নড়ি তুল্য এই পথে লাঠি ভ্রমণকারীর প্রধান সহায়। উপরোক্ত বেশ ভূষা এ পাহাড়ী পথের বিশেষ উপযোগী বলিয়া সবিস্তারে তাহার বর্ণনা করিলাম।

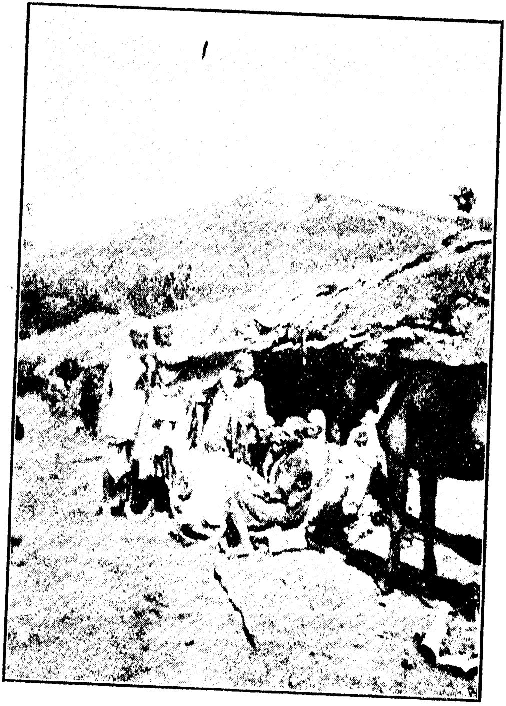
আমরা ৩০০৲ টাকা নগদ সঙ্গে লইলাম, কেননা পথে যেরূপ খোরাকের কথা শুনিলাম তাহাতে আমাদের পাঁচ জনের দিন খাইতে ১৲ টাকার বেশী কোন মতেই খরচ হইতে পারেনা, তাহা ছাড়া আমাদের সঙ্গেও অনেক রসদ ছিল, আর খাই খরচ ভিন্ন অপর কোন খরচ বিশেষ কিছুই ছিলনা। আমাদের টাণ্ডেল বলিয়াছিল যে প্রত্যেক কুলীকে পথে কেবল মাত্র ৩৲। ৪৲ টাকা দিলেই হইবে বাকি টাকা তাহারা ফিরিয়া মুসূরী আসিয়া লইবে। আমাদের আন্দাজ ছিল যে, আমরা ২৫ দিনের মধ্যে গঙ্গোত্তরী ও সম্ভবতঃ যমুনোত্তরী দেখিয়া ফিরিতে পারিব অতএব পাথেয় ৩০০৲ টাকা হইলেই আবশ্যকীয় খরচের সঙ্কুলান হইবে। কিন্তু দুই তিনটি কারণে আমাদের হিসাবের সব ভুল হইয়াছিল। ৪৲ টাকার স্থলে কুলীরা এক একজন প্রায় ৮৲। ৯৲ টাকার আটা খাইয়া ফেলিল। তাহারা প্রত্যেক দিন

/২ সের করিয়া আটা খাইত আর আটার দাম পথে ১৲ টাকায় /৮ সের হইতে /৫ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। তার পর আমাদের ফিরিতে ২৫ দিনের স্থানে প্রায় একমাস ৩।৪ দিন লাগিয়াছিল, আর স্থানে স্থানে পাণ্ডা প্রভৃতির জন্য উপরি খরচ অনেক হইয়াছিল, যাহা আমরা হিসাবের মধ্যে ধরি নাই। এজন্য পথে আমাদের আরও অধিক টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছিলাম এ পথে রৌপ্য বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা ছাড়া অপর কোন মুদ্রা চলে না। কেবল উত্তরকাশীতে ১০৲ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে পারা যায়, আমরা সেইজন্য অধিক রৌপ্য মুদ্রা ও কিছু ১০৲ টাকার নোট লইয়াছিলাম।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমাদিগের গঙ্গোত্তরীর দল গন্তব্য পথাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইতিপূর্ব্বেই আমরা গঙ্গোত্তরী পথের জন্য অনাবশ্যকীয় জিনিস পত্র আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবর্গ যাঁহারা মুসূরীতে হাওয়া খাইতে আসিয়া ছিলেন তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। যাইবার সময় তাঁহাদের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প যে গঙ্গোত্তরী যাইবই। ব্যঙ্গচ্ছলে কেহ কেহ বলিলেন যে "তোমাদের গঙ্গোত্তরীর দল হয়ত শীঘ্রই আবার মুসূরী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে"। আমরা সে কথায় কর্ণপাত না

করিয়া ল্যাণ্ডর বাজার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ল্যাণ্ডর বাজারই মুসূরীর মধ্যে বড় বাজার এখানে প্রায় সকল রকম আবশ্যকীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও মোট ইত্যাদি দেখিয়া বাজারের লোকেরা কিছু আশ্চর্য্য হইল, আমরা কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এ সময় ফণী, সত্যেন ও আমি একত্রে যাইতেছিলাম, উহারা ডাণ্ডিতে, আমি পদব্রজে। বাজারে টাণ্ডেলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল ডাণ্ডির যে কয়জন কুলী কম আছে তাহা সে পায় নাই। আমরা তাহাকে কুলী লইয়া আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইলাম। ল্যাণ্ডর বাজার ছাড়াইয়াই একটি কঠিন চড়াই পাইলাম, তখন নূতন শক্তি অসীম উৎসাহ চড়াই বেশ জোরেই উঠিলাম। ফণী ও সত্যেনের ডাণ্ডি এখানে পিছাইয়া পড়িল। প্রায় সিকি মাইল চড়াইয়ের পর সোজা রাস্তা পাইলাম ও প্রায় ঘণ্টায় ৪ মাইলের হিসাবে চলিলাম, কিছুদূর চড়াইয়ের পর সমস্ত ল্যাণ্ডর বাজার দৃশ্য পথে পতিত হইল। আমি যে পাহাড়ের উপর চলিতেছিলাম তাহার ও ল্যাণ্ডর বাজারের মধ্যে একটি উপত্যকা থাকাতে ল্যাণ্ডরের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত সমস্তই বেশ দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য

প্রথম দিনের পথে বেনিয়াদের দোকান ও বেনিয়া পরিবার ও বোঝের টাট্টু।



টিহরীর পথে এরূপ দোকান অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। এই সকল দোকানে বেনিয়ারা আটা চাল ডাল হইতে কাপড় ইত্যাদি, পাহাড়ীদের আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্য, বিক্রয় করে।

৩৭ পৃষ্ঠা।]

ছোট বড় বাড়ী। আমরা এই সকল বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগই দেখিলাম ও সে দৃশ্য তত মনোহর বলিয়া বোধ হইল না। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাজপুর হইতে মুসূরীর পথে যে একটি বড় স্কুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখিতে পাইলাম। আমরা এখন পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছি, ক্রমে ক্রমে মুসূরী ও ল্যাণ্ডর দূরে পড়িল কিন্তু আমরা রাজপুর, দেরাডুন, শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী ও তার দক্ষিণে হিন্দুস্থানের সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। মুসূরী ও শিবালিকের মধ্যে ও তাহার দক্ষিণে অনেক গুলি নদী দেখিতে পাইলাম, নদীগুলি নির্ণয় করা অতি সহজ, কেননা জলে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া নদীগুলিকে উজ্জ্বল রেখাবৎ দেখা যাইতে লাগিল। ১৷৷০ মাইল পথ আসিয়া শৈলেন ও শিকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শৈলেনের চলন দেখিয়া বোধ হইল যে তাহার প্রথম আগ্রহ কতক কমিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলিয়াছে। দাণ্ডিদ্বয়ও আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল, সোজাপথে বা উৎরাইয়ের সময় ডাণ্ডি বেশ জোরে চলে কিন্তু চড়াই পাইলেই কুলীরা ক্রমাগত বিশ্রাম করিতে চাহে। মুসূরী হইতে ২ মাইল আসিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে ৩।৪টি ছোট কাষ্ঠের ঘর দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে একটি মুদির দোকান, অল্প সল্প চাল ডাল ইত্যাদি জিনিস

রহিয়াছে। শুনিলাম এই স্থানের নাম জার্ব্বর ক্ষেত। আমরা এ স্থলে না দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইলাম। এখনও সতীশ ও "বয়ের" দেখা পাওয়া গেল না। সূর্য্যের উত্তাপ বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। রাস্তায় অশ্বতরের (মিউলের) দল অনেক দেখিলাম, কতক বা আলু ইত্যাদি লইয়া যাইতেছে কতক বা খালি ফিরিয়া যাইতেছে। পাহাড়ে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য এই মিউল ছাড়া আর উপায় নাই ইহারা দল ভিন্ন কখনও চলে না, শুনিয়াছি একটি মাত্র মিউলকে পথে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। দল থাকিলে প্রথমটি যে পথে যায় পরের গুলিও সেই পথে চলে। আমরা কখন একটি মিউলকে একেলা এই পথে যাইতে দেখি নাই। প্রত্যেক মিউলের পৃষ্ঠের দুইদিকে দুইটি বস্তা থাকে, এই বস্তা দুইটি মধ্য ভাগে সংলগ্ন। প্রত্যেক বস্তায় প্রায় ১॥০ মণ হইতে ২ মণ জিনিস থাকে। এই মিউলের দল যাইবার সময় পথে কিছু ধুলা উড়ায়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন কিম্বা দুইজন চালক থাকে। তাহারা প্রায় প্রথম কিম্বা শেষ মিউলটির উপর সোয়ার হইয়া যায়। পথে লোক দেখিলে মিউলের দল আপনিই পাশ কাটাইয়া যায় ও তাহারা প্রায় পর্ব্বতের দিকে গিয়া পথিকদিগকে খাদের দিক ছাড়িয়া দেয়, পথিক হয় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেন

অথবা ধীরে ধীরে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হন। দেশী লোক দেখিলে চালকেরা পথ নির্ব্বাচনের ভার মিউলের উপরেই ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু হ্যাট্ কোট্ পরিহিত ব্যক্তি দেখিলেই মুস্কিল। মিউলদের উপর নির্ভর করিলে তাহারা হ্যাট্ কোট্ পরিহিত ও দেশীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখিত কিনা বলা যায় না, হয় ত বা তাহারাও সাহেবদের প্রতি ভিন্ন ব্যবহার শিখিয়াছে। কিন্তু হ্যাট্ কোট্ দেখিয়া মিউলরা কি করে তাহা দেখিবার সুবিধা আমাদের বিশেষ হয় নাই, কেননা আমাদের হ্যাট্কোট্ পরিহিত মূর্ত্তি দেখিলেই মিউল চালকেরা "বাঁচ্ বাঁচ্" শব্দে মিউল হইতে লাফাইয়া পড়িত ও মিউলদিগকে তাড়না করিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় গোলোযোগ উপস্থিত হইত। কখনও তাড়া পাইয়া মিউলরা বেগে আমাদের পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইয়া অগ্রসর হইত, সময় সময় এত নিকট দিয়া যাইত যে তাহাদের গাত্রে ধাক্কা লাগিয়া আমাদের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল, অপর সময় তাহারা অক্র বক্রভাবে রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইত, আবার কখন দুই চারিটি মিউল ফিরিয়া পশ্চাদ্ভাগে পালাইত। ফলে টুপিকে খাতির করিতে গিয়া মিউল চালকেরা একটা মহা গোলমাল বাঁধাইয়া দিত। শুনিলাম কখন কখন

পদস্খলিত হইয়া দুই একটি মিউল পর্ব্বতের নীচে খাদে পড়িয়া মারা যায়, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল, বরং পর্ব্বতের অপর ভারবাহি জন্তুর যথা পাহাড়ী ঘোড়া, গরু, ছাগল ও মেষের এ বিপদ প্রায়ই হয়। আরও তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা ঝাল্‌কি নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান মুসূরী হইতে ৫ মাইল। স্থানটি অত্যন্ত অপরিষ্কার, বিশেষ মিউলের দল এখানে প্রায়ই আসিয়া দাঁড়ায় বলিয়া চতুর্দ্দিকে খড় কুটা ঘাস ইত্যাদি ময়লা পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বসামেত ৮.১০ খানা কাঠের ঘর আছে তাহার মধ্যে কতক দোকান ও কতক বেনিয়াদের থাকিবার ঘর। একটি দ্বিতল কাষ্ঠের ঘর দেখাইয়া শিকারী বলিল যে ঐটি ধর্ম্মশালা, এই ধর্ম্মশালায় পাহাড়ী ও অপর দেশী লোক আশ্রয় পায়। বাহ্যাকৃতি দেখিয়া স্থানটিকে বড় পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইল না। মুসূরীর নিকট হওয়াতে বোধ হয় এখানে প্রায়ই লোকজন আসিয়া থাকে সেই কারণে স্থানটি তত পরিষ্কার নয়। আমরা এই ধর্ম্মশালায় থাকি নাই কিন্তু গঙ্গোত্তরীর পথে অপর অনেক ধর্ম্মশালায় রাত্র কাটাইয়াছি, সকল গুলিই কিন্তু বেশ পরিষ্কার ও সে সময় তীর্থ যাত্রার সময় না হওয়াতে সকল গুলিই আমরা একেবারে খালি পাইয়াছিলাম। ঝাল্‌কীতে একটি নালার ধারে এক বৃক্ষের ছাওয়াতে আসীন শ্রীসতীশচন্দ্র

বস্থ, মুখ শুষ্ক, সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত "বয়", আমাদের দেখিয়া মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল বটে কিন্তু শ্রান্তিরভাব দূর হইল না। শৈলেন এখানে কিছু চা পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ধুলায় ও রৌদ্রে আমাদের গলাও কিছু শুকাইয়া আসিয়াছিল, চা বা অন্য পানীয় কিছু পাইলে কেহই তাহা অগ্রাহ্য করিত না, কিন্তু চার সব সরঞ্জাম উপস্থিত না থাকাতে হইল না। আমরাও ঝাল্‌কীতে না বসিয়া অগ্রসর হইলাম। এখানে শুনিলাম যে ধনেটির প্রায় অর্দ্ধ পথ আমরা আসিয়াছি। এস্থান হইতে আমরা কিছু চড়াই পাইলাম। একে রৌদ্র ও ধুলার জন্য কষ্ট আরম্ভ হইয়াছিল তার উপর চড়াই হওয়াতে পীপাসা কিছু বেশী পাইল। আমাদের "বয়" ঝাল্‌কী হইতে এক বৃহৎ আকারের শসা জোগাড় করিয়াছিল। শসাটিকে দেখিয়া আমার লাউ বিশেষ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তার পর শসা জানিয়াও তাহা আস্বাদনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি নাই কেননা উহা আকৃতিতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে বীজের জন্য যে শসা গাছে রাখে তদ্রূপ দেখিতে ও আকারে তাহা অপেক্ষা বড়। পাকা শসা খাইতে বিশেষ সুস্বাদু নহে ও তাহাতে অজীর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু যখন শুনা গেল উহা পাহাড়ের কচি শসা তখন আস্বাদন করিতে আর কোন আপত্তি রহিল না। এই শসার স্বাদ যদিও আমাদের

দেশের কচি শসার মত নয় (যাহা একটু লবণাক্ত করিয়া খাইতে বোধ হয় কেহই অরাজি নন), তথাপি ইহা অত্যন্ত রসাল, চিবাইতে চিবাইতে তৃষ্ণার কতক উপশম হইল। সঙ্গে যে জলের বোতল ছিল অবশ্য তাহার ব্যবহার চলিতে ছিল। আজিকার রাস্তায় ঝরণা দুই চারিটি ছাড়া পাওয়া যায় নাই, গাছের ছায়াও ছিল না। ঝাল্‌কী হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা আরও ২।৩ খানি দোকান পাইলাম, ইহা ঝাল্‌কী হইতে এক মাইলের মধ্যে। এখান হইতে একটি রাস্তা লালুরী হইয়া ধরাসু গিয়াছে। ইহা পাক্ ডাণ্ডির রাস্তা। ইহাতে চড়াই উৎরাই অত্যন্ত অধিক ও স্থানে স্থানে রাস্তা অতি খারাপ। সাধারণ রাস্তা অপেক্ষা এ রাস্তায় মুসূরী হইতে ধরাসু যাইতে প্রায় ২০ মাইল অর্থাৎ দুই দিনের রাস্তা কম পড়ে। কিন্তু এ রাস্তা দিয়া টিহিরী যাওয়া যায় না, সেই জন্য যাইবার সময় আমরা এ রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিবার পথে আমি সতীশ ও শৈলেন এই রাস্তায় আসিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য পথে চলা বেশ অভ্যাস না হইলে এই পাকদাণ্ডি পথ অবলম্বন না করাই উচিত, আর এ পথে আশ্রয় বিশেষ কিছুই নাই। আরও কিছুদূর চড়াইয়ের পর আমরা এক পর্ব্বতের শিখরে আসিলাম। এখান হইতে রাস্তা আবার ধীরে অল্প নামিয়াছে। এখান

হইতে লাণ্ডুরের শেষ দৃশ্য দেখিলাম, বাড়ীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাগের মত পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল। আর কিছুদূর আসিয়া আমরা রাস্তার ধারে বসিলাম, জলের বোতল ইহার মধ্যে বার দুই খালি হইয়াছে, লেমন ড্রপস্‌ও কিছু শেষ করা গিয়াছে, রাস্তা কিন্তু এখনও অনেক বাকি। আমি, শৈলেন ও সতীশ এক সঙ্গে ছিলাম, ফণি ও সত্যেন ডাণ্ডিতে অগ্রসর হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে "বয়" ও শিকারী। "আর কত রাস্তা বাকি আছে" জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আর অধিক নাই, দুই তিন মাইল হইবে"। পরে দেখা গেল লোক গুলার মাইলের আন্দাজ কিছুই নাই। যাহোক আমরা এখনও বেশ রোখের সহিত চলিতে লাগিলাম। এখানকার পাহাড় যেন মধ্য স্থলে এক কেন্দ্র হইতে অনেকগুলি শাখার ন্যায় একটির পর আর একটি বাহির হইয়াছে। চলিবার সময় কেন্দ্রস্থল হইতে এক শাখার শেষভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়া অপর শাখায় যাইতে হয়, এইরূপ পর্ব্বতের এক শাখার পর অপর শাখা তার পর আর একটি, ইহার আর শেষ নাই। আমরা যখন এক শাখা দিয়া কেন্দ্রস্থলে যাইতেছি, আমাদের দলের অপর লোক হয়ত তখন অপর শাখা দিয়া কেন্দ্রস্থল হইতে সেই শাখার শেষ ভাগে যাইতেছে, মধ্যে উপত্যকা

ব্যবধান, আমরা তাহাদের বেশ দেখিতে পাইতেছি, চিৎকার করিয়া কথা বলিতেছি। সোজা সুজি একদল হইতে অপর দল ২০০।২৫০ গজ দূরে কিন্তু রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হইলে প্রায় এক মাইল দূর হইবে। অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্তগামী হইল, তথাপি পথ আর ফুরায় না। আমি এখন বেশ ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম। শিকারীই আমাদের পথ প্রদর্শক। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে "ঐ সাম্‌নে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে, উহার পশ্চাতেই ধনেটির বাংলা", সে একথা বলিবার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলা গেল, অনেক পাহাড়ের চূড়া পার হওয়া গেল, কিন্তু ধনেটির বাংলা আর আসে না। প্রথম প্রথম শিকারীর পথের দূরতার আন্দাজ দেখিয়া হাসি ও বিদ্রূপ করিলাম, কিন্তু পরে তাহা বিরক্তিতে পরিণত হইল, শেষে শিকারীকে দুই একটা শক্ত কথাও বলিতে আরম্ভ করিলাম, যেমন "এ রাস্তার তুমি কিছুই জান না" ইত্যাদি। এমন সময় সামনে অপেক্ষাকৃত একটা সঙ্কীর্ণ চড়াই রাস্তা দেখাইয়া সে বলিল "উপরের রাস্তায় চলুন আমরা ধনেটি আসিয়াছি", কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। প্রাতঃকাল হইতে আজ যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল, তারপর প্রায় ১৭ মাইল পাহাড়ী রাস্তায় ও সূর্য্যের উত্তাপে চলিয়া শরীর ও পদদ্বয় অবশ হইয়াছিল, উপরন্তু বারবার

টিহরীর পথে ধনোটির ছোট বাংলা।



ধনোটিতে দুইটি বাংলা আছে। আমরা বড়টিতে দুই রাত্রি ছিলাম। বাংলাটিতে ডাক বাংলার মত সাজ সরঞ্জাম সব আছে।

শিকারীর নির্দ্দিষ্ট ধনোটি মিথ্যা হওয়াতে প্রায় নিরাশ হইয়াছিলাম। গভীর জলে সন্তরণকারী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নদী কুলের মৃত্তিকা স্পর্শে যেমন উৎফুল্ল হয়, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। "উপরের রাস্তায় চলুন" শুনিয়া আমাদের শেষ সামর্থটুকু সংগ্রহ করিয়া সে রাস্তায় ২০।২৫ হাত চলিবার পরই ধনোটির বাংলার প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাণ্ডির আরোহী ফণী ও সত্যেন ও কতক কুলী আমাদের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তাহারা জিনিস পত্র খুলিয়া চার ব্যবস্থা করিতেছিল। আমরা আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম মনে হইল আর উঠিতে পারিব না। যাহা হউক কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ও চা পান করিয়া সে ভাব দূর হইল, পরে উঠিয়া আপন আপন শয্যা প্রস্তুত করিলাম। বাংলাটি নূতন ও বেশ প্রশস্থ, ইহাতে চেয়ার টেবিল পালঙ্গ প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম সব আছে, বাংলা এক মালি ও চৌকিদারের জিম্মায় ছিল। তাহারা আমাদের দুধ ও গরম জল আনিয়া দিল, আমরাও প্রাইমাস্ ষ্টোভে জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। মালি আমাদের জন্য রুটি, তরকারি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিল, আমরাও তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলাম না। আমাদের "বয়" পথের ক্লান্তিতে রাঁধিতে তত উৎসুক ছিল না অতএব মালির উপরই রাত্রির খাবার প্রস্তুতের ভার

দেওয়া গেল। অল্পক্ষনের মধ্যেই সে আঠার রুটি দাল ও কিছু তরকারি প্রস্তুত করিয়া আনিল ও আমরা এক একটি ক্ষুধিত জানোয়ারের ন্যায় তাহা আক্রমন করিয়া শীঘ্রই নিঃশেষ করিলাম। তাহার পরই শয়ন। এইরূপে গঙ্গোত্তরীর পথে প্রথম দিন কাটিল।

ধনোটি।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

গত রাত্রে টাণ্ডেল আসে নাই, সে আজ প্রত্যূষে আসিল। সে বলিল যে ডাণ্ডির কুলী দুই জন আসিয়াছে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে দুইটি তাম্বু আসিবার কথা তাহার মধ্যে একটি আসিয়াছে। এই তাম্বু আমরা লাণ্ডোরবাজারের এক ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে লইয়াছিলাম। কথা ছিল যে আসিবার সময় কুলীরা তাম্বু তাহাদের গুদাম হইতে লইয়া আসিবে। দুই তাম্বুর জন্য তিন জন কুলীর আবশ্যকতা ছিল, তাম্বুর কাপড়ের জন্য দুই জন কুলী ও দাণ্ডা ইত্যাদির জন্য একজন কুলী কিন্তু একজন কুলী কম হওয়াতে একটি তাম্বুর কাপড় আসে নাই। তাম্বু পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া চলিবে না। বিশেষ মালের কুলীরা দ্রুত চলিতে পারে না। আমরা এক দিনের রাস্তা অগ্রসর হইলে তাহারা তাম্বু লইয়া যে আমাদের আসিয়া ধরিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কম। আমরা সেই জন্য আজ ধনোটির বাংলায় থাকাই স্থির করিলাম; বিশেষতঃ গত কল্য প্রায় ১৭ মাইল চলার পর আজ বিশ্রাম

করিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। তবে পাহাড়ে গিয়াও মানুষের স্বাভাবিক আত্মগরিমা আমরা ভুলিতে পারি নাই তজ্জন্য দলের কেহ তাহা স্বীকার করিলেন না। দলের যে তিনজন পদাতিক তাহাদের মধ্যে চলৎশক্তি সম্বন্ধে কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে রাজি নহেন। সতীশবাবু জোড়া দুই পাম্পশুর সাহায্যে এই পথ অতিক্রমে প্রস্তুত। আমাদের মোটা বুট দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "কিছুদূর চলনা তার পর তোমাদের ওই ২॥০ সেরি বুট খুলে কাঁদে করে বইতে হবে"। এখন অপর কারণে থাকিতে হওয়ায় ইহা সকলেরই মনোমত হইল। সুবিধা পাইয়া আমরা মুসূরী হইতে ডিম, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যও কিছু আনিতে পাঠাইলাম। টাণ্ডেলকে বলিয়া দেওয়া হইল যে তাম্বু কুলী ও জিনিস পত্র সব সে আজ রাত্রের মধ্যে হাজির করিবে আমরা কাল প্রাতেঃই আবার টিহরী অভিমুখে চলিব। আজ আমরা শুইয়া বসিয়া ও ফোটোগ্রাফ্ লইয়া কাটাইলাম। বাংলাটি বেশ পরিষ্কার ও সাধারণ ডাক বাংলার মত সকল আবশ্যকীয় জিনিসপত্র আছে। মালি আমাদের জন্য এক পাঁঠা জোগাড় করিয়া আনিল। বেশ চর্ব্যচোষ্য আহার করিয়া আজ আনন্দে ও আরামে দিন কাটিল।

ধনোটি হইতে কানাতাল।

প্রায় ১০ মাইল

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

আজ ধনোটি হইতে কানাতাল যাওয়া স্থির হইল, প্রায় ১০ মাইল পথ। আমাদের প্রত্যুষেই যাওয়া স্থির হইয়াছিল। শিকারী বলিয়াছিল প্রত্যুষে উঠিয়া গেলে পথে বন্য কুক্কুট ইত্যাদি পাখি পাওয়া যাইতে পারে, তাই প্রত্যুষে শৈলেন, শিকারী ও সতীশ বন্দুক টোটা ইত্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। সতীশ বলিল কিরূপে লক্ষভ্রংশ হয় সে কেবল তাহাই দেখিতে যাইতেছে, আসল উদ্দেশ্য বেলা অধিক হইবার অগ্রে পথে যতদূর পারে অগ্রসর হইয়া থাকিবে। শিকারের দল চলিয়া যাইবার পর আমরা চা পান করিয়া জিনিস পত্র সব বাঁধাইয়া ফেলিলাম। আজ আবার কুলীদের মোট বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক কুলীকে নম্বর দিয়া এক এক খানি টিকিট দেওয়া হইল। কিন্তু যত কুলী তাহা অপেক্ষা মাল কিছু অধিক হইল,

করিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। তবে পাহাড়ে গিয়াও মানুষের স্বাভাবিক আত্মগরিমা আমরা ভুলিতে পারি নাই তজ্জন্য দলের কেহ তাহা স্বীকার করিলেন না। দলের যে তিনজন পদাতিক তাহাদের মধ্যে চলৎশক্তি সম্বন্ধে কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে রাজি নহেন। সতীশবাবু জোড়া দুই পাম্পসুর সাহায্যে এই পথ অতিক্রমে প্রস্তুত। আমাদের মোটা বুট দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "কিছুদূর চলনা তার পর তোমাদের ওই ২॥০ সেরি বুট খুলে কাঁদে করে বইতে হবে"। এখন অপর কারণে থাকিতে হওয়ায় ইহা সকলেরই মনোমত হইল। সুবিধা পাইয়া আমরা মুসূরী হইতে ডিম, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যও কিছু আনিতে পাঠাইলাম। টাণ্ডেলকে বলিয়া দেওয়া হইল যে তাম্বু কুলী ও জিনিস পত্র সব সে আজ রাত্রের মধ্যে হাজির করিবে আমরা কাল প্রাতেঃই আবার টিহরী অভিমুখে চলিব। আজ আমরা শুইয়া বসিয়া ও ফোটোগ্রাফ্ লইয়া কাটাইলাম। বাংলাটি বেশ পরিষ্কার ও সাধারণ ডাক বাংলার মত সকল আবশ্যকীয় জিনিসপত্র আছে। মালি আমাদের জন্য এক পাঁঠা জোগাড় করিয়া আনিল। বেশ চব্যচোষ্য আহার করিয়া আজ আনন্দে ও আরামে দিন কাটিল।

ধনোটি হইতে কানাতাল।

প্রায় ১০ মাইল

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

আজ ধনোটি হইতে কানাতাল যাওয়া স্থির হইল, প্রায় ১০ মাইল পথ। আমাদের প্রত্যুষেই যাওয়া স্থির হইয়াছিল। শিকারী বলিয়াছিল প্রত্যুষে উঠিয়া গেলে পথে বন্য কুক্কুট ইত্যাদি পাখি পাওয়া যাইতে পারে, তাই প্রত্যুষে শৈলেন, শিকারী ও সতীশ বন্দুক টোটা ইত্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। সতীশ বলিল কিরূপে লক্ষভ্রংশ হয় সে কেবল তাহাই দেখিতে যাইতেছে, আসল উদ্দেশ্য বেলা অধিক হইবার অগ্রে পথে যতদূর পারে অগ্রসর হইয়া থাকিবে। শিকারের দল চলিয়া যাইবার পর আমরা চা পান করিয়া জিনিস পত্র সব বাঁধাইয়া ফেলিলাম। আজ আবার কুলীদের মোট বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক কুলীকে নম্বর দিয়া এক এক খানি টিকিট দেওয়া হইল। কিন্তু যত কুলী তাহা অপেক্ষা মাল কিছু অধিক হইল,

সকলেই বোঝা লঘু করিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে টাণ্ডেল নিজেই কিছু লইল ও কিছু "বয়ের" জন্য রাখিল। "বয়" বোঝা লইতে একেবারে নারাজ, যাইহউক আমাদের ধমক্ ধামকে একটি ছোট বোঝা লইল কিন্তু টাণ্ডেলের সহিত ব্যবস্থা করিয়া পথে তাহা অপর কুলীর পৃষ্ঠে চাপাইয়াছিল। পরে আমরাও বুঝিয়াছিলাম মাল বহা তাহার কাজ নয় ও তাহাকে সে কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম। এ পথের কুলীরা পৃষ্ঠে বোঝা বয়। বোঝাটিকে দড়ী দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাধিয়া লয় ও দুই পার্শ্বে দড়ীর দুইটি ফাঁসের মত করে। বোঝার সাম্নে বসিয়া দুই হাত সেই দুই ফাঁসের মধ্যে গলাইয়া দেয় তার পর বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ফাঁস দুইটি প্রায় কাঁধের কাছে আট্কাইয়া থাকাতে হাত দুইটি খালি থাকে তাহাতে এই দুরুহ পথে অনেক সুবিধা হয়। কুলীরা প্রত্যেকেই এক একটি ছোট লাঠি লইয়া চলে। ইহারা ১॥০।২ মাইল অন্তর প্রায়ই অল্প ক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে। শক্ত চড়াই হইলে আরও অল্পদূর চলিয়া বিশ্রাম করে। বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে একটি উচ্চ স্থান দেখিয়া পৃষ্ঠের মোট নামায় ও হস্তস্থিত ছোট যষ্টির দ্বারা মোটটিকে ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে ইহাতে মোট উঠাইবার সময় সুবিধা হয়, কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত দড়ির ফাঁসে হাত গলাইয়া

আমাদের কতিপয় ছোকরা কুলী ও কতিপয় পাহাড়ী বালক বালিকা।



ছবির বামদিকে সহাস্য বদন একটি কুলী বালক। দক্ষিণ দিকে আমাদের একটি বাক্সের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

লইলেই মোট পৃষ্ঠে নিয়া চলিতে পারে। ইহারা পথে প্রায়ই আমাদের অপেক্ষা আস্তে চলিত ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১৫ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টা পরে পহুঁছিত। তামাকু পান করিতে ইহারা অত্যন্ত অভ্যস্ত। তামাকুর পাতা কুটিয়া গুঁড়া করিয়া সঙ্গে লইত ও এক অভিনব উপায়ে তাহা সেবন করিত। ইহাদের সঙ্গে কয়লা, টিকা, হুকা এমন কি কলিকা পর্য্যন্ত ছিলনা। পথে এক প্রকার গাছ প্রায়ই দেখা যাইত, তাহার একটি পাতা লইয়া ঠোঁঙ্গার ন্যায় প্রস্তুত করিত, পরে তাহাতে গুঁড়া তামাকু দিয়া দেশলাই বা অপর কোন উপায়ে অগ্নি সংযোগ করিত। গুঁড়া তামাক আস্তে আস্তে জ্বলিত ও তাহারা ঠোঁঙ্গার সরু দিকে মুখ দিয়া ধুম পান করিত। তামাক পুড়িয়া যাইত কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পাতাটি পুড়িত না। কতকটা ইংরাজী পাইপের ন্যায় এই পাতার পাইপে ইহারা তামাকু পান করিত। আর পাইপ একবার জ্বালা হইলে যে কুলী সেখান দিয়া যাইবে সেই একবার বসিয়া টানিয়া লইবে ইহাতে বয়সের কোন পার্থক্য নাই। অল্প বয়সের ছোক্‌রা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত একই ভাবে তামাকু সেবন করিত। ইহারা কখন একটি সিগারেট পাইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। ধনোটি বাংলা হইতে নামিয়া কিছুদূর উৎরাই তারপর আবার কিছু

চড়াই পাওয়া গেল, কিন্তু আজ চড়াই অধিক ছিল না। রাস্তা ভাল, তবে স্থানে স্থানে প্রস্তর উঁচু হইয়া আছে। সেই সব স্থানে সাবধান হইয়া না চলিলে পা মচ্‌কাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কোথায় বা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া তীব্র ফলকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের মোটা জুতা থাকাতে তত কষ্ট হয় নাই কিন্তু যাহারা খালি পায়ে চলে তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা। যাহা হউক এইরূপ রাস্তা বড় অধিক ছিল না বেলা ১১টা আন্দাজ ৬ মাইল পথ চলিবার পর আমরা একটি ছোট ধর্ম্মশালায় আসিলাম। ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, দেওয়াল ও মেঝেতে মাটির ও গোময়ের প্রলেপ দেওয়া। উপরে উঠিবার একটি কাষ্ঠের সিঁড়ি আছে। উপরে উঠিয়া দেখি ঘর নাই কিন্তু একটি প্রশস্ত ও আচ্ছাদিত বারাণ্ডা আছে। ধর্ম্মশালা রক্ষক একটি সৎরঞ্চ বিছাইয়া দিলে আমরা সকলে বসিলাম। বুট জুতা ও পট্টি খুলিয়া ফেলিলাম, তাহাতে পায়ের আরাম হইল। ইহার পর প্রত্যহ যখন আমরা পথের মাঝে আহারের জন্য থামিতাম তখন জুতা, মোজা ও পট্টি খুলিয়া পায়ে হাওয়া লাগাইতাম ও পট্টি ও মোজা রৌদ্রে দিতাম। মোজা ও পট্টি পশমী হওয়াতে রৌদ্রে ফুলিয়া বেশ নরম হইত, পুনরায় পরিয়া চলিবার সময় কষ্ট হইত না। আজিকার রাস্তায় পূর্ব্বাপেক্ষা

ছায়া ছিল ও মধ্যে ঝরণা পাওয়া গিয়াছিল। ঝরণার জল অতি পরিষ্কার ও শীতল। তবে আজিও চলিবার সময় রৌদ্রের উত্তাপে কষ্ট হইয়াছিল। বারাণ্ডায় বসিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল কিন্তু বিশ্রামে শীঘ্রই বাধা পড়িল। আমাদের "বয়" রাঁধিবার জন্য জোগাড় করিতে গিয়া কুলীদিগকে কাঠ ও জল আনিতে বলিল। এ পথের দস্তুর যে কুলীরা উপরোক্ত দুই কার্য্য করিবে। কাঠ আহরণ বিশেষ দুরুহ নহে, চতুর্দ্দিকেই বন, বৃক্ষ ও শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠ রহিয়াছে, পর্ব্বতের গাত্র হইতে আহরণ করিলেই হইল। ঝরণা নিকট দেখিয়াই আড্ডা করা হইত, কাজেই জল আনাও বিশেষ কষ্টকর নহে। নীচে কিছুক্ষণ গোলমাল শুনিবার পর "বয়" আসিয়া আমাদের নিকট নালিশ করিল যে কুলীরা কাঠ ও জল আনিতেছে না। আমরা সকলেই তখন ক্লান্ত কাজেই গোলমালে সকলেই বিরক্ত হইলাম। শৈলেন উপরের বারাণ্ডা হইতে কুলীদিগকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিল ও হস্ত পদ যেরূপ ভাবে চালনা করিল (অবশ্য কাহারও উপর নহে), যে কুলীদের মধ্যে যদি কেহ মনে করিয়া থাকিত যে শীঘ্রই তাহাদের উপর হস্ত পদ ঐরূপ ভাবে চলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা বিশেষ ভুল করে নাই, কেননা তাহার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। রূদ্র মূর্ত্তি দেখিলে আমাদের দেশের

কুলী ও সেই শ্রেণীর লোক অনেক সময় ভয় পাইয়া নরম ও সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। হ্যাটকোট ধারী যদি রুদ্র মূর্ত্তি হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই, তাহার জন্য কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকে না। কিন্তু এই স্থলে, ৬০০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের মধ্যে, এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল। তিরস্কারের প্রথম আক্রমণে কুলীরা যেন একটু দমিয়া গেল কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল টুপির দাসত্ব ও হিমালয়ের স্বাধীন বায়ুর মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়াছে। শীঘ্রই কুলীদের মধ্যে দুই একজন অপর কুলীদিগকে কি বলিতে লাগিল, এবং শুনা গেল তাহারা বলিতেছে "চল্ মুসূরী চলা জাগা উঁহা বহুৎ নোকরী মিলবে দোসাদ চামারকে বাৎসে কাম নেহি করেগা"। শেষোক্ত কথাগুলি আমাদের "বয়"এর উদ্দেশ্যে তাহা পরে বুঝিলাম। বক্তাদের দলে শীঘ্রই বেশ লোক জুটিল ও ১৫।১৬ জন কুলী গজ্‌গজ্ করিতে করিতে মুসূরী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এমন কি তাহাদের যে মজুরী পাওনা হইয়াছিল তাহাও চাহিল না। এই সকল কুলী, ফণী ও সত্যেনের ডাণ্ডির কুলী ও তাহাদের সঙ্গে অপর দুই একজন মোটের কুলীও ছিল। শৈলেনের ফ্রণ্টাল এটাক্ (সম্মুখ যুদ্ধে) কিছু হইল না দেখিয়া ফণী ও সত্যেনের ত একেবারে কোলাপ্স (collapse) নাড়ীছাড় ছাড়। আমরা তিনজন

ত চলিতে প্রস্তুত, কিন্তু উহারা ডাণ্ডির ভরসায় আসিয়াছে পথের মাঝে—মুসূরী ২৪ মাইল, টিহরী ১৬ মাইল গঙ্গোত্তরীর ত কথাই নাই—অপর কোন উপায় নাই। মুসূরী ফিরিতে হইলেও উহাদের পক্ষে এখন ২৪ মাইল চলা সহজ নয়। আমি দেখিলাম এখন ডিপ্লোম্যাসির (কুটনীতির) সময় আসিয়াছে, অতএব মূর্ত্তি অতি মোলায়েম্ ও স্বর অতি নরম করিয়া বলিলাম "ওহে বাপু তোমরা চলিয়া যাইতেছে কেন" (অবশ্য হিন্দিতে কথা বলিয়া ছিলাম কিন্তু "আমারা পালায়গা নাত ভয় করেগা নাকি" এই ছন্দের হিন্দি আর এস্থলে লিখিতে ইচ্ছা করি না)। তাহারা বলিল "বয়" ছোট জাত সে তাহাদিগকে হুকুম করিয়াছে ও গালি দিয়াছে, তাহারা উহার চাকর নয়, এমন কি সে তাহাদের যাহা বলিয়াছে তাহাতে তাহারা তাহার জান লইতে প্রস্তুত। তক্‌রার্ হইয়াছিল কাষ্ঠ আনিবার জন্য ও জল তুলিবার জন্য, এখন তাহারা মানিয়া লইল যে এই দুই কাজ করিতে তাহারা প্রস্তুত কিন্তু "বয়ের" হুকুম তাহারা শুনিবে না। তাহারা শিকারী ও টাণ্ডেলের হুকুম শুনিবে ও অবশ্য মনিব যাহা বলিবে করিবে। আমি বলিলাম "তথাস্তু তোমাদের বয়ের হুকুম শুনিবার আবশ্যক নাই আমরা শিকারী ও টাণ্ডেলের দ্বারায় তোমাদের হুকুম করিব"। "বয়"কেও আমরা দুই চার ধমক দিলাম সেও

চুপচাপ্ আপন কাজ করিতে লাগিল। তাহার পাহাড়ী মেজাজ বড় একটা দেখি নাই বরং অতগুলি রাগত কুলী দেখিয়া চুপচাপ্ কার্য্যে মনোনিবেশ করাই নিরাপদ ভাবিয়াছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম ডাণ্ডি কুলীদের মধ্যে ৪।৫ জন লোক বড় তক্‌রারি সুযোগ পাইলেই গোলমাল করিত এবং দলের মধ্যে তাহারাই সকলকে আমাদের বিরোধী করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ইহারা টাণ্ডেলের কথা শুনিত না শিকারীর ত কথাই নাই। সে অতি নির্ব্বিবাদি ছিল গোলমালের মধ্যে থাকিতে চাহিতনা। কুলীরা শান্ত হইলে, ফণী ও সত্যেন আমার ডিপ্লোম্যাসির (কূটনীতির) প্রশংসা করিল। সতীশ বলিল "ও ডিপ্লোম্যাসি ফিপ্লোম্যাসি নয় এক মাসের জন্য দৈনিক আট আনা নিশ্চিৎ মজুরী ছাড়িয়া অনিশ্চিৎ রোজগারের চেষ্টায় চলিয়া যাওয়া এ কুলীদের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়, রাগের মুখে যাইতেছিল আবার ফিরিয়া আসিত"। ইহা যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে, তবে ইহাদের মেজাজ আমাদের দেশের কুলী মজুরের মেজাজ হইতে বিভিন্ন। কিছু পরে দেখা গেল একটি কুলী একটি আপেল্ খাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে আর কিছু আগে একটি বাজার আছে সেখানে আপেল পাওয়া যায়। আমরা মহা আগ্রহে

১ সের আপেল আনিতে দিলাম। আপেল আসিলে কিন্তু আগ্রহ কমিয়া গেল, বড় বড়গুলি অত্যন্ত অম্লরস (টক্) দুই একটি ছোট অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। এস্থলে প্রায় ২ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম সিকি মাইল আন্দাজ চলিয়া পূর্ব্বোক্ত বাজারে আসিলাম। বাজারে ৪।৫ খানি দোকান, একটি মুদির দোকান, একটি মিষ্টান্নের দোকান, সেখানে পেঁড়া প্রস্তুত করিয়াছে কিন্তু সেগুলি এত কৃষ্ণবর্ণ যে চিনির অপেক্ষা ধুলার ভাগই বেশী বলিয়া বোধ হইল। বাজারে কিছু কিনিতে হইবে বলিয়া আমরা কিছু পেঁড়া কিনিলাম কিন্তু অল্প মুখে দিয়াই আর চলিল না। তার পর আপেল দেখা গেল। একটি ছোট ঘরে গাদা করিয়া ঢালা আছে, অর্দ্ধেক ঘর প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। দুই রকম আপেল দেখিলাম, বড়গুলি অপক্ক ও টক্ ছোটগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। আমরা দুইরকম মিলাইয়া /২ সের লইলাম, ।০ আনা করিয়া সের। শুনিলাম গঙ্গোত্তরীর পথে হর্‌শিল্ নামক স্থানে ভাল আপেল পাওয়া যায়। প্রায় ২ মাইল পথ গিয়া আমরা একটি পাক্‌ডাণ্ডি পাইলাম। আমি ও শৈলেন পাক্‌দাণ্ডি পথেই চলিলাম। এই পথে একটি ছোট পাহাড় পার হইতে হয়। সাধারণ রাস্তা পাহাড় ঘুরিয়া গিয়াছে। পাক্‌দাণ্ডি পথে প্রায় অর্দ্ধ

মাইল রাস্তা কম চলিতে হয়। নামিবার মুখে দেখিলাম এক দল পাহাড়ী ও স্ত্রী পুরুষ একটি ছাগল লইয়া চলিয়াছে ও একজন কাঠি দিয়া একটি ঢোলক বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে। শিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম নিকটস্থ পাহাড়ে দেবী মুর্ত্তির নিকট বলিদান দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। আজ বাঙ্গালা দেশে নবমী পূজা, নবমী পূজার দিন বলিদান বাঙ্গালা দেশের একটি প্রথা। বলিদানে যদিও আমার বিশেষ সহানুভুতি নাই, কিন্তু আজ এই দূর হিমালয়ের মধ্যে বলিদানের কথা শুনিয়া দেশের কথা মনে পড়িল, প্রাণের ভিতর যেন একটা পরিচিত সুর বাজিল। দূর হইতে আপন জিনিস মধুরতর বোধ হয় সে কথা সত্য। আরও মাইল দুই চলিয়া আমরা প্রায় অপরাহ্ণ ৫টার সময় কানাতাল বাংলায় পৌঁছিলাম। বাংলার পার্শ্ব হইতেই একটি বড় ঝরণা রাস্তার উপর দিয়া পাহাড়ের তলদেশে পড়িয়াছে। বাংলাটি একটু উচ্চ স্থানে অবস্থিত হওয়াতে রাস্তা হইতে উঠিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত কাটিয়া দেওয়া আছে। ঝরণার কতক জল সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। উঠিবার সময় আমাদের জুতা বাঁচাইয়া উঠিতে হইল। বাংলাটি ধনোটির বাংলা হইতে ছোট কিন্তু পাকা দুইটি ঘর আছে। আজ আমাদের মধ্যে কেহই বিশেষ ক্লান্ত হয় নাই। শীঘ্রই চা প্রস্তুত হইল, চা পান

করিয়া গল্প গুজব করা গেল। বাংলার নিকটেই এক বেনের দোকান ছিল সেখানে ভাল ঘী ও দুধ পাওয়া গেল। অন্য সমস্ত জিনিসই প্রায় আমাদের সঙ্গে ছিল। এখানে রাত্রে বেশ শীত বোধ হইয়াছিল। ঝরণার শব্দ শুনিতে শুনিতে রাত্রে নিদ্রাসুখ লাভ করা গেল। নিকটেই কুলীদের জন্য ঘর ছিল, তাহারা তথায় গিয়া আড্ডা করিল।

যমুনোত্তরী

কানাতাল হইতে টিহরী।

প্রায় ১৪ মাইল

১লা অক্টোবর ১৯১৪।

আজ আমাদের টিহরী পৌঁছিবার কথা, প্রায় ১৪ মাইল পথ চলিতে হইবে; তবে শুনিলাম আজ শীঘ্রই উৎরাই আরম্ভ হইবে। কানাতালের বাংলা প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত আর টিহরী কেবলমাত্র ৩০০০ ফুট। চা পান করিয়া ও জিনিস পত্র বাঁধিয়া আমরা বেলা প্রায় ৮ টার সময় টিহরা অভিমুখে চলিলাম। কুলীরা আপন আপন মোট এক প্রকার বুঝিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য আজ আর কুলীদের লইয়া বিশেষ কোন গোল হইল না। মালপত্র টাণ্ডেলের হাতে ছাড়িয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। মাইল দুই আসিয়া একটি রাস্তা দেখিতে পাইলাম, যাহারা টিহরীর রাজধানী না যাইতে চাহেন তাহারা এই পথে ভড়লানা নামক স্থানে যাইতে পারেন। ভড়লানা এ স্থল হইতে প্রায় ৮ মাইল। আমরা সে পথ ছাড়িয়া টিহরীর পথেই চলিলাম, উদ্দেশ্য সহর দেখা ও রাজ দরবার হইতে শীকারের জন্য পাশ লওয়া। আর ও ৪ মাইল পথ আসিয়া আবার দুইটি পথের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,। সমস্ত পথই আমরা অল্প অল্প নামিতেছিলাম। আমাদের

দক্ষিণদিকের পথটি একেবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে, ইহাই টিহরীর পথ। অপর পথটি উপরের দিকে উঠিয়াছে। শুনিলাম এই পথ দিয়া প্রতাপনগর যাইতে হয়। প্রতাপ নগর টিহরীর নিকট সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। সেখানে টিহরীর রাজার একটি গ্রীষ্ম নিবাস আছে। টিহরী হইতে প্রতাপ-নগরের বাড়ী ঘর অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ-নগরের পথ বামে রাখিয়া দক্ষিণের পথ দিয়া আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। এপথে দৃশ্য কিন্তু বদলাইয়া গেল। এতক্ষণ আমরা সুন্দর বন উপবনের মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, এখন ক্রমেই বৃক্ষের সংখ্যা কমিয়া পর্ব্বত গাত্রে কাল পাথর ও মাটিই অধিক দৃশ্য হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল উৎরাই সহজ, কিন্তু ক্রমাগত ৪৫° ডিগ্রির হেলান রাস্তায় নামিয়া পা শীঘ্রই ব্যথা হইল এবং হাঁটুর উপর অধিক জোর পড়িতে লাগিল। আর কিছুদূর নামিতে নামিতে আমার বাম পদের হাঁটুর নিকট একটি ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। মাস্‌কুলার পেন মনে করিয়া তত গ্রাহ্য না করিয়া চলিলাম কিন্তু যতই নামিতে লাগিলাম ব্যথাও তত বাড়িতে লাগিল। আজ সূর্য্যের উত্তাপও অধিক উষ্ণ বোধ হইল, চলিতে চলিতে দাঁড়াইলে আর তত সুন্দর শীতল বাতাস পাওয়া গেল না।

বেলা ১০টা আন্দাজ এক গাছের ছায়ায় বসিয়া সঙ্গের রুটি ও তরকারী খাওয়া গেল। আজ কিন্তু পথের শ্রান্তি বেশী বোধ হওয়াতে আহারে তত রুচি ছিল না। আহার শেষ করিয়া আমরা আবার শীঘ্রই চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখনও টিহরী পৌঁছিতে প্রায় ৬।৭ মাইল পথ বাকি। আমার গতি এখন অতি মৃদু হইয়া আসিয়াছে কাজেই অপর সকলে আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। আজ উৎরাই পাইয়া ফণী ও সত্যেনের ডাণ্ডি বাহকগণ অতি উৎসাহের সহিত চলিয়াছে। উৎসাহের আরও এক কারণ ছিল। তাহাদের অধিকাংশেরই বাড়ী টিহরীর নিকট ও টিহরী সহর তাহারা বেশ ভালরূপে জানে। তথায় কাহারও কাহারও আত্মীয় বন্ধুও বাস করে। আমার সঙ্গীরা শীঘ্রই দৃষ্টির বাহির হইল। আরও দেড় দুই মাইল যাইবার পর এক নদী গর্ভে আসিয়া পৌঁছিলাম। নদীটি একটি কাষ্ঠের পুলে পার হইয়া অপর পারে অল্প চড়াই পাইলাম। সমস্ত সকাল উৎরাই করিয়া এ চড়াই ভাল লাগিল। কিন্তু এ সময় আমার রীতিমত কষ্ট হইতেছিল। পায়ের ব্যথা, রৌদ্রের তেজ, ধুলা, ছাওয়ার অভাব এই সকল কারণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। চড়াই প্রায় শেষ করিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জলের বোতল হইতে প্রাণ ভরিয়া

জল পান করিলাম। পাহাড়ের গায়ে পৃষ্ঠ দিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া আছি, কিছু পরেই একদল মিউল সেই পথ দিয়া টিহরীর দিকে গেল। প্রথম মিউলটি রাস্তার মাঝে কি এক অদ্ভুৎ জানোয়ার বসিয়া আছে মনে করিয়া একবার একটু ইতঃস্তত করিয়া অগ্রসর হইল। আমিও মিউলের খুরোত্থিত ধুলা অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম, কেননা তখন যেন আর উঠিবার শক্তি নাই বলিয়া বোধ হইল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট বিশ্রামের পর অগ্রসর হইলাম। ১ মাইল চলার পর আবার দুই পথের সন্ধিস্থলে আসিলাম। বামদিকের পথ ভড়লানা হইয়া গঙ্গোত্তরীর দিকে গিয়াছে আর দক্ষিণ দিকের পথ টিহরীর দিকে গিয়াছে। এখান হইতে টিহরী প্রায় তিন মাইল। এই সন্ধিস্থলে একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে। তাহার গোড়াটি বেশ বাঁধান ও ছায়াযুক্ত, ক্লান্ত পথিককে যেন বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছে। দেখিলাম আমাদের দুই চারি জন কুলীও সেখানে তাহাদের মোট নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুসূরী আসার পর আজ প্রথম সমতল ভূমি দৃষ্টি গোচর হইল। গত কয়েক দিন পাহাড়ের গাত্রে হয় উঠিয়াছি নয় নামিয়াছি। আমি যে স্থলের কথা বলিতেছি তথা হইতে টিহরীর দিকে যাইতে হইলে এক বিস্তৃত সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। টিহরী হইতে উত্তর

কাশী পর্য্যন্ত এরূপ প্রান্তর অনেক গুলি পাইয়াছিলাম। এগুলি দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ উপত্যকা কিন্তু প্রায় সমতল। দেখিলাম উহাতে প্রচুর ধান্য হইয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে এরূপ ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়া আবার শস্য শ্যামলা দেশের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় ছিল না। তখন ভাবনার বিষয় তিন মাইল পথ কোন ক্রমে অতিক্রম করা। সঙ্গীরা সকলে অদৃশ্য হইয়াছে আমি কোন ক্রমে পা টানিয়া অগ্রসর হইতেছি। সূর্য্যের প্রখরতা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম, পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ ছাড়া আর বড় গাছ দৃষ্টি পথে পতিত হইল না। সে দেশ-বাসী লোক দুই চারিটির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইল। তাহারা টুপি দেখিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। মেয়েরা কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। আরও প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া আর একটি বড় গাছ পাইলাম। তাহার ছাওয়ায় বসিয়া বোতলের জল শেষ করিলাম। তারপর গাছের শিকড়ে মস্তক রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া অতি কষ্টে বাকি পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। আজ দশহরা বা দূর্গা পূজার বিসর্জ্জন। টিহরীর লোকেরাও সব উৎসবে মত্ত। দূরে সহরের

বাড়ী ঘর দেখিতে পাইলাম। ক্লক টাউয়ারের মত একটি টাউয়ার (tower) বা স্তম্ভ রহিয়াছে দেখিলাম। টিহরী সহর বেষ্টন করিয়া একদিকে গঙ্গা ও অপর দিকে অলক নন্দা প্রবাহিতা। এই নদীদ্বয়ের স্রোতের তীব্র ঘর্ঘর শব্দ ও দশহরার বাদ্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। মনে আশার সঞ্চার হইল এইবার টিহরী পৌঁছিব। সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উৎরাই পাইলাম। পথে অগণ্য নুড়ি পড়িয়া আছে। এই উৎরাইয়ের শেষে তারের রজ্জুতে ঝোলান একটি কাষ্ঠের পুল গঙ্গার উপর রহিয়াছে। এই পুল দিয়া গঙ্গা পার হইয়া টিহরী সহরে ঢুকিতে হয়। কলিকাতা ছাড়িবার পর গঙ্গার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। এখানে কিন্তু গঙ্গার অন্য মূর্ত্তি। কবি হইলে সুবিধা মত গঙ্গার বর্ণনা করিতাম। সে যা হোক এখন ছোট খাট একটা উপমা না দিয়া ছাড়িতেছি না। গঙ্গা যেন এ স্থলে তরুণী, এখনও বাল সুলভ চাপল্য রহিয়াছে তাই যেন লঘু পদে বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু চাপল্যের সহিত যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই আর বাধা বিপত্তি কিছু মানিতে চাহিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত পুলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিলাম দুই দিকে কাল পাহাড়ের মধ্য দিয়া, বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সকলকে সবলে আঘাত করিয়া, সফেন তরঙ্গ রাশির দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত ও উলঙ্ঘন

করিয়া প্রচণ্ড বেগে নিম্নমুখে ধাবমান হইতেছে। এস্থল হইতে গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত গঙ্গার এই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃশ্য পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই অবিরাম দ্রুত গতি। পুল পার হইয়া টিহরী সহরে প্রবেশ করিলাম। স্থানটিকে দেখিয়া পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। কিছুদূর গিয়া সহরের মধ্যে দ্বিতল ধর্ম্মশালা পাইলাম। আমার সঙ্গীরা এই স্থানেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। সহর বলিতে কলিকাতা কি বোম্বাই যেন কেহ বুঝিবেন না, তবে পশ্চিমের ছোট সহরের সঙ্গে কতক সাদৃশ্য আছে। বাড়ীগুলি ছোট ছোট দ্বিতল। আমরা যে রাস্তায় ছিলাম এইটিই প্রধান রাস্তা বলিয়া বোধ হইল। রাস্তাটি বেশ চওড়া। বাড়ীগুলির নীচের ঘরগুলিতে দোকান। ধর্ম্মশালার সম্মুখে রাস্তার অপর পারে ডাক ও টেলিগ্রাফ্ অফিস্। ধর্ম্মশালাটি বেশ প্রশস্ত। দ্বিতলে ৪।৫টি ঘর, ঘরের সম্মুখে চওড়া বারাণ্ডা ও বারাণ্ডার সম্মুখে ছাদ। আমাদের জিনিস কতক বারাণ্ডায় ও কতক ঘরে রাখা হইল। ঘরগুলিতে যতদূর সম্ভব আলো ও হাওয়া অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আমরা সেই জন্য বারাণ্ডাই শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের সঙ্গের খাট খুলিয়া বিছান হইল। সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মশালা একেবারে খালি

ছিল কেবল একজন রক্ষক ছিল। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম টিহরীতে দুইজন বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা টিহরী স্কুলের হেড ও সেকেণ্ড মাষ্টার। আজ দশহরা অর্থাৎ আমাদের দেশের বিজয়ার দিন। বিজয়া বলিতে বাঙ্গালীর প্রাণে কেমন এক দুঃখ জড়িত শান্তির ভাব আসে। সে দিন তর্ক বিবাদ ভুলিয়া সকলকে আপনার করিয়া নিতে মন কেমন ব্যাকুল হয়। বাঙ্গালী যতই কেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হন না বিজয়ার প্রেম আলিঙ্গন তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পূজার অবকাশে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তথায় একটি বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের সহিত আমাদের আলাপ হয়। দেখা হইলে ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গলা ভাষায় তিনি কখনও কথা বলিতেন না, ও কথায় ও ভাবে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর আচার ও ব্যবহারের বিদ্বেষী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি গল্পও শুনা গিয়াছিল যাহাতে তাঁহার উক্ত ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। বিজয়ার পরদিন প্রাতে আমরা দার্জ্জিলিং নিবাসী বন্ধু বান্ধবের সহিত বিজয়ার সম্ভাষণ করিতে বাহিত হইয়া-

ছিলাম। পথে এই বাঙ্গালী সাহেবটির সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা, তাঁহাকে বিজয়া সম্ভাষণ করা উচিৎ কিনা, এই বিষয় স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন বিশেষ ইতস্ততঃ না করিয়া, "আসুন মহাশয় বিজয়ার কোলাকুলি করা যাক" বলিয়া, ও তাঁহাকে কথা কহিবার কোন অবসর না দিয়া, রাস্তার মধ্যে তাঁহার সেই বাঙ্গালী সাহেব মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। বাঙ্গালী সাহেব কি ভাবিলেন জানি না কিন্তু তাঁহাকে একে একে আমাদের সকলের আলিঙ্গন সহ্য করিতে হইল। বোধ হয় তিনি ভাবিতেছিলেন কোন ইউরোপীয় নর নারী সে দৃশ্য না দেখিতে পায়। এগল্প বলার উদ্দেশ্য, যে পসন্দ না করিলেও বাঙ্গালী হইয়া বিজয়ার সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যাহা হউক আমরা বাঙ্গালীর বিজয়া ভুলি নাই, তাই টিহরীতে কোন বাঙ্গালী থাকেন কিনা খোঁজ করিলাম, ও দুইজন বাঙ্গালী থাকেন শুনিয়া আমাদের আগমন সংবাদ তাঁহাদের প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইল। আমি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা রক্ষকের হস্তে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের নিকট পাঠাইলাম, ফলে সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় শিক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লোকটি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। আমরা বেশ আগ্রহের সহিত ও অসঙ্কোচে তাঁহার

সহিত আলাপ করিতে চাহিলাম, কিন্তু তাঁহার কিছু সংঙ্কোচ ভাব লক্ষ্য হইল ; বোধ হয় অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক বা মধ্য বয়স্ক লোকের সহিত বিদেশে আলাপ করিতে সে সময় ভারত-বর্ষের অনেক লোকেই কিছু সঙ্কুচিত হইতেন। তবে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে সে সংঙ্কোচ ভাব কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক পরদিন আবার আসিবেন ও প্রধান শিক্ষককে লইয়া আসিবেন বলিয়া মাষ্টার মহাশয় বিদায় হইলেন। আমাদের টিহরী যাইবার প্রধান কারণ রাজ সরকার হইতে বন্দুকের পাশ জোগাড় করা। এই দিন সে সম্বন্ধে কোন কাজ হইল না। দশহরার জন্য বিকালে টিহরীর ফৌজ্‌দের প্যারেড্ ছিল শুনিলাম সকল আফিসই বন্ধ ও কর্ম্মচারীরা প্যারেড্ ও দশহরার উৎসবে ব্যস্ত। আমাদের ধর্ম্মশালার কিছু উচ্চে পাহাড়ের উপর সমতল ভূমিতে প্যারেড্ হইতেছিল, ধর্ম্মশালা হইতে তাহা দেখা গেল না, তবে, বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ পাহাড়ের গা দিয়া তামাসা দেখিবার জন্য উপরে উঠিতেছে, আমরা দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে যে ফৌজের কথা বলিলাম তাহা ইংরাজের শিক্ষিত গুরখা সৈন্য। টিহরীতে সর্ব্ব সময়েই প্রায় ২৫০ জন ইংরাজদের সৈন্য থাকে। ইহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নেতার অধীন, কিন্তু ইহাদের সকল ব্যয় টিহরী ষ্টেট্‌কে বহন করিতে হয়।

যমুনোত্তরী

টিহরী।

২রা অক্টোবর ১৯১৪।

আজ প্রাতে আমি ও শৈলেন শিকারীকে সঙ্গে লইয়া উজীর ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিতে গেলাম, উদ্দেশ্য বন্দুকের পাশ জোগাড় করা, কেননা পূর্ব্ব রাত্রে আমরা দুই একটি স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম সে সময় গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তর কাশীর ঊর্দ্ধে শিকারের পাশ বন্ধ ছিল। ধর্ম্মশালার সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে সেইটিই সহরের প্রধান রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে কিছুদূর পর্য্যন্ত দোকান রহিয়াছে, ব্যবসাদার কিছু মারোয়ারী ও বাকি পাহাড়ী, কাপড় কম্বল, ইত্যাদির দোকানই অধিক। ক্রমে উঠিতে উঠিতে আমরা স্কুল ছাড়াইয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি স্তম্ভের নিকট আসিলাম। ইহার উপর একটি বড় ঘড়ী আছে তাহা টিহরী সহরে সময়ের গতি বিজ্ঞাপন করে। কিন্তু টিহরী সহরের এই ঘড়ী আমাদের সাধারণ ঘড়ীর মত সময় রাখে না। সে তাহার ইচ্ছামত কখন থামে কখন চলে। এক কথায় সে ঘড়ীর মতে ২৪ ঘণ্টায় দিন

হয় না। আর কিছু উর্দ্ধে উঠিয়া আমরা কতকগুলি পাকা ইমারত দেখিলাম। শুনিলাম সে গুলি আদালত ও কারাগার। এই দুইয়ের এত নিকট সম্বন্ধ দেখিয়া সে দেশের আসামিদের প্রতি কিছু সহানুভূতি হইল। তারপর একটি বড় ফাটক পার হইয়া আমরা একটি বাগানের মধ্য দিয়া এক দ্বিতল বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত ফটকের নিকট দুইজন প্রহরী ছিল। আমাদের দেখিয়া একবার যেন তাহাদের দৃষ্টিতে প্রশ্নের ভাব দেখিলাম। কিন্তু টুপির কি গুণ, ইহা ভারতবাসীকে ভেড়া বানাইয়াছে, প্রশ্ন আর উচ্চারিত হইল না, আমরা গম্ভীর ভাবে ফটক পার হইলাম। উপরোক্ত বাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলাম একজন শান্ত্রী পাহারা দিতেছে অপর কতকগুলি লোক নীচের বারাণ্ডায় বসিয়া লিখিতেছে ও কথা বার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে উজীর ও প্রাইভেট সেক্রেটারী দুইজনেই সেই বাড়ীতে উপস্থিত আছেন। আমরা আমাদের কার্ড পাঠাইয়া দিবার কিছু পরে একজন লোক আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। শিকারীকে তথায় রাখিয়া আমরা সেই লোকের সহিত এক ঘোরাণ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির নীচে ও উপরে আরও শান্ত্রী দেখিলাম কিন্তু তাহারা আমাদের

কিছু বলিল না। সঙ্গের লোক আমাদের একটি ঘরে লইয়া গেল। তথায় দেখিলাম একটি কাষ্ঠের বড় গোল টেবিল ও তাহার চতুর্দ্দিকে ৫।৬ খানি কাষ্টের চেয়ার রহিয়াছে। তাহারি দুইটিতে দুইটি লোক আসীন। একটির পরিহিত চাপকান্ ও মাথায় ফেল্টের গোল কাল বা ব্রাউন রংয়ের টুপি। লোকটিকে দেখিতে পশ্চিমে মুন্সিদের মত চেহারা দেখিতেও সুপুরুষ নয়। অপরটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি, তাহার পরিধানে শুভ্র চাপকান্ ও পায়জামা ও মস্তকে শুভ্র উষ্ণীশ, গলায় সাদা চাদর, কপালে চন্দনের ফোঁটা। লোকটি গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ। উভয়কেই অভিবাদন করিয়া আমরা ইংরাজীতেই কথা বার্ত্তা সুরু করিলাম। তাঁহারা আমাদের বসিতে বলিলেন। কথা গোল টুপি পরিহিত লোকটিই কহিলেন। তিনিই রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। অপর লোকটিই উজীর, তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হইল। তিনি ইংরাজী জানেন না জানিতে পারিয়া আমরা হিন্দিতে কথা কহিলাম। আমাদের পরিচয় কতক বলিলাম। বন্দুকের পাশের বিষয় তাঁহারা কিছুই আপত্তি করিলেন না ও আমাদের থাকিবার কোন কষ্ট আছে কিনা ইত্যাদি কথা কহিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা হৃষ্ট চিত্তে বিদায় লইলাম,

তাঁহারা আরও বলিলেন যে আমাদের সহিত তাঁহারা ষ্টেটের একজন চাপ্‌রাসি দিবেন। ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া পরদিন প্রত্যুষে আমরা টিহরী ছাড়িয়া অগ্রসর হইবার সংকল্প ও বন্দোবস্ত করিলাম। আমাদের কুলীদের মধ্যে অনেকের বাড়ী টিহরী ও নিকটবর্ত্তী স্থানে। তাহারা আমাদের নিকট, পরদিন প্রত্যুষে আসিবার অঙ্গীকার করিয়া, ছুটি লইয়া বাড়ী গেল। আমরাও তাহাদের কথায় নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে ছুটি দিলাম। কিন্তু পরে আমাদিগকে সেইজন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আজ আমাদের ছুটি। বাল্য কালে মাষ্টার মহাশয় না আসিলে ছুটি পাইয়া কে না আনন্দ ভোগ করিয়াছে। সে পড়ার ছুটির ন্যায় আজ চলার ছুটিও অতিশয় মিষ্ট লাগিয়াছিল। এ পথে যেন রুটীন করিয়া দিন ১০ মাইল পথ চলিতাম। একমাস ৪।৫ দিনের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৪।৫ দিন আমাদের চলা বন্ধ ছিল, কিন্তু সেই কয় দিনই বাল্য কালের সেই ছুটির মতই ভাল লাগিয়াছিল। আমরা সকলে এখান হইতে বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। আমাদের মুসূরীর বন্ধুদেরও লিখিয়া জানাইলাম যে আমাদের একস্‌পিডিসান টিহরী আসিয়াছে ও আরও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। ধর্ম্মশালা রক্ষক আমাদের গঙ্গোত্তরীর পথের খবর কিছু দিল। পথে হরশিল্ নামক স্থানে একটি ভাল

বাংলা আছে ও তাহার সঙ্গে আপেল ও পেয়ারের বাগান আছে। গাছে আপেল ও পেয়ার ফলিয়াছে দেখিতে পাইব, এ সংবাদে আমরা সকলেই কিছু আশ্বস্থ হইলাম। মনে হইল হিমালয়ে এত ঝাউ ও দেবদারের বন না হইয়া আপেল ও পেয়ারের বন হইলে আমাদের কাহারও বিশেষ আপত্তি হইত না। কিন্তু হর্‌শিলের সম্বন্ধে আপেল ও পেয়ার ছাড়া আরও যাহা বলিল তাহাতে সতীশ ও ফণীর আপেল আস্বাদ করিবার আগ্রহ কিছু কমিয়া গেল। সে বলিল "সেখানে শীত অতি বিষম ও রাত্রে যতই কেন গরম কাপড় ব্যবহার কর না, সকলকেই শীতে হিহি করিতে হইবে"। এই বলিয়া পাখিতে স্নান করিয়া পক্ষ বিস্তারিত করিয়া ও কাঁপাইয়া যেমন জল ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া ও দশটি আঙ্গুল কাঁপাইয়া দেখাইয়া দিল। একেত সকলেরই মনে ধারণা যে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে শীত তত বাড়িবে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে অতি দুরুহ শীত ভোগ করিতে হইবে স্থির করা গেল। বিকালে হেড মাষ্টার আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। প্রায় ১৪।১৫ বসৎর টিহরীতে মাষ্টারী করিতেছেন। তাঁহার শ্বশুর রাজ সরকারে কোন বড় চাকরী করিতেন, তিনিই তাঁহাকে এস্থলে

আনয়ন করেন। আদি বাস হুগলির নিকট, এখন বেশী সময় এস্থলেই স্থিতি। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী উত্তর ভারতে কিরূপ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ সরকারে ও ইংরাজাধিনে নানাবিধ প্রধান প্রধান পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এখন ও অনেক স্থলে বাঙ্গালীরা এই সকল পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের স্মৃতি সম্মানের সহিত রক্ষিত। আজি কালিকার দিন, যখন বাঙ্গালীর মন্দ ছাড়া ভাল কেহ দেখিতে পায় না, তখন এই সুদূর দেশে, হিমালয়ের মধ্যে, বাঙ্গালী শিক্ষক দেখিয়া আমরা আত্ম গৌরবের বিষয় কিছু পাইয়াছিলাম। আজ বিকালে বন্দুকের পাশ আমরা পাইলাম। দুই জনের নামে পাশ লওয়া হইল বলিয়া আমাদের ২০৲ টাকা দিতে হইল।

টিহরী হইতে ভরলানা।

প্রায় ১১ মাইল

৩রা অক্টোবর ১৯১৪।

আজ আমাদিগের টিহরী হইতে গঙ্গোত্তরীর পথে ভরলানা নামক স্থানে যাইবার কথা, পথ প্রায় ১১৷৷০ মাইল। আমরা প্রাতে ৭৷৷০ টার সময় যাইবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু দেখা গেল কুলীদের মধ্যে ১৫ জন অনুপস্থিত। যাহারা ছুটি লইয়া গত কল্য বাড়ী গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, যদিও আমরা উহাদের এবং টাণ্ডেলকে অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম যে আমরা প্রাতেই টিহরী ত্যাগ করিব। কুলী না আসাতে আমরা যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিলাম ও তাহারা আসিলে জরীমানা করিব বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। উপস্থিত কুলীর পৃষ্ঠে যত দূর সম্ভব জিনিস পত্র দিয়া, ও অপর কুলীরা আসিলে বাকি জিনিস লইয়া আসিতে বলিয়া, আমরা অগ্রসর হইলাম। টাণ্ডেল পশ্চাতে রহিল বলিল সে অপর কুলীদের লইয়া আসিবে। আমরা দ্বিধা শূন্য হইয়া জিনিস পত্র রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। এ পথে সর্ব্বদাই আমরা কুলীদের হস্তে জিনিস পত্র ছাড়িয়া দিয়াছি কিন্তু কখন কোন জিনিস

হারায় নাই। আজ এক সত্যেন ছাড়া আর সকলেই পদব্রজে চলিলাম। ফণীর ডাণ্ডির কেবল মাত্র তিনজন কুলী উপস্থিত ছিল, তিন জনে ডাণ্ডি তোলা যায় না, কোনরূপে ডাণ্ডি তুলিলেও ফণীকে তোলা যায় না, অগত্যা তাহাকে চলিতে হইল। আমাকে অতি আস্তে আস্তে ও সতর্কে চলিতে হইল। আমার হাঁটুর ব্যথা যদিও কম ছিল তথাপি একেবারে যায় নাই। মুসূরী হইতে গঙ্গোত্তরী প্রায় ১৪০ মাইল পথ, তাহার মধ্যে আমরা কেবল মাত্র ৪০ মাইল অতিক্রম করিয়াছিলাম, এখনও ১০০ মাইল বাকী। গত কল্য টিহরীতে বসিয়া পায়ের ভাবনা অনেক ভাবিয়াছিলাম। পায়ে যেরূপ বেদনা ছিল তাহাতে ১০০ মাইল পথ যে যাইতে পারিব সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল, অন্ততঃ দুই চারি দিন টিহরীতে থাকিয়া ব্যথা না কমিলে যে অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া বোধ হয় নাই। সতীশ বলিয়াছিল "আর কেন চল এইখানে ৮।১০ দিন থাকিয়া মুসূরী ফেরা যাক্"; কিন্তু আমার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গঙ্গোত্তরী যাইবই। টিহরীতে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা রক্ষককে ঘোড়ার সন্ধানে পাঠান হইয়াছিল কিন্তু ঘোড়া পাওয়া যায় নাই। সমস্ত দিনে ও রাত্রে ৬।৭ বার ব্রাণ্ডি ও এলিমান্‌স্ এম্ব্রোকেশান মালিস করিয়াছিলাম কিন্তু ব্যথার বিশেষ

উপশম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নাই। আজ প্রাতে ব্যথার অনেক উপশম হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলাম। সমতল বা চড়াই পথে ব্যথা বিশেষ অনুভব করিলাম না কেবল উৎরাইয়ের সময় অল্প ব্যথা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু প্রায় ৬ মাইল পথ চলিবার পর আবার ব্যথা বেশী বোধ হইল। ফণীর ডাণ্ডির আরও দুই একজন কুলী ততক্ষণে আসিয়া জুটিয়াছিল। ফণী কিন্তু আজ হাঁটিয়াই চলিয়াছে, সে আমার কষ্ট দেখিয়া আমাকে তাহার ডাণ্ডিতে উঠিতে বলিল, আমিও প্রায় অচল হইয়াছিলাম কাজেই আনন্দের সহিত তাহার ডাণ্ডি লইলাম, কুলিরাও ২॥৹ মনের জায়গায় ১।৩৹ সের পাইয়া আগ্রহের সহিত আমায় লইল। আমার পায়ের ব্যথা প্রায় ১৪।১৫ দিন ছিল। রোজ রাত্রে এম্‌ব্রোকেশান (embrocation) মালিস করিয়া সকালে ব্যথা বেশ কমিয়া যাইত আবার ৫।৬ মাইল চলিবার পর ব্যথা বাড়িত, চড়াইয়ের মুখে বিশেষ কষ্ট হইত না কিন্তু উৎরাইয়ের সময় অতি ধীরে ধীরে নামিতে হইত। আমার বোধ হয় এ পথে সকলেরই এক শিশি এম্‌ব্রোকেশান ও এক শিশি টিঞ্চার আইওডিন্‌ রাখা উচিত। এই দুইটি জিনিস থাকাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১১॥৹ বাজিতেই সকলের আহারের কথা মনে উদ্রেক হইল, কিন্তু

পাহাড়ী বেনিয়া বালকত্রয়।



টিহরী হইতে ভরনানার পথে এই ছবি তোলা হইয়াছিল।

৭৯ পৃষ্ঠা]

আজ পথের ধারে ছাওয়া আর পাওয়া গেল না, আর ঠিক পথের উপর বসিয়াও তল্পি তল্পা খুলিয়া খাওয়াও সুবিধাজনক নহে। প্রায় ৮॥০ মাইল পথ চলিবার পর পথের ধারে খদের দিকে কতকটা সমতল স্থান দেখিতে পাওয়া গেল, তথায় দুই একটি গাছ থাকাতে কিছু ছায়াও ছিল। কিছু ভস্ম ও দুই তিনটি প্রস্তর খণ্ড দেখিয়া জানিতে পারা গেল যে আমাদের পূর্ব্বে অন্য কোনও পথিক এ স্থানে আহারের ও বিশ্রামের জন্য অবস্থিতি করিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেকার ডাণ্ডিতে কম্বল ও রাগ্ (rug) থাকিত তাহার দুইটি এই স্থানে বিছান হইলে আমরা বসিলাম। আজ খাবার সঙ্গে প্রস্তুতই ছিল। আঠার মোটা রুটি, যার ৭।৮ খানিতে ১ সের ওজন হয়, কিছু আস্ত আলু সিদ্ধ ও একটি মটনের ঠ্যাং সিদ্ধ আজ আমাদের খাইবার উপকরণ। আমরা আসিবার অল্প পরেই আমাদের অনুপস্থিত কুলীবৃন্দ উপস্থিত হইল। আমরা রাগিয়া তাহাদের জরিমানা করিব বলাতে তাহারা ক্ষেপিয়া বসিল, বলিল "আপনারা যে এত সকালে টিহরী ছাড়িবেন তা আমরা জানিতাম না, আমরা কিন্তু জরিমানা দিতে রাজি নই, আর জরিমানা হইলে আমরা আর যাইব না —ান হইতে ফিরিব"। তাহারা জানিত ১৫।১৬ জন কুলী এখান হইতে চলিয়া গেলে আমাদের পুনরায় সেই সংখ্যক কুলী

জোগাড় করা অতি দূরূহ ; আমরাও অতি সত্বর রায় বদলাইয়া বলিলাম "এবার মাফ, পুনরায় করিলে আর কোনও ওজর আপত্তি না শুনিয়া জরিমানা করিব"।

কুলীদের সঙ্গে তক্‌রার মিটাইয়া আহারের উদ্‌যোগ করা যাইতেছে এমন সময়, কেশবিহীন, কমণ্ডুল হস্তে, গেরুয়া পরিহিত, দীর্ঘাকার, সহাস্য বদন, এক সাধু এই পথে টিহরী অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে দেখিলাম। সাধুকে আমরা ডাকিতে কাছে আসিয়া বসিল। টিহরী ছাড়িবার পর রাস্তায় দুই চারি জন পাহাড়ী স্ত্রী ও পুরুষ ছাড়া আর লোক জনের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সাধুকে পাইয়া আমরা তাহাকে নানান্ প্রশ্ন আরম্ভ করিলাম। সাধু বলিয়া ভক্তি প্রণোদিত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করি নাই। আজকালকার ইংরাজী শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের সাধুদের উপর যে অবজ্ঞার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, আমরা সে ভাবের হাত এড়াইতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস গেরুয়াধারী সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড ও জুয়াচোর, পেটের দায়ে সাধু সাজিয়া লোক ঠকাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। সাধারণতঃ কলিকাতায় বা অপর সহরে ভিক্ষাজীবি যে সকল সাধু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে উক্তরূপ ভাব হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমরা

তাহাকে বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ করিয়া কিছু আমোদ পাইবার জন্য তাহার সহিত কথা বার্ত্তা সুরু করিলাম, কিন্তু লোকটার কথা শুনিয়া তাহাকে কলিকাতার ছাই মাখা পরচুলধারী শঙ্খ নিনাদকারী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর মত মনে হইল না। সে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বার্ত্তা কহিল, হিমালয়ে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে বলিল, যমুনোত্তরী ও তথা হইতে গঙ্গোত্তরী ফিরিবার পথের সন্ধান কতক বলিল। গঙ্গোত্তরীর পথে ভাটোয়ারী নামক স্থান হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে বুড়াকেদার নামক স্থানের নিকট এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর সাতটি সুন্দর সরোবর আছে, তাহা দেখিয়াছে বলিল। সে পাহাড়ে উঠা শক্ত কিন্তু উঠিতে পারিলে রমনীয় দৃশ্য নয়ন পথে পড়ে তাহাতে চড়াইয়ের মজুরী সম্পূর্ণ উসুল হইয়া যায়। লোকটি যেরূপ আগ্রহের সহিত হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। এই হিমালয়ের পথের কষ্ট সহ্য করিয়া যে এরূপ প্রফুল্ল থাকিতে পারে ও এই সব দৃশ্য দেখিবার জন্য যাহার এত আগ্রহ তাহাকে মনে মনে সাধারণ জটাধারী অপেক্ষা উচ্চে পদ দিলাম। ইতি মধ্যে আমাদের "বয়" মটনের সিদ্ধ পা বাহির করিয়া ফেলিল, তাহা দেখিয়াই সাধুটি বিদায় লইলেন। আমরা তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য কিছু পয়সা

দিতে চাহিলাম, কিন্তু আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত আত্মগরিমাকে যথেষ্ট আঘাত করিয়া সে বলিয়া গেল পয়সায় তাহার আবশ্যক নাই ভিক্ষা তাহার বৃত্তি নহে। সাধু সন্ন্যাসী যে পয়সা দিলে লইতে চাহেনা তাহা আমি এই প্রথম দেখিলাম। সংসারে আমরা পয়সাই চিনিয়াছি, পয়সা থাকিলে ভাল খাওয়া, পরা ও থাকা যায়, অপর লোকে খাতির করে, পয়সায় এ পৃথিবীতে মান সম্ভ্রম সবই কেনা যায়, তাই আমরা পয়সা পয়সা করি ও পয়সার বৈরাগ্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। পয়সা অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যাহারা চিনিয়াছে তাহাদের সন্ধান আমাদের নিকট নাই, আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি না।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ডাণ্ডিতেই চলিয়াছি, ফণী পদব্রজে অতি আগ্রহের সহিত চলিয়াছে। ছোট ছেলের প্রথম পা হইলে যেমন চলিবার আগ্রহ হয় ফণীর আজ চলৎশক্তি আবিষ্কারের পর সেইরূপ আগ্রহ হইয়াছে। সতীশ থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে খুব উৎসাহিত করিতেছে, "বা ফণীবাবু আপনিত আমাদের চেয়ে ভাল চলিতে পারেন মিছে পয়সা খরচ করে ডাণ্ডি এনেছেন" ও সেই সঙ্গে আমাকে ও কিছু বিদ্রূপ করিয়া বলিল "লিডার অফ্ দি পার্টি (leader of the party) আগেই কুপোকাৎ"। আমি চুপ

টিহরী হইতে ভড়লানার পথে পার্ব্বতীয় নদী।



নদীর জলে ও কিনারায় অনেকগুলি মহিষ রহিয়াছে। এই নদীটি দুই উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, অনেক নীচে হওয়াতে এখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম।

করিয়া শুনিয়া গেলাম, তখন পায়ের যেরূপ অবস্থা ডাণ্ডি ভিন্ন নিরুপায়। কিছুদূর যাইবার পরই উৎরাই আরম্ভ হইল, খুব খাড়া উৎরাই দেখিয়া বোধ হইল অনেক নীচে নামিতে হইবে। এক এক জায়গায় রাস্তা এত সোজাভাবে নামিয়াছে যে ডাণ্ডিওয়ালাদের পা পিছলাইতে লাগিল। ফণী কিন্তু ভারি স্ফূর্ত্তির সহিত চলিয়াছে, তাহার কাজের মধ্যে খালি সোজা করিয়া পা ফেলা বাকি কার্য্য গ্রাভিটিই (gravity) করিতে ছিল। প্রায় এক মাইল দেড় মাইল চলিবার পর আমরা একটি পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম, এই দেড় মাইলে আমরা প্রায় দেড় হাজার দুই হাজার ফুট নিম্নে নামিয়া আসিয়াছিলাম। একটি কাঠের পুল পার হইয়া রাস্তা অপর পারে আবার একটি পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়াছে। দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি পার্ব্বতীয় নদী, নদীতে কতকগুলি মহিষ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এ স্থানটি এত নিচে হওয়ায় অপেক্ষাকৃত গরম কাজেই মহিষ এখানে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। কাঠের পুলের উপর হইতে নদীর ও অপরাপর দৃশ্যের দুই এক খানি ছবি লইলাম। ডাণ্ডিতে আমি আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম ক্রমে দলস্থ অপর সকলে আসিল। উৎরাই যেরূপ খাড়া ছিল চড়াই ও সেইরূপ, সামনের পাহাড়ের গা বহিয়া রাস্তা একেবারে

পাহাড়ের মাথায় উঠিয়াছে। উঠিতে উঠিতে রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটু আধটু খেত দেখিতে পাওয়া গেল। চড়াইয়ের মুখে ডাণ্ডিওয়ালারা প্রায়ই বিশ্রাম করিল ও তামাক খাইতে লাগিল। একবার দেখি একজন কুলী নিকটস্থ খেত হইতে একটি কুমড়া সংগ্রহ করিয়াছে, আমি দেখিয়া তাহাদের বলিয়া-দিলাম ওরূপ পরের খেত হইতে জিনিষ লওয়া ঠিক নয়। একথা কিন্তু তাহাদিগকে বুঝাইবার কিছুই আবশ্যক ছিল না, কেননা তাহারা সে কথা জানিত, কিন্তু মানুষের স্বভাব পরদ্রব্য আহরণ করিয়া কেমন সুখ পায়, তাহা না হইলে বাল্যকালে পরের বাগানের গাছ হইতে আম চুরী করিতে পারিলে অত আমোদ কেন হয়। আর মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চেষ্টা নয় কি পরের জিনিষ পরের টাকা কেমন করিয়া আপন করিবে। পাহাড়ের চুড়ায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম তথায় অপর দিক হইতে আর একটি রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কুলীরা ও শিকারী বলিল এই রাস্তা কাণাতালের নিকট হইতে আসিয়াছে। কাণাতাল ছাড়াইয়া আসিয়াছি, উহা মুসূরী হইতে প্রায় ২৫ মাইল। যাহারা টিহরী না যায় তাহারা এই রাস্তায় আসে। দুইটি রাস্তা মিলিত হইয়া পাহাড়ের চুড়া পার হইয়া আবার অপর দিকে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। এপথে

অনেকবার এইরূপ পাহাড়ের চুড়া পার হইতে হইয়াছিল। চুড়াটি পার হইলেই যেন একটি নূতন রাজত্বে আসিয়া পড়া যায়। পাহাড়ের এক দিকের দৃশ্য যা দেখা যায় সময় সময় পার হইয়া অপর দিকে গেলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এক-দিকে হয়ত গাছ পালা অতি কম, ঝরণা শূন্য, অপর দিকে নিবীড় বন। পাহাড় পার হইয়া কিছুদূর যাইবার পরই ভরলানার ধর্ম্ম-শালা দেখা গেল। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখান হইতে রাস্তাটি অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে ঘুরিয়া ধর্ম্মশালার নিকট গিয়াছে। সমস্ত দিন চলিবার পর দূর হইতে গম্য স্থান দেখিতে পাইয়া যে আনন্দ হইত তাহা যাঁহারা ঐরূপ পাহাড়ী পথে না চলিয়াছেন তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এই সময়ে লোকে যে বলে "কষ্টের পর সুখ আছে" তাহার সত্যতা অনুভব করিতাম। আমরা বেলা প্রায় ৫৷৷০টার সময় ধর্ম্ম-শালায় পৌঁছিলাম, ধর্ম্মশালার নিকট কিছু বসতি আছে। দেখিলাম দুই একটি বেনের দোকানও রহিয়াছে, চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি ইত্যাদি খাবার জিনিষ সব পাওয়া যায়। পথে এক বেনে আমাদের খবর দিল সেখানে নেকড়ে বাঘের উৎপাত হইয়াছে, ৭৷৮টি ছেলে মেয়ে মারিয়াছে, শেষ খবর তাহারা ৬৷৭ দিন আগে পাইয়াছিল। মুসূরীতে আমরা যে

বোর্ডিং হাউসে উঠিয়াছিলাম তথায় এক সাহেব আমাদিগকে মুসূরীর একটি ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত কয়েক লাইন দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে প্রকাশ যে মুসূরীর নিকট পাহাড়ে বাঘে মানুষ মারিয়াছে। সে কথা শুনিয়া বাঘ মানে "রয়েল বেঙ্গলের" কথা মনে করিয়া খবরটা ঠিক মানিয়া লই নাই। এখন দেখা গেল খবরের সব ঝুটা নয়। বাঘ কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বেনে উঁচু পাহাড় দেখাইয়া বলিল ঐ সব পাহাড়ের উপর থাকে, রোজ এক স্থানে থাকে না, দিন ৪০।৫০ মাইল ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঘের দৈনিক প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বেনে এত খবর কিরূপে রাখিল সে কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমাদের দলের মধ্যে শিকারী আমার ভ্রাতা শৈলেন ও আমি। তবে আমি পাখিটা আসটার উপর দিয়া সখ মিটাইয়াই সন্তুষ্ট কিন্তু আমার ভ্রাতাটি মনে মনে ভাল্লুক মারিবার কল্পনা করিতেন। বাঘের কথা শুনিয়াত তিনি মহা উৎসুক হইলেন। বাঘের দেখা কি প্রকারে পাওয়া যায়। বাঘ পাহাড়ীদের ছাগল, মেষ ইত্যাদি খাইয়া থাকে, সুবিধা পাইলে তাহাদের ছেলে মেয়ের কচি মাংসে মুখ বদলায়, গুলি খাওয়া তাহার আদপেই অভ্যাস নাই। কেহ কেহ উচ্চ পাহাড় দেখাইয়া বলিল উহার উপর ছাগল বাঁধিয়া রাত্রে বসিয়া থাকিলে বাঘ আসিতে পারে। সমস্ত

দিন চলার পর রাত্রে পাহাড়ে "হত্যা" দিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য আমাদের দলের শিকারীদের মধ্যে কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম না, কাজেই বাঘ শিকার হইল না। ধর্ম্মশালাটি একটি দ্বিতল কাঠের বাড়ী, নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। উপরের তলায় উঠিবার সিঁড়ি নাই একটি মই লাগাইয়া উঠিতে হয়। উপরে দুইটি পাশাপাশি ঘর ও তাহার তিন দিকে প্রশস্ত বারাণ্ডা। বারাণ্ডার মেঝে ও ঘরের দেওয়াল কাঠের, তাহার উপর মাটি ও গোময় লেপন করা, অতি পরিষ্কার ও একেবারে খালি। এ পথের ধর্ম্মশালা গুলি প্রায় সবই এইরূপ পরিষ্কার, আর এ সময় কোন যাত্রী না থাকাতে আমরা সকল গুলিই খালি পাইয়াছিলাম। ঘর গুলিতে প্রবেশের জন্য এক একটি প্রায় ৪×২॥০ ফিট দরজা আছে কিন্তু আর চতুর্দ্দিক বন্ধ কোন দরজা বা জান্‌লা নাই। শীতের দেশ বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা। আমরা বারাণ্ডাতেই রাত্রি যাপন স্থির করিলাম। ধর্ম্মশালাটি গঙ্গা হইতে প্রায় ৫০।৬০ হাত দূরে ও উচ্চে। টিহরী ছাড়িবার পর গঙ্গার সঙ্গে আবার এই প্রথম সাক্ষাৎ। এ স্থলে গঙ্গার পাড় অতি উচ্চ ও প্রবাহ অপ্রশস্ত, স্রোত যেন পাহাড়ের মধ্যে এক গভীর খাদ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডার এক দিক হইতে গঙ্গা বেশ দেখা গেল, তাহার স্রোত পাহাড়ের শিলা

খণ্ডের সহিত মহা গর্জ্জনে অবিরল সংগ্রাম করিয়া সদর্পে অগ্রসর হইতেছে। পাহাড় তাহার ছোট বড় শিলাখণ্ড দিয়া তাহাকে বাধা দিবার কত সাধ্য কত চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সে গতি রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের প্রধান কার্য্য রাত্রের জন্য শয্যা প্রস্তুত ও আহারের আয়োজন। প্রথম কার্য্য প্রথম প্রথম আমাদেরই করিতে হইত কেননা ক্যাম্প খাট খুলিতে ও লাগাইতে কুলীরা জানিত না। রথি শীঘ্রই এ কার্য্য শিখিয়া লইয়াছিল ও কিছু দিনের মধ্যেই অপর অপর কুলীরাও বিনা সাহায্যে আমাদের শয্যা প্রস্তুত করিত। দ্বিতীয় রন্ধন কার্য্যটি প্রথম আমাদের পূর্ব্বোক্ত বয়ই করিত, কিন্তু পরে আমরাও তাহাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতাম, কেননা কেবল বয়ের হাতে নির্ভর করিলে আহার্য্য মুখে রুচিত না। আমাদের কুলীরা প্রায়ই আমাদের নিকট হইতে কিছু দূরে কোন স্থানে আশ্রয় লইত। রাত্রে খোলা বারাণ্ডায় শুইয়া আমরা বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। ঠাণ্ডার জন্য কিছুই অসুবিধা হয় নাই তবে নিদ্রা যাইবার আগে নেকড়ের কথা মনে হওয়াতে পাহাড়ী লাঠিটা ক্যাম্প খাটের পাশেই রাখিলাম।

গঙ্গোত্তরী ও

ভরলানা হইতে ধরাস্থ।

প্রায় ১৫ মাইল।

——o——

৪ঠা অক্টোবর ১৯১৪।

আজ আমাদের ধরাস্থ যাইবার কথা, প্রায় ১৫ মাইল পথ, অতএব সকাল সকাল যাত্রা করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। কুলীদের কিন্তু বেশী সকাল পাওয়া কিছু মুস্কিল হইত কেননা তাহারা সকালে উঠিয়াই ভোজনের ব্যবস্থা করিত। এক একটি কুলী এক সের আঠার রুটি খাইত। তাহারা আপনা-দিগকে দুই তিন দলে বিভক্ত করিয়া এক এক দলের আহার্য্য এক এক স্থানে প্রস্তুত করিত। যদিও কুলীদের মধ্যে বালক যুবক ও প্রৌঢ় ছিল কিন্তু তাহাদের পেটের খোলের পরিমান এক, কেননা ওজনে সকলে সমান খাইত। শিকারী ও টাণ্ডেল রধি আহার্য্য প্রস্তুত কার্য্য অন্যের উপর ভার দিয়া আসিয়া জিনিস পত্র বাঁধিতে সাহায্য করিত। শৈলেন, সতীশ ও ফণী আজ প্রত্যুষে শিকারীকে লইয়া অগ্রসর হইয়া ছিল, হয়ত ভাবিয়াছিল যে নিশাচর বাঘের সহিত পথে দেখা হইলে তাহাকে গুলির (সিসার গুলি) আস্বাদ কিছু দিবে, কেননা সঙ্গে

পাখিমারা ও বড় জন্তু মারা দুইটি বন্দুকই লইতে ভুলে নাই। আমি ও সত্যেন জিনিস পত্র যতদূর সম্ভব শীঘ্র কুলীদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া অগ্রসর হইলাম। প্রায় ৫ মাইল আসার পর একটি বাংলা দৃষ্টি গোচর হইল। কুলীরা বলিল এই স্থানের নাম ছাম ও ইহাও এই পথের যাত্রীদের জন্য একটি থাকিবার আড্ডা। আমার পায়ের ব্যথা আজও থাকাতে ফণী তাহার ডাণ্ডি আমাকে দিয়া ছিল। বাংলার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র এক জয়োল্লাস শুনিতে পাইলাম ও দেখিলাম সতীশ একটি মৃত বন্য কুক্কুট উচ্চে তুলিয়া আমাকে সদর্পে দেখাইতেছে। শৈলেনের মুখে যেন একটু বিনয় মিশ্রিত গর্ব্ব দেখা গেল। রুইয়ের চারে যদিও পুঁটি পড়িয়াছিল, তথাপি একেবারে বিফল মনোরথ হওয়া অপেক্ষা ইহা ভাল। আর রাত্রে পাখির সুস্বাদু ঝোলটুকু উদরস্থ করিতে করিতে মনে হইয়াছিল যে বাঘ মারিলেত খাওয়া হইত না। আরও ৪ মাইল পথ চলিবার পর বেলা প্রায় ১১৷৷০ সময় আমরা একটি ছোট পুল পার হইয়া নগুন নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে রস্তাটি একেবারে নদীর কিনারায় আসিয়া মিশিয়াছে। গঙ্গা বক্ষও এখানে বেশ প্রশস্থ ও পাড়গুলি নদীবক্ষ হইতে অল্পই উচ্চ ও ক্রমশঃ গড়াইয়া নদীর জলে মিশাইয়াছে। এখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল ধর্ম্মশালা

আছে দেখিলাম কিন্তু সেটি ভগ্নাবস্থা, বাসের যোগ্য নয়। একটি ছোট মন্দিরও রহিয়াছে তাহার চারিদিকে বড় বড় বৃক্ষ। মন্দিরের দ্বারবন্ধ থাকাতে ভিতরে কি মূর্ত্তি আছে দেখিতে পাইলাম না। সেখানে কোন লোকও দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরের সম্মুখেই গঙ্গার তট। নদী তটবর্ত্তী হিন্দু দেবালয়ের সহিত একটি যে পবিত্র স্নিগ্ধভাব জড়িত থাকে তাহা এখানে অনুভব করিলাম। যাঁহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গা তীরস্থ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বা অন্য অন্য দেবালয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কথার সত্যতা অনুভব করিবেন। এখানে প্রশস্থ ও সমতল নদীতটে এক বৃক্ষের ছাওয়ায় আমরা কম্বল বিছাইয়া বসিয়া গেলাম, শীঘ্রই দলস্থ সকলে উপস্থিত হইল। ৯ মাইল হাঁটিয়া আসাতে আমরা সকলেই ফণীর চলৎ শক্তির প্রশংসা করিলাম, আমি কিছু বেশী প্রশংসা করিলাম কেননা এই ৯ মাইল আমি তাহার ডাণ্ডিতে আসিয়াছিলাম। আমার প্রশংসা শুনিয়া সে বোধ হয় আশঙ্কা করিল যে আজিকার বাকি ৫ মাইল আমি তাহার ডাণ্ডিতে যাইতে চাই তাই সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "এইবার কিন্তু আমি ডাণ্ডিতে যাইব"। লোকটির একটি এই মহৎ গুণ যে সে স্পষ্ট বক্তা। আমার পায়ের ব্যথাও বিশ্রাম পাইয়া অনেক কম বোধ হইতেছিল কাজেই বন্দোবস্ত হইল বাকি রাস্তা আমি

হাঁটিব ও ফণী ডাণ্ডিতে যাইবে। এই বন্দোবস্ত বোধ হয় কেবল ডাণ্ডিওয়ালারাই পছন্দ করিল না।

আজ গঙ্গা স্নান করা সকলেই সাব্যস্ত করিল, কেবল সত্যেন ছাড়া, তাহার শীতের ভয় কিছু বেশী, তা ছাড়া সকলের সামনে গা খুলিয়া স্নান করাতেও বোধ হয় তাহার আপত্তি ছিল। বিলাতের গন্ধ আমাদের গা হইতে যাইতে কিছু সময় লাগে, কাহারও বেশী লাগে কাহারও কম, কাহারও আবার চির-কালের জন্যই কিছু গন্ধ থাকিয়া যায়। গঙ্গার জল ঠাণ্ডা কন্‌কন্‌ করিতেছে। বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা। জলে অবগাহন করিবার যো নাই, এত টান যে বেশী জলে নামিলেই মনে হয় যেন টানিয়া লইয়া যাইবে। জলের মধ্যে একটি বড় পাথরের উপর বসিয়া আস্তে আস্তে একটির পর অপর একটি পা জলে নামান গেল বোধ হইল যেন পা জমিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি ৪।৫ গেলাস জল মাথায় ঢালিয়াই স্নান শেষ করা গেল। রৌদ্রের তেজ যদিও এখানে কম তথাপি রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গা মাথা শুষ্ক করিয়া ফেলাতে আর শীত বোধ হইল না। ইহার পর গঙ্গোত্তরী পোঁছান পর্য্যন্ত আমি ফণী ও শৈলেন প্রায় রোজই হয় গঙ্গায় বা কোন ঝরণার জলে স্নান করিতাম। এইরূপ খোলা যায়গায় ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া আমাদের কখনও সর্দ্দি

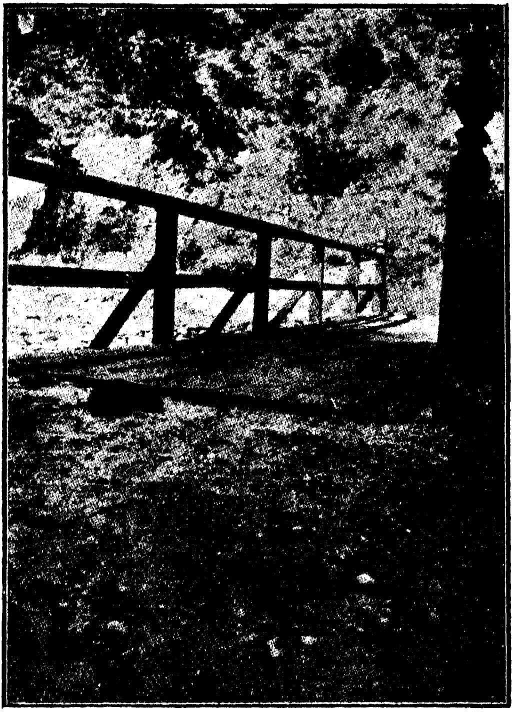
হয় নাই বরং স্নানের পর শরীর বেশ গরম বোধ হইত। তবে যাহাদের শরীর শক্ত নয় এত ঠাণ্ডা জল ও বায়ুতে স্নান তাহাদের সহ্য হইবে কিনা বলা কঠিন। নগুন হইতে আমিই সর্ব্বাগ্রে চলিলাম। সাধারণ রাস্তায় না গিয়া নদীর ধারে ধারে চলিলাম। কিছুদূর গিয়া নদীর পাড় আবার উচ্চ হইয়াছে, আমিও ক্রমশঃ উঠিয়া এক উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই হিমালয় ভ্রমণে কত দৃশ্য কত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই যে দেখিয়াছি তাহা সঠিক বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন আমি যে স্থলে আসিয়াছি তাহা যেন একটি প্রকাণ্ড বাগান, চারি দিকে ছোট বড় নানান রকমের গাছ, সেই সব গাছের মধ্য দিয়া একটি প্রায় ৩।৪ হস্ত পরিমিতি রাস্তা রহিয়াছে। বাগানটি নির্জ্জন নিস্তব্দ, মাঝে মাঝে কেবল পাখির মিষ্ট ডাক শুনা যাইতেছে, কখন কখন বা একটি পাখি এক গাছ হইতে অপর গাছে গিয়া বসিতেছে। তাহারা যেন তাহাদের এই স্বাধীন সুন্দর রাজ্যে এক হ্যাট্ পরিহিত ও দীর্ঘ লাঠি ধারি মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেছে "এ আবার কে"। নদী আমার দক্ষিণে, কিন্তু আর দেখা যায় না, পাড় অনেক উচ্চ ও জল অনেক দূরে। নদীর দিকে গাছ গুলি যেন স্তরে স্তরে সাজান হইয়াছে। গাছ

গুলি বেশী বড় নয়, তলা গুলি পরিষ্কার হওয়াতে ২।৩ স্তর বেশ দেখা যাইতেছে। কাশ্মীর কিম্বা লাহোরের, মোগল বাদসাহ জাহাঙ্গীর কৃত, সালিমার বাগানের জাঁক জমক এখানে নাই। এস্থান কিন্তু এত নির্জ্জন এত রমণীয়, যেন স্বভাব নিজের হাতে বাগান সাজাইয়া দেখাইতেছে যে মনুষ্যের সযত্ন কৃত বাগান অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নয়। এই বনটি প্রায় এক মাইলেরও কিছু অধিক বিস্তৃত। বনটি পার হইয়া একটি প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। বেলা কত দেখিতে গিয়া দেখি ঘড়ি নাই। ঘড়িটি হাফ্ প্যাণ্টের একটি ছোট পকেটেই থাকিত, সে পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম খালি, বড় বিপদে পড়িলাম, এপথে সময় দেখিয়াই, আমরা প্রায় কতদূর আসিয়াছি, আন্দাজ করিতাম। হঠাৎ মনে পড়িল যে উপরোক্ত বনের মধ্য দিয়া আসিবার সময় এক গাছের তলায় কিছুক্ষণ বসিয়াছিলাম হয়ত সেখানে পড়িয়া গিয়াছে। আবার ফিরিলাম, প্রায় সিকি মাইল আসিয়া সেই গাছের তলায় দেখি আমার ঘড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। যেন বহু পরিচিত ও পুরাতন বন্ধুকে ফিরিয়া পাইলাম ও মহা আনন্দে তাহাকে উঠাইয়া পকেটস্থ করিলাম। আমার এস্থল হইতে যাওয়া ও আসায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এ

নির্জ্জন দেশে চুরি করিবার লোক নাই, হয়ত ঘড়িটি অর্দ্ধ ঘণ্টা ছাড়িয়া একমাস পড়িয়া থাকিলেও কেহ দেখিত না। বন পার হইয়া এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিলাম, মাঠটি ধান্যে পরিপূর্ণ, ধান্যও প্রচুর পরিমানে জন্মিয়াছে ও প্রায় পরিপক্ক হইয়াছে। ধেনো মাঠ দেখিলেই বাংলা দেশের কথা মনে পড়ে, "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা" অমন দেশটি আর কোথায় পাইব। উপরে বনের দৃশ্যের কথা বলিয়াছি এখানে অবার এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। গঙ্গা আমার দক্ষিণে অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে আর দেখা যায় না, কিন্তু সে দিকের উচ্চ পাহাড় গুলি দেখিতে পাইতেছি, বাম দিকের পাহাড় গুলিও সরিয়া গিয়াছে মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তর "সোণার ধানে ভরা"। যতদূর চোখ যায় কেবল ধান, শিশ্ গুলি ধানের ভারে বেঁকিয়া পড়িয়াছে। এমন দৃশ্য দেখিলে কার না আনন্দ হয়, মনের স্ফুর্ত্তিতে একেলাই দ্রুত গতি চলিয়াছি, সঙ্গীরা বহু পশ্চাতে, তাহাদের দেখাই নাই। কিছুদূর আসিয়া প্রথম একটি পরে অপর একটি পাহাড়ী বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হইল। প্রথম বৃদ্ধটি কুইনিন্ চাহিল। দ্বিতীয় বৃদ্ধটি বলিল তাহার পেটে বড় ব্যথা যদি আমি কোন ঔষধ দিয়া তাহার পেটের ব্যথা কমাইয়া দি তাহা হইলে সে বাধিত হইবে। হ্যাট্ কোট পরা থাকিলে পাহাড়ীরা বোধ হয় তাহাকে

সকল বিদ্যার মালিক ঠাওরায়, বৈদ্যগিরি বোধহয় তাহার মধ্যে একটি। আমার সঙ্গে কোনরূপ ঔষধই ছিলনা। ঔষধের বাক্স পশ্চাতে কুলীর মাথায় আসিতেছিল কাজেই ইহাদের উপর ডাক্তারি করিবার সুবিধা হইল না, বৃদ্ধদেরও জ্বর ও পেটের ব্যথার উপায় হইল না। পাহাড়ীদের প্রৌঢ়াবস্থায় চর্ম্ম লোল ও আকৃতি বৃদ্ধের মত দেখায় তাহাতে আবার জ্বরাজীর্ণ হইলেত কথাই নাই। এই দুই বৃদ্ধকে দেখিয়া পাহাড়ীদের সৌন্দর্য্যে বড় আকৃষ্ট হইতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রান্তরটি প্রায় তিন মাইল, তাহা অতিক্রম করিলে পাহাড় আবার রাস্তার নিকট সরিয়া আসিল। বামদিকে পাহাড় ও দক্ষিণে এক পাহাড়ী নদী পাইলাম। হঠাৎ সম্মুখে চাহিয়া দেখি আমার কিছু অগ্রে পথের উপর এক পাহাড়ী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া বোধ হইল পাহাড়ের মধ্যে হ্যাট্ কোট ধারি জিব দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়, মুখ ও গড়ন পেটন ভাল, পরণে ঘাগ্‌রা ও আস্তিনওলা জামা, মস্তক একটি বড় রুমালের মত কাপড়ে ঢাকা। কাপড়গুলি মোটা পশ্‌মি দ্রব্যে প্রস্তত বিশেষ পরিষ্কার নয়। এক হাতে বোধহয় একখানি কাস্তে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ দুইটিকে দেখিয়া পাহাড়ীদের সৌন্দর্য্যের যে ধারণা হইয়াছিল তাহা কতকটা বদলাইয়া গেল।

ধরাসুর নিকট ঝরণার উপর কাঠের ছোট পুল।



এই প্রকার পুল এই পথে অনেক পাইয়াছিলাম।

৯৭ পৃষ্ঠা]

আমি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম ; উভয়েরই উদ্দেশ্য বোধ হয় প্রথমে বাহ্যিক আকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া পরে মনের ভাব কি তাহা অনুমান করি। আমি যখন তাহার নিকট হইতে আন্দাজ দশ হস্ত দূরে তখন বোধ হয় তাহার স্ত্রীসুলভ সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া গিয়া গাছের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সে যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল তথায় আসিয়া দেখি পাহাড়ের গায়ে একটি পাক্ ডাণ্ডি রহিয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম সে সেই পাক ডাণ্ডি বাহিয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাকে কিন্তু দেখা গেল না। আর কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একটি ঝরণা দেখিতে পাইলাম। এক কাঠের ছোট পুল দিয়া ঝরণা পার হইলাম, ঝরণাটি যেন উচ্চ পাহাড় হইতে লাফাইয়া আসিয়া আবার নীচেকার পাহাড়ের গাত্রে পড়িয়াছে। পুলের উপর আসিয়া গানের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি পূর্ব্বোক্ত রমণী পর্ব্বতের গাত্রে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে। আমার মধ্যে কবিতা ও রোমান্স খুব কম কাজেই এরূপ একটা জ্যান্ত রোমান্স পাইয়াও তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হওয়াই যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলাম, বিশেষ ১২।১৩ মাইল পার্ব্বত্য পথে হাঁটার পর রোমান্স বড় একটা থাকে না। যে

স্থলে উপরোক্ত রমণী পর্ব্বতের গাত্র দিয়া উঠিয়াছিল সেইখান দিয়াই লালুরীর পাক্ ডাণ্ডির রাস্তা সুরু হইয়াছে যাহা ঝাল্‌কীর নিকট মুসূরীর রাস্তায় মিশিয়াছে। আমরা ফিরিবার সময় এই রাস্তায় গিয়াছিলাম। আর কিছু দূর গিয়া পাঁচটি বড় বড় আম গাছ দেখিলাম, এ পাহাড়ে আর কোথাও আম গাছ দেখিয়াছি মনে হয় না। শীঘ্রই ধরাসুর বাংলা দৃষ্টি গোচর হইল। বাংলাটি একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর, অনেক দূর হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাংলা দেখিতে পাইয়া আরও আগ্রহের সহিত চলিলাম। আমার সঙ্গীরা আজ অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। বাংলা নজর হইবার পরও প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া ধরাসু গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানে বেশ একটি বড় নদী আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। ধর্ম্মশালাটি গঙ্গার ধারেই। তাহার নিকট আর একটি বাংলা রহিয়াছে। শুনিলাম সেখানে টিহরী ষ্টেটের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী থাকেন। এখানে গঙ্গার কিনারায় অনেক চেরা কাঠ ও কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম, সে সব উপরে কোথাও কাটিয়া জলে ভাসাইয়া আনা হইয়াছে। অপর নদীটির উপর ও গঙ্গার সহিত সঙ্গম স্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাঠের পুল পার হইয়া ধরাসু গ্রামে উপস্থিত হইলাম। পুল পার হইয়াই দেখি একটি খুঁটিতে (finger post)

এক দিকে গঙ্গোত্তরী ও অপর এক দিকে যমুনোত্তরী ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে। পুলের নিকট হইতে পাহাড়ের গা বাহিয়া বাংলায় যাইবার রাস্তা উপরে উঠিয়াছে। বাংলায় পৌঁছিবার কিছু আগে হইতে বাগান পাইলাম তাহাতে দুই একটি আমলকী গাছ ও তাহাতে অনেক আমলকী ফলিয়াছে দেখিলাম। হস্তস্থিত যষ্টির আঘাতে কিছু আমলকী পাড়িয়া আস্বাদন করিলাম। এই পাহাড়ী দেশে এই পরিচিত ফল দেখিয়া মনে হইল যেন কোন পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হইল। আমলকী চিবাইতে চিবাইতে আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বাংলার রক্ষক বা চৌকিদার আসিয়া সেলাম করিল, তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে সেলাম্‌টা টুপির উদ্দেশ্যেই হইল। আমি এমন কথা বলি না যে টুপি না থাকিলে সে আমাকে সেলাম করিত না তবে বেশ বুঝিতে পারিলাম, টুপির জন্য যে খাতির এই অশিক্ষিত পাহাড়ীর নিকট পাইলাম, টুপি না থাকিলে বোধ হয় এত খাতির পাইতাম না, তাহার কারণ বলিতেছি। পাহাড়ের শিখর দেশে যে বাংলাটি আছে তাহার কিছু নীচে আর একটি বাংলা দেখিতে পাইলাম। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সেটি পুরাতন বাংলা উপরের বাংলাটি নূতন, এই নূতন বাংলা প্রস্তুত হইবার অগ্রে সাহেব ও সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিরা সেই বাংলায় থাকিতেন। এখন এই সকল ব্যক্তি আসিলে উপরের বাংলায় থাকেন নিচের বাংলায় "দেশী লোকেরা" থাকিতে পায়। আমি তাহাকে আর "দেশী লোকের" অর্থ জিজ্ঞাসা না করিয়া ধীরে ধীরে উপরের বাংলায় গিয়া উঠিলাম। বাংলাটি বেশ প্রশস্ত, আমাদের দেশের ডাক বাংলার মত, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি সাহেবদের প্রয়োজনীয় আসবাব সকলই রহিয়াছে, দুই তিনটি বড় বড় ঘর ও দুইটি প্রশস্ত দালান রহিয়াছে। বাংলাটি বড় সুন্দর স্থানে গঠিত। সাম্নে একটু সমতল জমী চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। সেই জমীর মাঝে বসিবার জন্য পাথরের এক গোলাকার চাতাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাচীরের পরেই পাহাড়ের গা একেবারে নামিয়া নদী বক্ষে গিয়া মিশিয়াছে। এই বাংলার সাম্নে দাঁড়াইয়া নীচেকার দুই নদী ও চতুর্দ্দিক-কার দৃশ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমি চৌকিদারকে কিছু দুধ ও কাষ্ঠের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চাতালের উপর গিয়া বসিলাম। বোতল হইতে জলপান করিলাম, আমলকীর জন্য জল অতি মিষ্ট লাগিল। তার পর বসিয়া সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ধরাসুর এই বাংলা সোজা পথে মুসূরী হইতে প্রায় ৬০ মাইল। এখানে

ডাণ্ডির সাহায্যে মুসূরী হইতে ৪ দিন কিম্বা ৫ দিনে আসা যায়। যাঁহারা মুসূরী বেড়াইতে যান তাঁহারা বন্দোবস্ত করিলে অনায়াসে এখানে যাইতে পারেন। এখন প্রায় দুই ঘণ্টা দিন রহিয়াছে। আজ ১৫ মাইলের পড়াও হইলেও বেশ বেলাবেলি চলিয়া আসিয়াছি। ক্রমে একে একে সকলেই বাংলায় আসিয়া পৌঁছিলে কুলীরাও আমাদের জিনিস পত্র লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। আজ বাংলা দেখিয়া সকলেই খুসী। ধনোটির পর আমরা এরূপ পরিষ্কার ও আসবাব সরঞ্জাম যুক্ত বাংলা আর পাই নাই। টিহরী যদিও এ রাজ্যের রাজধানী তথাপি এ বাংলার সহিত আমরা টিহরীতে যে ধর্ম্ম-শালায় ছিলাম তাহার তুলনাই হইতে পারে না। কুলীরাও অত্যন্ত খুসী কেন না গ্রাম নিকটেই পাহাড়ের গায়ে অতএব তাহাদের আবশ্যকীর দ্রব্য সকল শীঘ্রই আহরণ করিতে পারিবে। এখানে জিনিস পত্রও অনেক পাওয়া যায় ও আঠার দামও সুবিধা ছিল, ১৲ টাকায় ৮ সের। তা ছাড়া আজ আর তাহাদের কাঠ ও জল আনিতে হইল না। এখানকার চৌকিদার সে ভার লওয়াতে তাহারা আমাদের জিনিস পত্র রাখিয়াই গ্রামের দিকে ছুটিল। কেবল শিকারী টাণ্ডেল ও অপর দুই একটি কুলী আমাদের আবশ্যকীয় জিনিস পত্র খুলিয়া বাহির

করিল ও আমাদের খাট ও বিছানা প্রস্তুত করিতে লাগিল। আজ রাত্রে আমাদের এক কাউন্সিল বসিল। প্রথমে গঙ্গোত্তরী না প্রথমে যমুনোত্তরী যাওয়া হইবে এই কথার মিমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সতীশের মেজাজটা আজ তত ভাল ছিল না। ১৫ মাইল চলার পর যমুনোত্তরীর বরফের পথে যাইবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এ সময় যমুনোত্তরীর পথের কথা আমরা বিশেষ জানিতাম না। সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুস্তকে যমুনোত্তরীর পথের সঙ্খিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তিনি তাহা অপরের মুখে শুনিয়া লেখাতে যাহা প্রকৃত তাহার সহিত কিছু কাল্পনিক বর্ণনা আসিয়া পড়িয়াছে। যতদূর স্মরণ হয় তাঁহার পুস্তকেই পাইয়াছিলাম যে "যমুনোত্তরীর পথে একস্থানে ১২ মাইল ব্যাপি এক ভীষণ চড়াই আছে, পথের অধিক অংশই বরফে আবৃত চলিতে পা বরফে ডুবিয়া যায়, রাস্তায় কোথায় ভাঙ্গা কোথায় গর্ত্ত আছে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না অতি সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে হয়। আর সমুদ্র হইতে যমুনোত্তরীর উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফিট্"। উপরোক্ত বর্ণনা পড়িয়া যদিও আমরা একেবারে ভগ্ন মনোরথ হই নাই তথাপি পথ যে বিশেষ সুগম নয় তাহা উপলব্ধি হইয়াছিল। দেশে বসিয়া পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের কথা পড়িতে বা শুনিতে

কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এখন আমরা ভুক্ত ভোগী কাজেই চড়াই ও উৎরাইয়ের অর্থ আমাদের কিছু অবিদিত নাই। যে পথে ১২ মাইল ক্রমাগত ও ভীষণ চড়াই আছে সে পথকে আমরা অত্যন্ত কঠিনই বলিব। আমাদের সঙ্গী কুলীদের মধ্যেও কেহ যমুনোত্তরী যায় নাই। শিকারী ও টাণ্ডেলও সে রাস্তা জানিত না। তবে আমাদের সঙ্গে টিহরী হইতে যে চাপরাশি আসিয়াছিল সে আমাদের খুব সাহস দিল ও বলিল "রাস্তা এমন কিছুই শক্ত নয়, আর পথ ধরাসু হইতে কেবল মাত্র ৪০ মাইল। শেষ ৪।৫ মাইল ছাড়া আমরা এতদূর যেরূপ পথে আসিয়াছি পথ প্রায় সেইরূপ, জায়গায় জায়গায় চড়াই আছে কিন্তু পথে বরফ কিছুই নাই। যদিও এ রাস্তায় ধর্ম্মশালা বা বাংলা দুই একটির অধিক নাই আমাদের সঙ্গে তাম্বু থাকাতে রাত্রে আমাদের থাকিবার কোন অসুবিধাই হইবে না। রাস্তায় যাইতে অনেক গ্রাম পাওয়া যাইবে সেখান হইতে কুলীদের ও আমাদের জন্য আটা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে"। এই সকল কথা শুনিয়া আমরা প্রথম যমুনোত্তরী যাওয়াই স্থির করিলাম। পথ কেবল ৪০ মাইল, ৪ দিনে হউক ৫ দিনে হউক কোন মতে পৌঁছান যাইবে,

এইরূপ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ মত স্থির হইল। সতীশ কিন্তু শুনাইয়া রাখিল যে সে যমুনোত্তরী যাইতে অক্ষম, আমরা তখন তাহার কথা এক প্রকার অগ্রাহ্যই করিলাম।

ধরাসু।

৫ই অক্টোবর ১৯১৪।

সকালে উঠিয়া আমরা যাইবার আয়োজন করিতেছি এমন সময় সত্যেন বলিল যে তাহার শরীর ভাল বোধ হইতেছে না। গত কল্য ভরলানা হইতে ধরাসুর রাস্তায় সে অনেক দূর হাঁটিয়া আসাতে শরীর কিছু অবশ ছিল। ইহার পূর্ব্বে সে ডাণ্ডির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। ডাণ্ডির কুলীরা নানা প্রকার উপায়ে তাহাকে মধ্যে মধ্যে হাঁটাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহাদের চেষ্টা প্রায়ই বিফল হইত। মুসূরী হইতে টিহরী পর্য্যন্ত ফণীও ডাণ্ডি ছাড়ে নাই, কিন্তু টিহরী হইতে বাহির হইয়া পর্য্যন্ত সে প্রায়ই ডাণ্ডি ছাড়িয়া চলিত বিশেষ উৎরাইয়ের মুখে খুব আগ্রহের সহিত চলিত। ফণী এইরূপ চলিতে আরম্ভ করায় সত্যেনের ডাণ্ডিওয়ালারা আরও গোলযোগ আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল যে অপর ডাণ্ডিওলা সাহেব অনেক রাস্তা চলিয়া যায় তাহাতে কুলীদের অনেক আসান বা কষ্টের লাঘব হয় কিন্তু তাহাদের সাহেব একবার ডাণ্ডিতে উঠিলে আর নামিতে চাহেনা। ফণীও রোজ সন্ধ্যায় ডেরায় উপস্থিত হইয়া মহা আস্ফালনের সহিত সত্যেনকে বলিত সে সেদিন

৫।৬ কিম্বা আরও বেশী মাইল চলিয়াছে। তাহাদের ভিতর এই পায়ে রাস্তা চলা ও অপরাপর বিষয় লইয়া বেশ একটা রেশা রেশী চলিত। ফণীর আস্ফালন ও কুলীদের বাক্যবান বোধ হয় তাহার অসহ্য হইয়াছিল, কেননা গত কল্য সে হঠাৎ ডাণ্ডি ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পর্ব্বতে চলা অভ্যাস না থাকিলে প্রথম ৪।৫ দিন অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। আমাদের সমতল ভূমিতে চলা অভ্যাস, তাহাতে বাংলা দেশের মাটি, সেখানে গড়াইয়া যাওয়া চলে। প্রথম দিন পাহাড়ী জমীতে বেশী চলিতে চেষ্টা করিলে উঁচা নীচাতে পায়ে বিশেষ ব্যথা ও আঘাত লাগার সম্ভাবনা সেই জন্য পাহাড়ে গিয়া অনেকেই প্রথম ৪।৫ দিন আস্তে আস্তে চলেন, যত দিন না তাহাদের "হিল্ লেগস্" অর্থাৎ পাহাড়ে চলিবার মত পা হয়। যাহোক সত্যেন বোধ হয় প্রথম দিনই ফণীর রেকর্ড ব্রেক করিবার চেষ্টায় ছিল, তাহার ফল হইল পর দিন গায়ে ব্যথা ও জ্বর ভাব। আজ ধরাসুতে থাকাই স্থির হইল। দুই তিন দিন পরে পরে চলিবার পর এক দিবস কোথাও বিশ্রাম করিলে বেশ আরাম বোধ হয়। রোজ সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই কাপড় পরিয়া জিনিষ পত্র গুছাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করা এত নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছিল যে এক দিনের জন্যও

জিনিস পত্র যাহা যেখানে আছে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিতে পারিলে মহা স্ফুর্ত্তি বোধ হইত। আমরা সকলে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। অপর দিন সমস্ত ক্ষণ চলিয়া রাত্রে আর চিঠি লিখিতে ভাল লাগিত না, যদিও আমি প্রায় রোজই সে দিনের ঘটনা গুলি ডায়ারীতে লিখিয়া রাখিতাম। আমাদের সঙ্গে একটি রাইফ্যাল ও একটি গান্ ও যথেষ্ট টোটা ছিল, কিন্তু শিকারের মধ্যে এক বন্য মুরগী ছাড়া এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। আজ শিকারী আসিয়া বলিল যে জঙ্গলে গেলে কিছু শিকার মিলিতে পারে, তখন বেলা প্রায় ৯।৯৷৷০। আমাদের মধ্যে প্রধান শিকারী শৈলেন যাইবার জন্য তত আগ্রহ প্রকাশ না করাতে শিকারী বলিল যদি তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে বন্দুক ও কিছু টোটা লইয়া শিকারের চেষ্টা দেখে। তাহাকে সহজেই অনুমতি দেওয়া হইল। শৈলেন তাহার ম্যাগাজিন রাইফ্যালএর (magazine rifle) অন্ধি সন্ধি তাহাকে সব দেখাইয়া দিল। ম্যাগাজিন মানে সে বন্দুকটিতে এক সঙ্গে ৫টি টোটা ধরে ও ট্রিগার টিপিলেই একটির পর একটি করিয়া ৫টি গুলি মারা যায়। সতীশ বলিল "আমিও শিকারীর গোঁফ দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে উহার শিকারের ক্ষমতা কতদূর এখন জানোয়ার মারিতে গিয়া মানুষ মরিয়া না আনে, তবে এ জঙ্গলে

বেশী মানুষ নাই তাই রক্ষা"। এরূপ লোক অনেক দেখা যায় যাহারা নিজে কোন কাজ পারুক বা না পারুক অপরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে অতি মজবুদ। বন্ধুবর সতীশ চন্দ্রকে সেই শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহি না, কিন্তু শিকারী সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ অযথা। শিকারীবন্দুক লইয়া যাইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কুলীদের একটা সোর গোল শুনা গেল। গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বুঝা গেল শিকারী কিছু একটা শিকার করিয়াছে। আমরা সকলেই মহা আগ্রহে শিকারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই বন্দুক স্কন্ধে শিকারী আসিতেছে দেখা গেল। তাহার সহাস্য বদন দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল কিছু একটা মারিয়াছে। অল্প পরেই দুইজন কুলী একটি ছোট পাহাড়ী হরিণের মৃত দেহ একটি বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া লইয়া আসিতেছে দেখা গেল। সতীশ তখন বলিল "ভাগিগস্ শিকারী গিয়াছিল তাই আজ মৃগ মাংস আস্বাদন করিতে পাইব। আর আর বড় বড় শিকারীদের (আমার ও শৈলেনের উদ্দেশ্যে) সামর্থ বুঝা গিয়াছে"। এইরূপ হরিণকে পাহাড়ীরা গোড়র বলে, রং পাট্‌কিলে, বড় বড় লোম, ছোট ছোট শিং, দেখিতে বড় ছাগলের মত, ওজন প্রায় ১২।১৩ সের। শিকারী বলিল পর্ব্বতের

উপর হইতে প্রায় ৮০।৯০ গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে হরিণটিকে দেখিয়া সে গুলি মারিয়াছিল। প্রথম গুলি না লাগাতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া হরিণটি দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ম্যাগাজিন্ রাইফ্যাল্ থাকাতে সে আরও দুই গুলি পরে পরে চালাইয়াছিল, তৃতীয় গুলির পর হরিণটি পড়িয়া যায়। তৃতীয় গুলি তাহার পশ্চাদ্ভাগে লাগিয়া বুকের নিকট দিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছিল। শিকার দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সতীশের আগ্রহ বেশী দেখা গেল। টাট্‌কা মৃগ মাংস দেখিয়া আমরাও সকলেই সন্তুষ্ট ও শিকারীকে ধন্যবাদ দিতে তৎপর। শৈলেন কিন্তু এ শিকারে বিশেষ সন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। কারণ, হয়ত সে ভাবিয়াছিল যে সে দলের মধ্যে প্রধান শিকারী হইয়াও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু মারিতে পারে নাই, আর আমাদের চাকর শিকারী যে কখন ম্যাগাজিন্ রাইফ্যাল দেখে নাই প্রথম দিন তাহা পাইয়াই একটি হরিণ মারিল, ইহাতে তাহার প্রেষ্টিজ্ কিছু কমিয়া যাইবে। যাহা হউক আমরা তখন প্রেষ্টিজ্ অপেক্ষা হরিণের মাংস কিরূপে ভাগ করিব তাই ভাবিতেছিলাম। যে পায়ে গুলি লাগিয়াছিল সেইটি শিকারী দাবি করাতে তাহাকে দেওয়া গেল। আমরা অপর তিনটি পা লইলাম। অবশিষ্ট কুলীদের দেওয়া হইল,

তাহারা নাড়ী ভুঁড়ীও বাদ দিলনা, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া রাঁধিয়া ফেলিল। চামড়াটি ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইল। এখানকার কুলীরা সকলেই মাংস খায়। হরিণের মাংস কিন্তু বোধহয় সকলের ভাগ্যে জোটে নাই কেননা ৩০ জন কুলীর মধ্যে ৪।৫ সের মাংস ভাগ করা বড় সহজ নয়। আমরা হরিণের মাংস রাঁধিতে ব্যস্ত হইলাম। আমাদের সঙ্গে বৃহৎ আকারের একটি ইক্‌মিক্ কুকার লইয়াছিলাম, ইহার পাত্র গুলি এক একটি ছোট ডেক্‌চির মত। আমরা সেগুলিকে ডেক্‌চির মতই ব্যবহার করিতাম, অর্থাৎ তাহাতেই রাঁধিতাম আর ইক্‌মিকের যে পাত্রটিতে ষ্টীম হয় সেইটিতে আমরা পান করিবার ও রাঁধিবার জন্য জল রাখিতাম, তাহার মুখে ঢাকা থাকার জন্য জলে কিছু ময়লা পড়িতে পাইত না। ইক্‌মিকের একটি দোষ রন্ধন কার্য্যে অনেক সময় লাগে। আমরা রন্ধনে অত সময় দিতে পারিতাম না। আমাদের বয়টির রন্ধনের বিত্তার পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, অতএব মাংস পাইলে আমরা নিজেরাই রাঁধিতাম। বৈকালে শৈলেন একবার শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিল কিন্তু কিছু পায় নাই। সতীশের রাত্রে একটু জ্বর ভাব হইয়া গায়ে ও হাত পায়ে অতিশয় ব্যথা বোধ করিল। সে বলিল যমুনোত্তরী যাওয়া তাহার পক্ষে

অসম্ভব। প্রথমে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমরা অনেক তর্ক বিতর্ক করিলাম কিন্তু সে যখন বলিল "আমাকে লইয়া গিয়া পথে অসুখ বেশী হইলে আমার জন্য তোমরাও আটকাইয়া থাকিবে, আর যমুনোত্তরীর রাস্তায় বাংলা কিম্বা ধর্ম্মশালা নাই যে সেখানে পড়িয়া থাকিব, তার চেয়ে ধরাসুতে ২।৩ দিন থাকিয়া একটু সুস্থ হইলে উত্তর কাশীতে গিয়া তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব, তোমরা যমুনোত্তরী হইতে ফিরিলে একত্রে গঙ্গোত্তরী যাইব," আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার যুক্তির অনুমোদন করিলাম, মনে হইল কাল সকালে হয়ত সে ভাল থাকিবে ও সকলকে যাইতে দেখিলে সেও সঙ্গ লইবে।

যমুনোত্তরী

ধরাসু হইতে গেঁউলা।

প্রায় ৯ মাইল।

———o———

৬ই অক্টোবর ১৯১৪।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমরা যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সতীশ তাহার পূর্ব্ব মতই বাহাল রাখিল, বিশেষতঃ তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমরাও আর বেশী অনুরোধ করিতে পারিলাম না। তাহাকে এই পার্ব্বত্য দেশে একলা ছাড়িয়া যাইতেও মনে কষ্ট হইল, তবে এ স্থলে থাকিবার স্থানটি উত্তম ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সকল পাওয়া যায়। আর বাংলা রক্ষকটির ব্যবহারে তাহাকেও সহৃদয় বলিয়া বোধ হইল সেইজন্য কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলাম। এ সকল প্রদেশে দুই চার দিনেই লোকে আপনার হইয়া যায়। দিনের পর দিন এই পার্ব্বত্য পথের কষ্ট ও বিপদ একত্রে সহ্য করিলে পরস্পরের প্রতি একটি মমতা ও বন্ধুত্ব আসিয়া পড়ে। কুলী চাকর প্রভৃতিকেই ছাড়িতে যেন কষ্ট হয়। কোন দিন কোন কুলীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে মনে আশঙ্কা হয় হয়ত পথে তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। অতএব

সতীশকে ছাড়িয়া যাইতে যে আমাদের কষ্ট হইবে তাহা আর বিচিত্র কি। বিশেষতঃ তাহার একটি গুণের জন্য আমরা সকলেই তাহাকে ছাড়িতে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। সমস্ত দিন চলার পর ক্লান্ত হইয়া যখন কোন স্থানে উপস্থিত হইতাম সে আমাদেরই কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে এরূপ ভাবে আক্রমণ করিত যে তাহাতে আমরা না হাঁসিয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রাণ খুলিয়া একবার হাঁসিতে পারিলে ক্লান্তির অনেক লাঘব হইত।

আমরা আজ ধরাসু হইতে গেঁউলা বলিয়া একটি স্থানে যাইব। আমাদের সহিত টিহরী হইতে যে চাপ্‌রাশি আসিয়াছিল সে যমুনোত্তরীর পথের "পড়াও" (stages) ঠিক করিয়া দিয়াছিল, আমরা কেবল তাহাকে বলিয়াছিলাম যে আমরা ৪ কিম্বা ৫ দিনে যমুনোত্তরী যাইতে চাহি। আজিকার "পড়াও" ৯ মাইল, আমরা ৪ ঘণ্টার মধ্যে তথায় পৌঁছিলাম, তখন প্রায় বেলা ২টা ২৷৷০টা। পথে এক যায়গায় একটি বৃহৎ ঝরণা পার হইতে হয়। ঝরণার উপর যে পুলটি ছিল তাহা জল স্রোতেই হক বা অন্য কোন কারণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ও শৈলেন একত্রই যাইতে ছিলাম সঙ্গে শিকারী ছিল। ফনী ও সত্যেন ডাণ্ডিতে কিছু পশ্চাতে আসিতেছিল। পুল না থাকাতে আমরা প্রায় ২০।২৫ ফিট্ নিম্নস্থ ঝরণার বক্ষে নামিয়া বড় বড় প্রস্তর

খণ্ডের উপর দিয়া ঝরণাটি পার হইলাম। ঝরণাটি এই স্থানে প্রায় একটি পার্ব্বতীয় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে, জলস্রোত ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের পার্শ্ব দিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত। ঝরণাটির অপর পারে গিয়া দেখি রাস্তাটি অনেক উচ্চে পর্ব্বতের গাত্রে, প্রায় ৩০।৩৫ ফুট উচ্চে হইবে। এ স্থলে পাহাড়ের গা একেবারে সোজা উঠিয়াছে, উপরে উঠিবার কিছু সুবিধা নাই। ঝরণার পার্শ্ব দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে দেখিলাম এক স্থলে পর্ব্বতের গাত্র কিছু ধসিয়া পড়িয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উপরের রাস্তাটীও ধসিয়া গিয়াছে। শিকারী ও দুই একজন কুলী সেই ধসা যায়গা দিয়া উঠিয়া পড়িল। আমিও শৈলেনও লাঠির সাহার্য্যে ও পাহাড়ের গা ও ছোট গাছ গাছড়ার ডাল ও শিকড় ধরিয়া কোন গতিকে যেখানে পূর্ব্বে রাস্তা ছিল পাহাড়ের সেইখানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া দেখি যে দাঁড়াইবারও স্থান নাই। আর সেখান হইতে ২০।২৫ হাত যাইতে না পারিলে রাস্তা পাওয়া যাইবে না, কিন্তু সেই ২০।২৫ হাত যাওয়াই বিপদ। সেখানে পাহাড়ের গা প্রায় সোজা উঠিয়াছে। আমরা পাহাড়ের গায়ে এক পা উপরেও এক পা নীচে দিয়া পাহাড়ের গা ধরিয়া ঝুঁকিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া ছিলাম। পাহাড়ীরা চলাতে সেখান পর্ব্বত গাত্রে একটি রেখা মাত্র

যমুনোত্তরীর পথে, ধরাসু হইতে গেঁউলার মধ্যে, ভগ্ন পথের চিত্র।



এই স্থানে পথ ধসিয়া যাওয়ায় দলের মধ্যে একজন কুলীদের সাহায্যে পর্ব্বত গাত্রে উঠিতেছেন।

১১৫ পৃষ্ঠা।

হইয়াছিল। সেই রেখাতে দুইটি পা পাশা পাশি রাখিবার স্থান নাই, একটি পা রাখিয়া অপর পাটি সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখা যায়। আমরা সেই রেখা অবলম্বনে একটির পর অপর পাটি আস্তে আস্তে তুলিয়া চলিতে লাগিলাম, যদি পা কোন মতে একটু সরিয়া যায় ত পাহাড়ের গা বহিয়া ৩০।৩৫ ফুট নীচে ঝরণার বক্ষে পতন। কিন্তু অত ভাবিবার সময় তখন ছিল না। শৈলেন ও আমি অতি সন্তর্পণে সেই ভগ্ন স্থান অতিক্রম করিয়া রাস্তা পাইলাম। রাস্তা পাইয়া মনে হইল যেন কোন বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া গেল। আমরা এই প্রথম খারাপ রাস্তা দেখিলাম। ইহার পর ইহা অপেক্ষা অনেক খারাপ রাস্তা মধ্যে মধ্যে পাইয়াছি কিন্তু তখন এত কষ্ট বোধ হয় নাই। রাস্তায় উঠিয়া আমরা ফণী ও সত্যেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ফণী প্রথমে আসিল। অপর পারের রাস্তায় ডাণ্ডিওয়ালারা তাহাকে নামাইয়া দিল। সেই রাস্তা হইতে ঝরণার বক্ষে নামিবার একরূপ রাস্তা ছিল। সে রাস্তা দিয়া নামিয়া ঝরণা পার হইয়া যখন এপারের রাস্তায় উঠিবে তখনই চক্ষু স্থির হইল। যাহাহোক ফণী শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিল। একজন কুলী আগে গিয়া তাহার এক হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল ও অপর দুইজন কুলী পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাহাকে ঠেলিতে লাগিল। এই

উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে কুলীদের সাহায্যে সে রাস্তার উপর আমাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। যতক্ষণ কুলীরা তাহাকে টানিতে ও ঠেলিতে ছিল আমি ও শৈলেন উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ফণীর একটা গুণ আছে যে হাস কিম্বা ঠাট্ঠা কর সে রাগে না সেও সে হাসিতে যোগ দিতে পারে। ইহার পরই সত্যেনের পালা। তাহাকেও কুলীরা ফণীর ন্যায় টানিয়া তুলিল কিন্তু উপরের সেই রেখার ন্যায় পথে অগ্রসর হইবার সাহস আর তাহার শীঘ্র আসিল না। যে কুলী তাহার সম্মুখে ছিল সে তাহার হস্ত ধরিয়া টানিবার উপক্রম করিলে সে রাগত ভাবে তাহাকে বারণ করিল। ফণী কিন্তু এখন নিরাপদ স্থানে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া উচ্চ হাস্য আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার হাস্যের জন্যই হউক বা অগ্রসর ভিন্ন আর উপায় না থাকাতে সত্যেন অতি ধীরে ধীরে কুলীদের সাহায্যে কোন মতে রাস্তায় আসিল। যদি কোন চিত্রকর সে স্থলে উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে সত্যেনের সেই সময়কার মুখ দেখিয়া বিভীষিকার জলন্ত মূর্ত্তির আদর্শ চিত্র সে আঁকিতে পারিত। আমি আমার কোডাকের সাহায্যে একটি ছবি লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু এই ছবিটি বড় অস্পষ্ট উঠিয়াছে। আমরা গেঁউলায় আসিয়া রাস্তার ধারে ১৫।২০

গজ সমতল জমী পাইয়া আমাদের তাম্বু দুইটি গাড়িলাম। আজ হইতে আমাদের তাম্বুতে বাস আরম্ভ হইল। কাছেই একটি ছোট ধর্ম্মশালা ছিল কুলীরা তথায় আশ্রয় লইল। আজিকার রাস্তায় চড়াই ও উৎরাই অধিক না থাকাতে ও রাস্তা কম হওয়াতে আমাদের কাহারও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। কুলীরাও ৩।৪ ঘণ্টা বেশী ছুটি পাইয়া খুসী হইল।

গেঁউলা হইতে গঙ্গানী।

প্রায় ১৪ মাইল।

——o——

৭ই অক্টোবর ১৯১৪।

টিহরীর চাপ্‌রাসী বলিল যে "আজিকার রাস্তায় একটি বিষম ২৷৷০।৩ মাইল ব্যাপি চড়াই আছে"। পর্ব্বত যাত্রীর চড়াইয়ের নামেই মনে আশঙ্কা হয়। ক্রমাগত চড়াই থাকিলে অনভ্যস্ত ব্যক্তির তাহাতে বুকে ব্যথা বোধ হয় ও হাঁপধরে এবং এত শীতের দেশেও গলদঘর্ম্ম হয়। তবে রাস্তা কেবল ৯ মাইল শুনিয়া অনেক আশ্বস্থ হইলাম। গত কল্য ৯ মাইল চলিতে কিছুই কষ্ট হয় নাই, ভাবিলাম চড়াই থাকিলেও দূরত্ব অল্প বলিয়া কষ্ট হইবে না। চাপরাসী বলিয়াছিল যে চড়াই পার হইয়া উৎরাইয়ের মুখে গঙ্গানীর ধর্ম্মশালা পাওয়া যাইবে। আমরা আজ প্রাতে ৭টার সময়ই চলিতে আরম্ভ করিলাম, ইচ্ছা বেশী বেলা বাড়িবার আগে চড়াই শেষ করিব। এখনও দিবাভাগে রৌদ্রে চলিতে কষ্ট বোধ হইত। প্রায় ৫ মাইল রাস্তা চলিয়া তবে চড়াই আরম্ভ হইল এই ৫ মাইলের মধ্যে সাধারণ পার্ব্বতীয় রাস্তার মত কিছু কিছু চড়াই উৎরাই ছিল।

চড়াই মানে একটি পাহাড়ের গা বহিয়া উপরে উঠা। রাস্তাটি একদিকে পাহাড়ের গা দিয়া বাঁকিয়া কতক দূর উঠিয়া আবার বাঁকিয়া অন্য দিক দিয়া উঠিয়াছে। চড়াইয়ের সময় অল্প দূর উঠিলেই রাস্তার বাঁক পাওয়া যায়। এইরূপ একটির পর আর একটি বাঁক ছাড়াইয়া আমরা ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম পর্ব্বতের গাত্রটি তত বৃক্ষ লতা গুল্মে বেশী আচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইল ও এই সকল বৃক্ষের মধ্যে অনেক দেবদারু বৃক্ষ দেখিলাম। রাস্তাটি বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়াতে সূর্য্যের উত্তাপ আর অধিক সহ্য করিতে হইল না। দেবদারু বৃক্ষগুলি বড় সুন্দর। লম্বা লম্বা প্রহরীর মত যেন নিশ্চেষ্ট ও স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বেশী দেবদারু বৃক্ষ জন্মিয়াছে সেখানে পাহাড়ের গায়ে লতা গুল্ম অপেক্ষাকৃত কম। গাছের তলায় ও রাস্তার উপর দেবদারের সরু সরু কেশরের মত পাতা গুলি পড়িয়া আছে, এই পাতা গুলি মসৃণ। যেখানে অধিক পড়িয়াছে তথায় সাবধানে চলিতে হয় তাহা না করিলে পা পিছ্‌লাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। চড়াইয়ের সময় একটি কিম্বা দুইটি করিয়া রাস্তার বাঁক পার হইলেই দাঁড়াইয়া হাঁপ লইতে হয়। পাহাড়ীরা চড়াইয়ের সময় কখন দ্রুত গতি চলেনা "ছোট ছোট পা" ফেলিয়া

সম গতিতে অগ্রসর হয়। তাহাদের পায়ের তলদেশ সমস্ত মৃত্তিকা স্পর্শ করে। আমি কিন্তু চড়াইয়ের সময় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে কেবল মাত্র পায়ের অঙ্গুলি সকলের উপর শরীরের ভর রাখিয়া উঠিতাম তাহাতে শীঘ্রই দম বাহির হইয়া যাইত, তবে এ পাহাড়ের নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ুর গুণে এক আধ মিনিট দাঁড়াইলেই আবার দম ফিরিয়া পাইতাম। বেলা আন্দাজ ১১টার সময় আহারের জন্য একস্থানে বসা হইল। আমরা প্রাতে বিছানায় শুইয়াই চা ও দুই খানা করিয়া বিস্কুট খাইতাম। তার পর বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে ভাল একটি ঝরণা ও পরিষ্কার স্থান দেখিয়া মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বসিতাম। মধ্যাহ্ন আহারের জন্য হাতে গড়া মোটা রুটি ও তরকারি ও কোন কোন দিন তাহার সহিত ঠাণ্ডা মাংস থাকিত। যতদিন জ্যাম কি মারম্যালেড বা চাট্নি ছিল তাহাও একটু একটু খাইতাম। প্রথম প্রথম হাতে গড়া আঠার রুটি ২।৩ খানার অধিক খাইতে পারিতাম না কিন্তু শেষে প্রায় ৬।৭ খানা পর্য্যন্ত এক এক বেলায় খাইয়া ফেলিতাম। প্রথম আমরা পূর্ব্ব রাত্রের প্রস্তুত রুটি ও তরকারি এই মধ্যাহ্ন ভোজনে খাইতাম তাহার কারণ প্রাতে উঠিয়া রাঁধিতে গেলে বিলম্ব হইবে, আর মধ্যাহ্নেও যে স্থানে আমরা বিশ্রাম করিতাম সেখানে সকল

দ্রব্যের জোগাড় হওয়া সকল সময় সুবিধা হইত না। এই ঠাণ্ডা দেশে খাবার কিছু খারাপ হইত না তবে রুটি ঠাণ্ডায় জমিয়া শক্ত হইয়া থাকিত। শেষে আমরা প্রাতে ছাড়িবার পূর্ব্বেই রাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ইহাতে খাবার অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় পাইতাম। মধ্যাহ্নে আবার সেই সকল খাবার বয় গরম করিয়া দিত। এই মধ্যাহ্ন আহারের পর আমরা হয় চা বা কফি কিম্বা কোকো পান করিতাম। মধ্যাহ্নে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল আমরা চলা স্থগিত রাখিয়া আহারাদি ও বিশ্রাম করিতাম। তরকারির মধ্যে আলু অনেক স্থলে পাইয়াছিলাম, তবে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত না, কিন্তু কুমড়া বা পাহাড়ীরা যাহাকে কদু বলে তাহা কখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়া হয় নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কোথাও ডেরা ডাণ্ডা গাড়িলেই আর কিছু পাওয়া যাক বা না যাক এই কদু আসিয়া উপস্থিত হইত। এমন অনেক দিন গিয়াছে যখন রুটির সঙ্গে এই কদু সিদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ফণী অবশেষে বলিত বাড়ীতে ফিরিলে ১ বৎসর যাবৎ কুমড়া খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে। আহার ও বিশ্রামের পর আমরা আবার চড়াই উঠিতে লাগিলাম। একটি বাঁক পার হই আর মনে হয় এইবার পাহাড়ের শিখর দেশে আসিব ও চড়াই শেষ হইবে কিন্তু সে

রাস্তা টুক শেষ হইলেই দেখি পরের রাস্তা আবার উপর দিকে উঠিয়াছে। যাহা হউক সকল জিনিসেরই শেষ আছে। বেলা আন্দাজ ৩৷৷০ টার সময় এই সুদীর্ঘ চড়াইও শেষ হইল ও আমরা পর্ব্বতটির শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। টিহরীর চাপ্‌রাসি আমাদের সঙ্গেই ছিল সে বলিল এইবার চড়াই শেষ হইল ও অল্পদূর উৎরাইয়ের পরই আমরা গঙ্গানী পৌঁছাইব। এ পর্য্যন্ত আমরা আজ প্রায় ৮৷৷৯ মাইল রাস্তা আসিয়াছি। সে আজিকার রাস্তার দূরত্বের যে আন্দাজ আমাদের দিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভূল। কিন্তু চড়াই শেষ হইয়াছে ও অল্প দূর উৎরাইয়ের পরই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইব ভাবিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত হইলাম। সেই পর্ব্বতের উপর শৈলেন ফণী ও চাপরাসীর একটি ফটো তুলিলাম ও সকলে উপস্থিত হইলে আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। চড়াইয়ের পর উৎরাই বেশ ভাল লাগে কাজেই আমরা মনের আনন্দে দ্রুত নামিতে লাগিলাম। পা যেন ধরিয়া রাখিতে পারা যাইতেছে না একটির পর আর একটি পদ বিক্ষেপ যেন কোন অলক্ষিত ক্ষমতার দ্বারা হইতেছে। আমরা সে পদবিক্ষেপ থামাইবার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম যে উৎরাইয়ে জোর চলিয়া আমি ভূল করিয়াছি,

যমুনোত্তরীর পথে ফণী, শৈলেন ও টিহরীর চাপ্‌রাসী।



গেঁউলা হইতে গাঙ্গনানীর পথে এক দীর্ঘ ৫ মাইল চড়াইয়ের পর পর্ব্বতের শিখর দেশে এই ছবি লওয়া হয়।

কেননা এক মাইল আন্দাজ উৎরাইয়ের পরই আমার পূর্ব্বোক্ত পায়ের ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। ফণী আজ উৎরাইয়ের মুখে পদব্রজেই চলিতেছিল, আমার পায়ের ব্যথা শুনিয়া আমাকে তাহার ডাণ্ডি চড়িতে অনুরোধ করিল, আমিও পায়ের অবস্থা বুঝিয়া ফণীর ডাণ্ডি চড়িলাম। ফণী ও শৈলেন বেশ দ্রুত চলিয়া শীঘ্রই আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। আমিও সত্যেন ডাণ্ডিতে চলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইলে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ডাণ্ডির কুলীরাও বলিতে লাগিল গঙ্গানী প্রায় সে স্থান হইতে ৫ মাইল দূর, তথায় যাইতে রাত্রি হইয়া যাইবে, আর তথায় কোন ধর্ম্মশালা নাই, চাপরাসী আমাদের ভূল খবর দিয়াছে। শীঘ্রই আমরা রাস্তার ধারে একটি প্রস্তরের ধর্ম্মশালার ন্যায় বাড়ী দেখিতে পাইলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি তাহাতে সারি সারি ৪টি ঘর আছে, একটি ঘরে একটি করিয়া দরজা, ঘরগুলি বিশেষ উচ্চ বা প্রসস্ত নয়। আমি ও সত্যেন এই স্থলে আমাদের ডাণ্ডি থামাইয়া শৈলেন ও ফণীর নিকট রথিকে পাঠাইয়া দিলাম ও বলিতে বলিলাম যে আজ গঙ্গানী পর্য্যন্ত না গিয়া এই খানেই রাত্রিবাস করা শ্রেয়। বিশেষ অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের জিনিষ পত্র সব ভিজিয়া যাইবার

সম্ভাবনা, আর কুলীরাও ভিজিয়া কষ্ট পাইবে। রথি কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে "তাহারা না ফিরিয়া অগ্রসর হইল"। তাহারা বোধ হয় ভাবিল যে কুলীরা আজ আর অধিক দূর যাইতে চাহে না তাই একটি ওজর করিয়া রাত্র ঐ স্থানে থাকিতে চায়। আমরা অগত্যা তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আজিকার চড়াই ও যেমন লম্বা উৎরাই তদপেক্ষাও অধিক। ক্রমাগত নামিতেছি তবু নামা আর শেষ হয় না, পথও ফুরায় না। কুলীরাও বকাবকি করিতেছে চাপরাসীকে গালি দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে প্রায় ৪ মাইল আসার পর দূরে বাম দিকে একটি নদী দেখিতে পাওয়া গেল ও সম্মুখে একটি ঝরণার অপর পারে কিছু সমতল ভূমিতে মড়ুয়া কিম্বা অপর কোন শস্য হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। একটি ডাণ্ডির কুলী এপথে ইহার পূর্ব্বে আসিয়াছিল সে দূরের নদী দেখাইয়া বলিল "ঐ যমুনা নদী গঙ্গানী যমুনার তটদেশে এস্থান হইতে প্রায় ২ মাইল দূর"। এই আমাদের এপথে প্রথম যমুনা দর্শন। ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াই গঙ্গাকে আর দেখিতে পাই, নাই এখন যমুনাকে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল ও অভিষ্ট সিদ্ধির আশা ও বলবতী হইল। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া

আসিয়াছিল। শীঘ্রই দিনের আলো কমিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলিবার পর আমরা একটি কাষ্ঠের পুলের উপর দিয়া পূর্ব্বোক্ত ঝরণাটি পার হইয়া শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। উৎরাইও শেষ হইল, বোধ হয় প্রায় ৫ মাইল পথ ক্রমাগত নামিয়া ছিলাম। সন্ধ্যাকালে নানাবিধ পক্ষীর মধুর ডাক শুনিলাম। কিন্তু মন আজ কোন মতে নিশ্চিন্ত হইতে ছিল না, তাহাতে কুলীরা এত লম্বা রাস্তা চলিতে হইতেছে বলিয়া বচসা করিতে লাগিল, মনে মনে চাপ্‌রাসীর উপর অত্যন্ত রাগ হইল। গঙ্গানী এত দূর যদি সে আমাদের পূর্ব্বে বলিত তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বে কথিত ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিতে পারিতাম। চাপ্‌রাসী কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল না। সে গঙ্গানীতে আমাদের রাত্রিবাস ও আহারের বন্দোবস্ত করিতে অগ্রে গিয়াছিল সুতরাং তখন তাহাকে কিছু বলিবার সুবিধা হইল না। পূর্ব্বোক্ত পুল হইতে প্রায় ১॥০ মাইল রাস্তা চলিবার পর আমরা গঙ্গানী পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে, অন্ধকারে পথ আর দেখা যায় না। পাহাড়ী লাঠির সাহায্যে একটি ছোট পাকদাণ্ডি দিয়া গঙ্গানীতে নামিলাম। নামিয়া দেখি একটা আঙ্গিনার দুই দিকে দুইখানা ঘর তাহার মধ্যে একটি

দ্বিতল। আঙ্গিনায় বড় বড় কড়ির মত কতকগুলি কাঠ পাশাপাশি বিছানো আছে, শৈলেন ও ফণি সেই কাষ্ঠের উপর হতাশভাবে বসিয়া আছে। ধর্ম্মশালা কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা যে স্থানে বসিয়াছিল সেই স্থান দেখাইয়া দিল। বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ ১৪।১৫ মাইল পথ আসিয়া মেজাজ বড় সন্তুষ্ট ছিল না, তাহাতে গঙ্গানীতে প্রত্যাশিতে কোন ধর্ম্মশালা না দেখাতে অসন্তোষের কারণ যথেষ্ঠই হইয়াছিল। ফণী ও শৈলেনকে পূর্ব্বোক্ত পথিমধ্যস্থিত ধর্ম্মশালায় না থামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল গঙ্গানী অল্প দূর মনে করিয়াই তাহারা চলিয়া আসিয়াছিল। সকল কষ্টের কারণ টিহরীর চাপরাসীই বলিয়া মনে ধারণা হইল, সে পথ অল্প না বলিলে এত দূর কেহই আসিত না। ইতিমধ্যে চাপরাসী জন কতক গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া আসিল, তাহারা দুধ, কুমড়া, আটা ইত্যাদি আনিয়াছিল। এই সময় যাত্রীদের যাইবার সময় নয় বলিয়া যমুনোত্তরীর পথে দোকান পসার থাকে না। আটা, দুধ, ঘী, কুমড়া ও কোন কোন স্থলে আলু পথ পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। এই কার্য্য চাপ্‌রাসীর দ্বারাই হইত। আমরা তাহাকে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ন্যায্য দাম দিয়া জিনিস লইতে

বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে যদিও আমাদের নিকট হইতে পুরা দাম লইত গ্রামবাসীদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব সরকারের চাপ্‌রাসী বলিয়া দাম না দিয়াই জিনিস আদায় করিত। চাপ্‌রাসী যখন খোরাক সংগ্রহ করিয়া সহাস্য বদনে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহাকে আমাদের মনের ভাব শুনাইবার বাসনা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। কেবল মাত্র একটু সুবিধার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ও সে সুবিধা শীঘ্রই পাইলাম। গ্রামবাসীদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল তাহাদের যেন কিছু বলিবার আছে। তাহারা জিনিসের দাম পাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কিছু বলিবার আগেই চাপরাসী বলিল "হুজুর আমি দাম টাম সব ঠিক করিয়া দিব"। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জিনিসের ন্যায্য দাম দিতে বলিলাম। তাহাতে সে কিছু ইতঃস্তত করাতে তাহাকে বিশেষরূপ ভর্ৎসনা করিলাম। ভর্ৎসনার তীব্র বেগে সকল সময় হিন্দি ভালরূপ যোগায় নাই, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে ও উচ্চৈঃস্বরে মনের বিরক্তি যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল কুলী উপস্থিত ছিল তাহারা এই ভর্ৎসনা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত যে আজিকার এই লম্বা পড়াওয়ের কারণ হইতেছে টিহরীর চাপরাসী। আমরা

পৌঁছিবার প্রায় ১ ঘণ্টা পরে মোটওয়ালা কুলীরা পৌঁছিল। আমরা যমুনা হইতে প্রায় ৪০।৫০ হাত তফাতে বালীর উপর তাম্বু লাগাইলাম। বালির উপর হওয়াতে খোঁটা রাখা বড় মুস্কিল হইল। যাহা হউক অনেক চেষ্টায় ও খোঁটার উপর বড় পাথর চাপাইয়া তাম্বু টাঙ্গান হইল।

গঙ্গানী হইতে উজ্‌রী।

৯ মাইল।

——o——

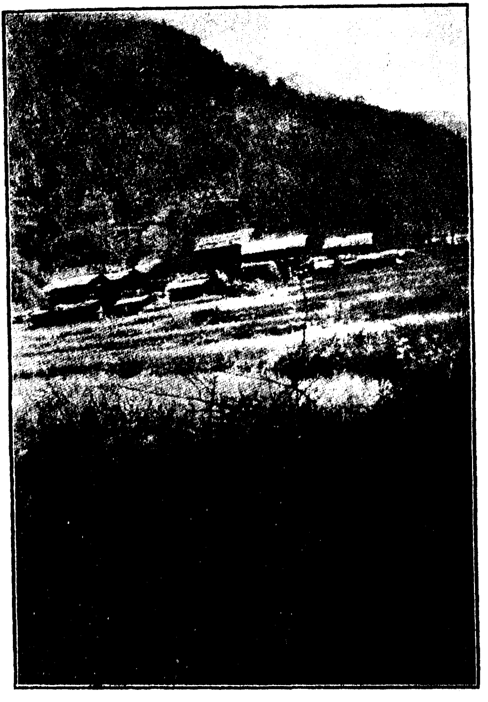
৮ই অক্টোবর ১৯১৪।

গত রাত্রে যমুনার কল কল ধ্বনি আমাদের নিদ্রার সাথী হইয়াছিল কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে নদী যে এত নিকট তাহা বুঝিতে পারি নাই। আজ প্রাতে উঠিয়া দেখি স্বচ্ছসলিলা যমুনা আমাদের তাম্বুর অতি নিকটে। নদী কিনারা বিস্তৃত ও তাহাতেই গঙ্গানীর ধর্ম্মশালা অবস্থিত। কাল রাত্রে যে দুইটি ঘর দেখিয়াছিলাম তাহারই একটি ধর্ম্মশালা, সেটি কিন্তু তথাকার রক্ষকের ব্যবহারেই আইসে। ধর্ম্মশালার চতুর্দিকে নানারূপ বৃক্ষ রহিয়াছে। এক প্রকার বড় বড় লেবু অনেক হইয়াছে দেখিলাম, সেগুলি কতকটা আমাদের দেশের গোঁড়ালেবুর ন্যায় দেখিতে। ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাদিগকে অনেকগুলি এই লেবু দিল। স্থানটি বেশ মনোরম, কতকটা উদ্যানের মত দেখিতে। আমরা এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া শীঘ্রই অগ্রসর হইলাম। রাস্তা যমুনার কিনারা দিয়া অল্পে অল্পে উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে আজ নানা

ফুলের ও ফলের গাছ দেখিলাম। নানা রকম ছোট ছোট পাখীও তাহাদের প্রভাতকালীন গান আমাদের শুনাইতে লাগিল। হিমালয়ে পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, কোকিল প্রভৃতি সকল প্রকার সুমধুর পাখীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। প্রায় ৬ই মাইল পথ আসার পর কুত্‌নোর নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। রাস্তার কিছু উপরে এক স্থলে তিনটি বড় বড় দেবদারু বৃক্ষের তলে কিয়ৎ পরিমাণ পরিষ্কার সমতল ভুমি আছে। মধ্যাহ্ন বিশ্রাম ও আহারের জন্য আমরা এইখানেই থামিলাম। এই স্থান হইতে কুত্‌নোর গ্রামটি সমস্তই দেখা যায়। তাহাতে প্রায় ৩০।৪০টি কাঠের বাড়ী আছে। গ্রামের একটি লোক একটি বড় শসা লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইল। নিকটে কোন ঝরণা ছিল না, সে লোকটি শীঘ্রই একটি বড় তামার ঘড়াতে এক ঘড়া জল আনিয়া দিল। তাহার এত আত্মীয়তার কারণ সে কিছু ঔষধ চায়। তাহার স্ত্রীর এক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে, কোনরূপেই আরোগ্য হইতেছে না। সে আমাদের নিকট ঔষধ চাহিল, যাহাতে তাহার স্ত্রী ভাল হয়। এরূপ দুরূহ রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা শৈলেনের জানা ছিল না। যাহা হউক তাহার মেডিসিন্ বক্সে যে পুস্তক ছিল তাহা একবার উল্টাইয়া দেখিল ও পরে

[illegible]রী ও

যমুনোত্তরীর পথে কুতনোর গ্রাম।



ইহা গাঙ্গনানী ও উজরীর মধ্যে। এখানে আমরা অনেক গ্রামবাসীকে চিকিৎসা করিয়াছিলাম। গ্রামের বাড়ীগুলি সব কাঠের।

১৩০ পৃষ্ঠা।]

তাহাকে কিছু ভেজিটেবেল্ ল্যাকসিটিভ্ পিল (জোলাপ) দিল। ইহার পর প্রায় সে গ্রামবাসী সমস্ত পুরুষ আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। কাহারও জ্বর, কাহারও পেটের অসুখ, কাহারও ঘা ইত্যাদি নানা প্রকার অসুখের কথা বলিল। শৈলেনও তাহাদিগকে ভেজিটেবেল্ ল্যাক্‌সিটিভ্ পিল্, কুইনীন্, আরনিকা লোসান যথেষ্ট পরিমাণে দিল। এ দেশের লোক, যাহার সামর্থ আছে সে প্রায় রুটি খায়, সে সকল পেসেণ্টকে রুটি ছাড়িয়া ভাত বা খিচুড়ী খাইবার ব্যবস্থা দিল। এখান হইতে প্রায় আরও ৪ মাইল পথ চলিবার পর আমরা উজ্‌রী পৌঁছিলাম। কুত্‌নোর হইতে উৎরাই করিয়া রাস্তা একেবারে নদী গর্ভে আসিয়াছে ও তথায় একটি পুল পার হইয়া আবার চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গীরা সকলেই অগ্রসর হইয়াছিল আমার পায়ের ব্যথার জন্য আস্তে আস্তে চলিতেছিলাম। একস্থলে নদীর অপর পার্শ্বের পর্ব্বত অত্যন্ত নিকট সরিয়া আসিল। পর্ব্বতের গাত্র সোজা দেওয়ালের মত, অনেক উচ্চ হইতে নদী গর্ভে নামিয়াছে। এই দেওয়ালের স্থানে স্থানে ফাট রহিয়াছে, যেন বড় বড় প্রস্তর খণ্ড দিয়া ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই প্রস্তর খণ্ড গুলি এক এক স্থানে জল পড়িয়া বেশ মস্থণ হইয়াছে, মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায় সাদা দেখাইতেছে।

আমার বোধ হইল এই পর্ব্বতটি মার্ব্বেল প্রস্তরের। হিমালয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে যে এইরূপ মার্ব্বেল প্রস্তর আছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। নির্জ্জন পথে আস্তে আস্তে একেলা চলিয়াছি হঠাৎ পায়রার সুপরিচিত স্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখি অপর দিকের পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে গর্ত্ত রহিয়াছে ও তাহাতে অনেক বন্য পায়রা রহিয়াছে। তাহারা উড়িতেছে বসিতেছে ডাকিতেছে ও খেলা করিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিলাম। যে সকল দৃশ্য নিত্যই আমাদের পরিচিত অনেকদিন পরে অপ্রত্যাশিত স্থানে তাহা দেখিলে তাহাকে যেন কতই মধুর ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ এই পায়রার ক্রীড়া দেখিবার অবসর ছিলনা। সম্মুখেই অত্যুচ্চ চড়াই সোজাভাবে উঠিয়া একটি পর্ব্বতের শিখর দেশে গিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। শিখর দেশ হইতে ১৫০।২০০ ফিট্ নিম্নে উপস্থিত হইয়া দেখি পাহাড়ের গাত্রটি তথায় ধসিয়া গিয়াছে ও তাহার সঙ্গে রাস্তাটিও ধসিয়া গিয়াছে। সেই ধসা স্থানের মাটি আল্‌গা, তাহাতে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। পাহাড়ের গাত্র বহিয়া সেই আল্‌গা মাটির উপর দিয়া কোন মতে শিখর দেশে উঠিতে হইবে পদস্খলন হইলে ৮০০ হইতে ১০০০ ফিট্ নিম্নস্থ নদী গর্ভে পড়িবার সম্ভাবনা।

তথায় পড়িবার পূর্ব্বেই কঠিন পর্ব্বত গাত্রে প্রস্তরের ঘাত প্রতিঘাতে শরীর চূর্ণ হইয়া যাইবে। আমি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় আমাদের একজন কুলী মোট লইয়া উপস্থিত হইল। সে যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহার পার্শ্ব দিয়া লম্বা লম্বা তৃণ আচ্ছাদিত এক সরু রাস্তা দিয়া অনায়াসে উঠিয়া গেল। এই পথ সম্পূর্ণরূপে ঘাসে আবৃত, আমি তাহা দেখি নাই। তাহাকে সেই পথ দিয়া যাইতে না দেখিলে তথায় যে ঐরূপ পথ আছে তাহা জানিতেও পারিতাম না। কিন্তু সে পথে কিছুদূর উঠিয়া এক বিপদ উপস্থিত হইল। লম্বা ঘাস পথের উপর পড়িয়া থাকাতে জুতা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইল। কোনরূপে লাঠিতে ভর দিয়া ও গাছের শিকড় ও ডাল পালা ধরিয়া পাহাড়ের শিখর দেশে উঠিলাম। যেখানে উঠিলাম সেস্থানও বিপদজনক, একেবারে পাহাড়ের কিনারায়। সেখানে দাঁড়াইয়া নদীর দিকে দেখিলে মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ হয়। পর্ব্বতের উপর আসিয়া দেখি পথটি এক বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া কিয়ৎ দূর গিয়াছে। সমতল ভূমিটি ছোট ছোট বৃক্ষ ও বড় বড় ঘাসে পরিপূর্ণ, মধ্য দিয়া লোক চলাতে একটি সরু পথ হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথিকের শরীরের অধিকাংশ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সমতল ভূমি পার

হইয়া আবার চড়াই আরম্ভ হইল, এবং অপর একটি সমতল ভূমি পার হইয়া আজিকার শেষ চড়াই পাইলাম। এই পর্ব্বতের শিখর দেশে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইল ও অনেক উচ্চে উঠিয়াছি জানিতে পারিলাম। ইহার পরই উৎরাই আরম্ভ হইল। এক মাইল আন্দাজ উৎরাইয়ের পর চাপ্‌রাসী বলিল "এই উজরী"। আমরা কিন্তু কোন গ্রাম বা ধর্ম্মশালা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। রাস্তার নীচে পাহাড়ের গায় থাক থাক কতকগুলি সরু সরু সমতল ভূমি রহিয়াছে। তাহাতে নাস্পাতি ও আপেল গাছের মত কতকগুলি গাছ হইয়াছে। তাহারই প্রথম জমীটিতে আমাদের তাম্বু খাটান হইল। জায়গাটি এত সরু যে তাম্বু টাঙ্গাইয়া তাহার পার্শ্বে আর বড় বেশী স্থান রহিল না। গ্রামটি এখান হইতে কিছু দূরে। জল ও কাষ্ঠের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুলীরা তথায় চলিয়া গেল। আমাদের তাম্বুর গায়ে একটি কাপড় লাগাইয়া একটি ছোট স্নান করিবার ঘর প্রস্তুত করা যাইত। এখন সেইটি একটি গাছের ডালে বাঁধিয়া একটি রান্নাঘর প্রস্তুত করা গেল। আমাদের বয় ও তাহার সহকারি কুলী বলিল তাহারা সেইখানেই রাত্রি যাপন করিবে। এখানে সন্ধ্যা হইতেই বেশ ঠাণ্ডা হইল। আমি স্লীপিং সুটের উপর উটের লোমের প্রস্তুত একটি কোট ও তাহার উপর

একটি ওভার কোট চড়াইয়া বসিলাম। প্রত্যেক তাম্বুতে দুইটি করিয়া ক্যাম্প বেড্ পড়িয়া মধ্যস্থলে প্রায় ২৷৷০।৩ ফিট্ জায়গা থাকিত। তাম্বুগুলি টাঙ্গাইলে লম্বে প্রায় ১০ ফিট্, প্রস্থে প্রায় ৮।৯ ফিট্ ও মধ্যস্থলে প্রায় ১০ ফিট্ উচ্চ হইত। দুই পার্শ্বে দুইটি ১০ ফিট্ উচ্চ খুঁটির উপর একটি বাঁশ দিয়া তাহার উপর তাম্বুর কাপড় টাঙ্গান হইত। সেই কাপড়ের নীচের দিকে কতকগুলি দড়ী বাঁধা ছিল, খোঁটা পুঁতিয়া সে দড়ীগুলি তাহাতে টানিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। দড়ীগুলিকে বেশী বা কম টানিলে ইচ্ছা মত তাম্বু বেশী বা কম চওড়া করা যায়, তবে বেশী টানিলে তাম্বুর নীচে ফাঁক পড়িয়া যায়। আমরা তাম্বুর একটি মুখ রাত্রের জন্য একেবারে দড়ী দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সেখানে আমাদের জিনিস পত্র রাখিতাম। তাম্বু টাঙ্গান হইলে চারিজনে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া এক তাম্বুতে বসিয়া গল্প ও পর দিনের "পড়াও" ইত্যাদির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতাম। প্রায় ৭।৭৷৷০ কিম্বা বেশী দেরী হইলে ৮টার মধ্যে আমাদের খাবার প্রস্তুত ও আহার সম্পন্ন হইত। তাহার পরই তাম্বুর খোলা মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করা যাইত। তাম্বুর চতুর্দ্দিক বন্ধ করিলে ভিতরে তত ঠাণ্ডা বোধ হইত না। কিন্তু এক পার্শ্ব একটু খুলিলেই বাহিরে কিরূপ কন্‌কনে ঠাণ্ডা

তাহা অনুভব হইত। পাহাড়ী লোকেরা কিন্তু খোলা যায়গায় রাত্রি যাপন করিতে পারে। আমাদের বয় ও তাহার সহকারী কুলী পূর্ব্বোক্ত সেই রান্না ঘরেই রাত্রি যাপন করিল। সে ঘরটির একদিক সম্পূর্ণ খোলা ছিল। আজ রাত্রে আমাদের বেশী শীত অনুভব হইয়াছিল।

উজ্‌রী হইতে খরশালী।

প্রায় ১০ মাইল।

৯ই অক্টোবর ১৯১৪।

সকালে উঠিয়া দেখি সম্মুখে, একটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্ব্বত শিখরে, একটি কাষ্ঠের মন্দিরের মত রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সেটি গ্রাম্য দেবতার মন্দির, কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে আমরা যে পর্ব্বতে আছি তাহা হইতে নামিয়া অপর একটি পর্ব্বতে উঠিতে হইবে। আমাদের সে সময় ছিলনা। আমরা শীঘ্রই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলীরা আসিয়া বলিল যে উজ্‌রী গ্রামের লোকেরা বড় অতিথিপ্রিয় নয়। রাত্রে তাহাদের থাকিবার স্থান ও আহার্য্য দিতে তাহারা অনেক গোলোযোগ করিয়াছিল। গঙ্গানী ছাড়িয়া পর্য্যন্ত, রাস্তা ক্রমশই উচ্চে উঠিতে ছিল, তবে পাহাড়ী রাস্তার যেরূপ দস্তুর মধ্যে মধ্যে উৎরাই পাওয়া গিয়াছিল। এখান হইতে প্রায় ১॥০ মাইল সোজা রাস্তার পর রাস্তাটি নামিয়া একটি পুল দিয়া যমুনা পার হইয়া অপর পারে আবার পর্ব্বত গাত্র দিয়া উপরে উঠিয়াছে। অনেক দূর উঠিয়া ও উজ্‌রী হইতে প্রায়

তিন মাইল আসিয়া আমরা একটি বড় গ্রামের মধ্য দিয়া চলিলাম। এই গ্রামটির নাম রাংনা বোধহয় ইহাকে রাণীগাঁ ও বলে। এখানে লাল ফুল বিশিষ্ট একরূপ শস্য অনেক হইয়াছে। যে স্থানে সে শস্য হইয়াছে দূর হইতে বোধ হয় যেন পাহাড়ের গায়ে গাঢ় লাল রং মাখাইয়া দিয়াছে। এই গ্রাম পার হইয়া দুই মাইল চলিবার পর একটি বড় কাষ্ঠের পুল পাইলাম। এই পুলটি একটি পার্ব্বতীয় নদীর উপর। সে নদী যমুনায় গিয়া মিলিয়াছে। পুলে আসিতে একটি ভগ্ন ঘর দেখিতে পাইলাম। একজন কুলী যে এপথে পূর্ব্বে আসিয়াছিল সে বলিল এস্থানের নাম হনুমান চটি ও ভগ্ন ঘরটি পূর্ব্বে ধর্ম্মশালা ছিল। পুল পার হইয়া ঝরণার পার্শ্বে আমরা মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রামের জন্য বসিলাম। ফণী, শৈলেন ও আমি ঝরণায় স্নান করিলাম। ঝরণার জল তুষার শীতল। তবে রৌদ্র থাকাতে মস্তকে কিছু জল ঢালিয়া শীঘ্র পুঁছিয়া ফেলিলে বেশী শীত বোধ হইত না, বরং স্নানের পর শীত কমিয়া যাইত ও শরীরে বেশ স্ফুর্ত্তি বোধ হইত। এখানে এক পাহাড়ীর নিকট হইতে ২ সের আলু খরিদ করা হইল। আলু গুলি সে একটি লোম যুক্ত ছাগ চর্ম্মের থলিতে লইয়া যাইতেছিল। বোধ হইল নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য

লইয়া যাইতেছিল কিন্তু আমাদের অনুরোধে ও কিঞ্চিৎ বেশী দাম পাইয়া দিয়া গেল। তার পর আর এক পাহাড়ী এক পাঁঠা লইয়া যাইতে ছিল, তাহার নিকট ৬৲ টাকায় সে পাঁঠাটি কেনা হইল। এ পাঁঠাটি কিনিয়া কিন্তু আমাদের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। যদিও উচিৎ মূল্য অপেক্ষা আমরা দাম কিছু বেশী দিয়া ছিলাম কিন্তু ইহার মাংস সুস্বাদু হয় নাই। অধিকন্তু তাহাতে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ হওয়ায় শেষে তাহা আমাদের ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল। এক দল পাহাড়ী স্ত্রী ও পুরুষ এ পথে যাইতে আমাদের দেখিয়া পুলের উপর দাঁড়াইয়া গেল। তাহারা বোধ হয় আমাদের মত অদ্ভুৎ জীব এই প্রথম দেখিল। তাহাদিগকে পুলের উপর সেই ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া আমি আমার কোডাক্ লইয়া পুল সমেৎ তাহাদের একটি ছবি তুলিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। আমার ক্যামেরাটি দেখিয়াই কিন্তু তাহারা পালাইবার উদ্‌যোগ করিল। তারপর কুলীরা যখন তাহাদের বুঝাইয়া দিল যে এই যন্ত্র দ্বারা তাহাদের ছবি উঠিবে, তখন আর তাহারা কোন আপত্তি করিল না, বরং মেয়ে পুরুষ সকলেই অগ্রসর হইয়া ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়াইল। সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যামেরার সম্মুখীন হইবার সময় ঈশ্বরদত্ত মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষিত হয়। ইহাদের

মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেল। তাহাদের সচরাচর যেমন দেখায় সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া গেল। এই ছবিটিও তুলিবার দোষে ভাল উঠে নাই। এই হুনুমান চটির নিকট হইতে একটি রাস্তা উত্তর কাশী গিয়াছে। কিন্তু সে রাস্তা ভাল নয় বলিয়া আমরা সে রাস্তায় যাই নাই, ইহার দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল হইবে। এই সব সংবাদ আমরা আমাদের এক কুলীর নিকট পাইয়া ছিলাম। আমরা এখান হইতে যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম তখন আকাশে মেঘের ঘন ঘটা হইয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা সেই বৃষ্টিতেই চলিলাম। ঝরণা হইতে কিছু চড়াইয়ের পর পথ এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘন মেঘ হওয়াতে বনের মধ্যে বড় অন্ধকার হইয়াছিল, পথ শুষ্ক বৃক্ষ পত্রে আচ্ছাদিত তাহাতে বৃষ্টির জল পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল। আমি সর্ব্বাগ্রে একেলাই চলিয়াছি, ইচ্ছা যত শীঘ্র পারি খরশালী পৌঁছিব। কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না বরং বেশী হইতে লাগিল। রাস্তাও সেই বনের ভিতর দিয়া। আমরা এপথে কোন হিংস্র বন্য জন্তু দেখি নাই। সেই জন্য একাকী নির্জ্জন পথে চলিতে কখন ভয় হয় নাই। বৃষ্টি ও অন্ধকার না হইলে এ পথটি বড় মনোরম হইত। ইহাতে বিশেষ চড়াই উৎরাইও ছিল না। আর পথে

বেশী প্রস্তর খণ্ড না থাকাতে চলিতে কিছুই কষ্ট হয় নাই। এই বনটি প্রায় ২॥০ মাইল হইবে। বনটি পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে যমুনার অপর পারে একটি বড় গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সে গ্রামে অনেক গুলি কাঠের বাড়ী ছিল। কিছু দূরে নীচে যমুনার উপর একটি পুল দেখিতে পাইলাম। আমি ঐ গ্রামটিকেই খরশালী বলিয়া স্থির করিলাম, কিন্তু নদীর অপর পারে হওয়াতে মনে কিছু সন্দেহ হইল। আর অগ্রসর না হইয়া অপর সকলের জন্য সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, শৈলেন শীঘ্রই দেখা দিল ও তাহার অল্প পরেই দুইজন পাহাড়ী লোকের সহিত দেখা হইল। তাহারা বলিল আরও এক ক্রোশ চলিলে তবে খরশালী পাওয়া যাইবে। অতএব আর অপেক্ষা না করিয়া আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইবার পর আমরা দুইটি পাহাড়ী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা দুই জনেই গৌরাঙ্গী ও মুখ চোখও দেখিতে ভাল, তবে কতকটা মঙ্গোলিয়ান অর্থাৎ নেপালি বা ভুটিয়াদের মত। সাধারণতঃ এ প্রদেশের পাহাড়ীদের মুখাকৃতি নেপালি বা ভুটিয়াদের মত নয়, সাধারণ ভারতবাসীর মতই। এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটি যুবতী ও অপরা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধা। তাহাদের পরিধানে কম্বলের

লম্বা জামা, গলার নীচে অল্প খোলা। তাহা ইউরোপীয় রমণীদের ফ্যাসানের অনুকরণে কাটা নহে, বোতাম না থাকাতে মস্তক গলাইয়া পরিবার জন্য ছিদ্র কিছু বড় করা হইয়াছে। আমি খরশালী কত দূর জিজ্ঞাসা করাতে নবীনা বলিল ২ মাইল কিন্তু বয়োঃজেষ্ঠা তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল টুপিওলাদের সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। টুপি থাকাতে পাহাড়ীরা আমাদের বিদেশীয়ই মনে করিত। যদিও আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গাত্রবর্ণের দুগ্ধ অপেক্ষা মসীর সহিত নিকট সম্পর্ক তথাপি টুপি থাকাতে তাহারা আমাদিগকে সাহেবের মধ্যে গণ্য করিত। ভারত-বর্ষে সাহেব হইতে পারিলে সাত খুন মাপ, "সর্ব্ব দোষ হরে টুপি"। এই সকল পাহাড়ীরাও সে কথা জানে, অতএব টুপিওয়ালা দেখিলেই তাহারা ভীত হয়। আমরাই টুপির সাহায্যে অনেক স্থলে অনেক সুবিধা পাইয়াছি যাহা টুপি না থাকিলে কখনও পাইতাম না। একবার কিন্তু টুপির জন্য বড় অসুবিধা হইয়াছিল, সেই জন্য সে কথা বেশ মনে আছে। ১৯০৭ কিম্বা ১৯০৮ সালে দার্জ্জিলিং হইতে রঙ্গিৎ নামক এক নদী দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই নদীর অপর পারে ভুটান

রাজ্য, একটি পুল পার হইয়া অপর পারে যাওয়া যায়। অপর পারে ভুটান রাজ্যের একটি শান্ত্রী থাকে। সে দেশী বা ভারতবর্ষীয় লোককে ভুটান রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, কিন্তু টুপি পরা দেখিলে দার্জ্জিলিংয়ের ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশ ভিন্ন ছাড়ে না। আমরা তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে আমরা দেশী লোক, কিন্তু সে একটু হাসিয়া আমাদিগকে একটি ছাপান নোটিশ দেখাইল। তাহাতে লেখা আছে যে ইউরোপীয়েরা উপরোক্ত পাশ ব্যতীত ভুটান রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। টুপি লইয়া সেই একবারই বিপদ হইয়াছিল। এখন আমাদের বৃষ্টিতে চলিতে কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। এক এক স্থানে পথে কর্দ্দম হওয়াতে পদস্খলন হইতে লাগিল, কিন্তু পাহাড়ী বুট ভেদ করিয়া জল পায়ের মধ্যে বড় প্রবেশ করে নাই। এই বুট অনেক জল ও বৃষ্টিতে ভিজিয়াও কিছুই নষ্ট হয় নাই। ৩০০ মাইলের উপর চলাতে ইহার তলদেশ কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ও যমুনোত্তরীর ধর্ম্মশালায় আগুনে শুখাইয়া লইবার সময় ইহার কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়া চামড়া কিছু শক্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম আছে ও ইহা ব্যবহারে পুনরায় ৩০০ মাইল চলা যায়। এত অধিক মজবুদ্ হওয়াতে এ জুতার চামড়া কিছু শক্ত। ঐ চামড়া নরম রাখিবার

জন্য এক প্রকার তৈল ব্যবহার করিতে হয়। আজি কালিকার নব্য পাম্প ও লপেটাধারী বাবুরা ইহা কত দূর পসন্দ ও সহ্য করিতে পারিবেন জানি না, কিন্তু পার্ব্বতীয় পথে চলিতে গেলে এইরূপ এক জোড়া জুতা প্রধান সহায়। খালি পায়ে এ পথে আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। আরও দুই মাইল পথ পার হইয়া আমরা একটি ছোট পুলের উপর দিয়া একটি ঝরণা পার হইয়া খরশালী গ্রামের নিচে আসিলাম। এই স্থানে রাস্তা শেষ হইয়া একটি পাক্‌ডাণ্ডি আরম্ভ হইয়াছে। সেই পাক্‌ডাণ্ডিতে বড় বড় পাথরের অনেক লুড়ী পড়িয়াছিল। বোধ হয় পূর্ব্বে সেই স্থান দিয়া একটি ঝরণা প্রবাহিত ছিল। পাক্‌ডাণ্ডিটি প্রায় সোজা উঠিয়াছে। আমাদের উপরে উঠিতে অতি সাবধানে উঠিতে হইল। কেননা লুড়ি অনেক স্থলে পা দিলে সরিয়া যাইতেছিল। উপরে উঠিয়া এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র জুড়িয়া এক বড় গ্রাম রহিয়াছে দেখিলাম। বহু দিন মানবের বসতি হইলে স্থানটি যেরূপ পুরাতন দেখায়, এ স্থানটি সেইরূপ দেখাইল। অনেক গুলি কাঠের বাড়ী রহিয়াছে। বাড়ী গুলি প্রায়ই দ্বিতল, কিন্তু চতুর্দ্দিকেই বন্ধ, কেবল মাত্র সম্মুখ দিকে একটি করিয়া ছোট দরওজা, নীচু হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। শুনিলাম শীতের জন্য এ সকল বাড়ী ঐরূপ

ভাবে প্রস্তুত। অনেক বাড়ীর পার্শ্বে বড় বড় ঘাসের মত এক প্রকার উদ্ভিদ্ বোঝা করিয়া টাঙ্গান রহিয়াছে। এখানে বৎসরে ৩।৪ মাস এত শীত হয় ও জমীর উপর এত বরফ পড়িয়া থাকে যে গো মেষ ইত্যাদি চলিতে পারে না। তাহাদিগকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সেই সময় তাহাদের খাইবার জন্য এই ঘাস সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। উপরে উঠিয়াই একটি রাস্তা পাইলাম তাহা দিয়া ১০০।১৫০ গজ আসিতেই একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রাঙ্গনের প্রবেশ দ্বারে একটি ঘণ্টা টাঙ্গান আছে, সেই ঘণ্টা হইতে একটি দড়ি নিকটস্থ একটি বড় কাঠের বাড়ীর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পরে শুনিলাম সেটি একটি মন্দির। আমি আসিয়া সেই ঘণ্টা বাজাইয়া দিলাম। ইহার শব্দে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ একটি প্যাগোডা বা মন্দিরের মত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বোক্ত চাপরাসি ছিল। সে আসিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বেই আমাদের আগমন বার্ত্তা দিয়া ছিল, সেই জন্য তাহারা সকলে এক স্থানে জমায়েৎ হইয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমরা শীঘ্রই সেই প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্যাগোডায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার মধ্য স্থলে একটি আগুণ জ্বলিতেছে দেখিয়া আমরা একেবারে

সেই আগুণের ধারে গিয়া বসিলাম। যে হস্তে লাঠি ধরিয়া চলিয়াছিলাম শীতে তাহা প্রায় অবস হইয়াছিল। উপরের কোট, বুট ও মোজা খুলিয়া আগুণের পার্শ্বে বসিতে ক্লান্তি অনেক কম বোধ হইল। গ্রামবাসিরা আমাদের ঘেরিয়া বসিল, তাহার মধ্যে কয়েক জন যমুনোত্তরীর পাণ্ডা ছিল। আমরা তাহাদিগকে যমুনোত্তরীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুস্তক পড়িয়া সে স্থান যেরূপ দুর্গম ও দুরারুহ বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। এস্থল হইতে ৪ মাইল যাইলেই যমুনোত্তরীর মন্দির ও ধর্ম্মশালা পাওয়া যায়। এই চার মাইলের মধ্যে ৩ মাইল পথ দুরুহ ও অনেক চড়াই করিতে হয়। এই তিন মাইলের মধ্যে এক মাইল ক্রমাগত চড়াই, কিন্তু পথ বরাবর আছে। তাহারা বলিল যে আমরা তথায় অনায়াসে যাইতে পারিব। এই সব শুনিয়া আমরা আশ্বস্থ হইলাম ও এত দূর কষ্ট করিয়া আসা সার্থক বোধ হইল। ইহাদের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। হিন্দি ইহারা বেশ বুঝিতে পারে। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে সত্যেন ও ফণী তাহাদের ডাণ্ডি করিয়া উপস্থিত হইল। ওয়াটার প্রুফ্ থাকা সত্ত্বেও তাহারা কিছু কিছু ভিজিয়া ছিল, ও ঠাণ্ডায় একেবারে জমিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। ডাণ্ডিতে চুপচাপ বসিয়া

থাকার জন্য আমাদের অপেক্ষা তাহারা ঠাণ্ডা অনেক বেশী অনুভব করিয়াছিল। তাহারা আসিয়া আগুণ পাইয়া আনন্দিত হইল। পাহাড়ে আগুণ না হইলে চলে না। দুই চারি জন চুপ করিয়া কোন স্থানে বসিলেই আগুণ জ্বালিতে হয়। পাহাড়ীরা আগুণের যোগাড়ও অতি শীঘ্র করিতে পারে। পাহাড়ের গা হইতে দুই মিনিটের মধ্যেই গাছের শুষ্ক ডাল পালা যোগাড় করিয়া আগুণ প্রস্তুত করিতে পারে। বৃষ্টি এখনও থামে নাই কাজেই আজ আমরা তাম্বু না টাঙ্গানই স্থির করিলাম। আমরা যে প্যাগোডার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারই মধ্যে আগুণ যে স্থলে ছিল তাহার চতুর্দ্দিকে আমাদের চার খানি ক্যাম্প খাট বিছাইবার স্থান ছিল। প্যাগোডার মধ্যে যে স্থলে আগুণ ছিল সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নীচু ও চতুর্দ্দিকের স্থান উচ্চ। আমাদের জিনিস পত্র আসিলে আমরা সেই উচ্চ স্থান গুলিতে আমাদের খাট বিছাইলাম। আগুণটি মধ্যে জ্বলিতে থাকায় বাহিরের ভীষণ ঠাণ্ডা কিছু কম অনুভূত হইল। প্যাগোডার তিন দিকে দেওয়াল ছিল, কেবল সম্মুখ দিকটি একেবারে খোলা। ইহা আমাদের দেশের আট চালার মত তবে খুটি ছাদ ও দেওয়াল সমস্তই কাঠের। যে দিক খোলা ছিল সে দিকে পর্দ্দার দ্বারা বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। আমরা

কাহাকে পাণ্ডা করিব, সেই নিয়া কিছু গোলযোগ হইল। তিন চারি জন পাণ্ডা তাহাদের খাতা বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। এখানেও সেই চির পরিচিত তীর্থ স্থানের খাতা দেখিয়া লোকগুলির উপর একটু বিরক্তি হইল। তীর্থ স্থানে খাতাধারী দেখিলেই আমার কিরূপ আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যায়। তাহার কারণ এই যে তাহারা অযাচিত ভাবে সময় অসময়ে আসিয়া বড় বিরক্ত করে। বিশেষতঃ তাহারা আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে না দিয়া আমাদের উপর একটা দাবি করিয়া বসে। যদি আমার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ কখন কোন পাণ্ডাকে বা তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে পাণ্ডারূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমার পাণ্ডা করিতেই হইবে। আমার পূর্ব্ব পুরুষের এরূপভাবে আমাকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা আমি স্বীকার করিতে রাজী নহি। আমাকেও দুই তিন জায়গায়, যে খানে আমার বংশের কেহ কখনও যায় নাই, পাণ্ডার খাতায় লিখিতে হইয়াছে। আমি কিন্তু তথায় স্পষ্ট লিখিয়াছি যে, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বা বংশোদ্ভব কেহ, সেই পাণ্ডাকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিতে বাধ্য নয়। আমরা এই পাণ্ডাদিগকে বলিলাম যে আমাদের বংশের বা আমাদের আত্মীয় কোন লোক, আমরা যত দূর জানি, এ পথে আসে নাই অতএব খাতা বাহির করিয়া

কোন লাভ নাই। তাহারা কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইল না। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাহাদের মধ্যে দুই একজন তাহাদের খাতা হইতে দুই একজন মারওয়াড়ীর নাম বাহির করিল। আমরা যখন বলিলাম যে মারওয়াড়ীদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, সে কথা যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহারা গ্রাহ্য করিল না। তাহাদের মধ্যে একজন পাণ্ডাই অধিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সে বলিল অনেক সাহেবকে সে শীকারের স্থান দেখাইয়া দিয়াছে। তাহার খাতা হইতে দুই একজন সাহেবের নাম ও দেখাইল। পাণ্ডার খাতা সাহেবের সার্টিফিকেট্ বহিতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া হাসিও পাইল দুঃখও হইল। দেখা গেল ইহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকের মত পয়সার কাঙ্গাল, যে পয়সা দিবে তাহারই গোলাম হইবে। আমার এই চালাক পাণ্ডাটিকে তত পসন্দ হইল না। আমরা এই পাণ্ডার গোলমাল এক সহজ উপায়ে মিটাইয়া ফেলিলাম। কথায় কথায় আমরা শুনিলাম, এক এক জন পাণ্ডা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পালা হিসাবে যমুনোত্তরীর মন্দিরে পূজারী স্বরূপে পূজা করে, সে সময়ে মন্দিরের ঠাকুর দেখাইবার অধিকার তাহারই। আমরা তখনকার যে পূজারী তাহাকেই পাণ্ডা নিযুক্ত করিলাম। এ লোকটি

কিছু নিরীহ। চালাক লোকটিকে ছাড়িয়া তাহাকে পাণ্ডা করাতে সে মহা আপ্যায়িত হইল। সে ২।৩টি কম্বল আনিয়া দিল। তাহাতে আমরা প্যাগোডার খোলা দিকটি ঢাকিয়া দিলাম। পরে সে তাহার বাড়ী হইতে দুধ ও কিছু আঠার ও মড়ুয়ার রুটী ও শাক ও এক রকম খইয়ের মত হালকা, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ছোট ছোট গোল গোল দানা বিশিষ্ট, জিনিস আনিয়া দিল। তাহার রুটি ও তরকারি গরম গরম আমাদের খাইতে ভাল লাগিল। রাত্রিতে বৃষ্টি থামিল ও আকাশে নক্ষত্র দেখা দিল। আজ সকলেরই মনে একটি উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়া যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর মধ্যে যদি একটি স্থানও দেখা হয় তাহা হইলেও কষ্টের অনেকটা সার্থকতা হইবে। কল্যাই যমুনোত্তরী দর্শন। রাত্রির ব্যবধান যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ফণী সকল বিষয়েই প্রাক্‌টিকাল। যখন সে শুনিল সে পথে ডাণ্ডি যাইবে না, তখন সে ঠিক করিল তাহার ডাণ্ডির কুলীদের মধ্যে ৪ জনকে পথে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য লইয়া যাইবে। আর কিছু দড়ী লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল। আবশ্যক হইলে এই দড়ী তাহার কোমরে বাঁধিয়া কুলীরা চড়াইয়ের সময় তাহাকে টানিয়া তুলিবে। সত্যেন যদিও কিছু

প্রকাশ করিয়া বলিল না কিন্তু মনে মনে ঐরূপ একটা মতলব স্থির করিয়া রাখিল। রাস্তার কাঠিন্য স্মরণ করিয়া আমরাও মনে মনে দুরারোহ বরফ আচ্ছাদিত এক দুর্গম পথের কল্পনা করিতে লাগিলাম। যাহা হউক চারি জনেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া ছিলাম যে, যে কোন প্রকারে হউক যমুনোত্তরী দর্শন করিতেই হইবে। এত নিকটে আসিয়া কোন ক্রমেই ব্যর্থ মনোরথ হইব না।

যমুনোত্তরী

খরশালী হইতে যমুনোত্তরী।

৪ মাইল।

১০ই অক্টোবর ১৯২৮।

আজ সকালে উঠিয়া দেখি আকাশ পরিষ্কার হইয়া রৌদ্র উঠিয়াছে। শীঘ্রই আমরা যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সঙ্গে ১৮ জন কুলী লইয়া বাকী কুলী এই খানেই রাখিয়া যাওয়া স্থির হইল। বৃদ্ধ কুলীরা যমুনোত্তরী যাইবার জন্য তত আগ্রহ দেখাইল না। কিন্তু অল্প বয়স্ক কুলীরা যাইতে চাহিল। আমাদের মোটের জন্য ১০ জন কুলী ও সত্যেন ও ফণীর জন্য ৮ জন কুলী চলিল। কিছু দড়ী ও সঙ্গে লওয়া হইল। আমরা চা পান করিয়া বেলা ৮টার সময় রওনা হইলাম। সঙ্গে কুলী ছাড়া আমাদের শিকারী ও পাণ্ডা। পূর্ব্বোক্ত প্রাঙ্গনটির মধ্য দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্রামের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলে বাহির হইয়া দেখিতে লাগিল। আমরা প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাড়ীগুলির আশ পাশ দিয়া শীঘ্রই গ্রাম পার হইয়া শস্য ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। গ্রাম পার হইয়া একটি ছোট বাড়ী দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল, এটি এখানকার ধর্ম্মশালা। সেটি

বেশ ফাঁকা জায়গায়। তার পরেই সেই লাল রঙের শস্য। শস্য পাকিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা শস্য ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। সেখানে পুরুষ বড় দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম এখানে স্ত্রীলোকেরাই প্রায় সকল কাজই করে ও পুরুষদের খাওয়ায়। মনে হইল আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু আবার ভাবিলাম, আমাদের শিক্ষিতা রমণীরা, ইউরোপীয় আদর্শে, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন, যদি তাঁহারা স্বামীদের প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দাসত্ব দাবী করিবেন। অতএব লাঙ্গলের বলদ লাঙ্গল টানিয়া খাওয়াই ভাল মনে করিলাম। ক্ষেত পার হইয়া আবার নদীর ধারে রাস্তা পাইলাম। এ রাস্তা সচরাচর পার্ব্বতীয় রাস্তার ন্যায়, বিশেষ কিছু কঠিন নয়। যমুনোত্তরীর কঠিন রাস্তা যাহার জন্য আমরা অনেক দিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি তাহা না পাইয়া যেন একটু ক্ষুন্ন হইলাম। কিন্তু আমাদিগকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। শীঘ্রই নদীর উপর একটি পুল দেখিতে পাইলাম। এইস্থান হইতেই কঠিন রাস্তা সুরু হইল। এস্থলে নদীটি প্রায় ২৫।৩০ হাত চওড়া। নদীর এক পার হইতে অপর পারের প্রস্তরের উপর দুই দেবদারের কাণ্ড ফেলা হইয়াছে। দুইটির মধ্যে ব্যবধান প্রায় ২ ফিট্। সেই

কাষ্ঠ দুইটির উপর কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড চাপান আছে। এইরূপ ভাবে সেই পুল প্রস্তুত। সব প্রস্তর খণ্ডগুলি কাষ্ঠের উপর ঠিক ভাবে না বসাতে পা দিলেই ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়িয়া উঠে, তাহাতে শরীর অসামাল হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর পুলের মধ্য দেশে উপস্থিত হইলে সমস্ত পুলটি দুলিতে থাকে। আর নীচে দিয়া জলস্রোত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হওয়াতে মাথা ঘুরিয়া যায়। যাহারা এরূপ পুলের উপর না উঠিয়াছেন বা যাহারা ইহা না দেখিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া ইহা বুঝান বড় শক্ত। এক কথায় পার্ব্বত্য পথে যাহাদের চলা অভ্যাস, বা যাহারা রাজ মিস্ত্রির তেতলা ভারায় কিছু না ধরিয়া আনায়াসে বেড়াইয়া বেড়াইতে পারেন, তাহাদের পক্ষেই এইরূপ পুল বিনা সাহায্যে পার হওয়া সম্ভব। ফণী ও সত্যেন এক উপায় বাহির করিল। একজন কুলীকে সম্মুখে যাইতে বলিয়া তাহার দুই কাঁধ দুই হস্ত দিয়া দৃঢ়রূপে ধরিয়া সেই কুলীর সহিত ও তাহার সাহায্যে পার হইল। আমি ও শৈলেন বিনা সাহায্যেই পার হইতে পারিয়াছিলাম। এইরূপ সরু জায়গায় চলা আমার একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আর বিশেষ ভয় হইত না। পুল পার হইয়া একটি শুষ্ক ঝরণা পথে চড়াই আরম্ভ হইল। যে স্থলে পূর্ব্বে ঝরণা ছিল আমরা সেই পথে উঠিতে লাগিলাম,

কোথাও সিঁড়ির মত ধাপ পাইলাম, কোথাও বা হস্ত ও পদ দুইয়ের সাহায্যে উঠিতে হইল। এই সকল স্থলে প্রস্তর খণ্ড গুলির উপর পা রাখিবার সময় অতি সাবধানে রাখিতে হয়। একেবারে সব ভর রাখিলে পর্ব্বত খণ্ড সরিয়া আঘাত লাগিতে পারে। ঝরণার পথ পার হইয়া এক পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া অপর পর্ব্বত, তারপর আর একটি, এইরূপ ভাবে প্রায় অর্দ্ধ মাইল চড়াই। ইহার স্থানে স্থানে রাস্তা আছে। কোথায় বা পর্ব্বত পৃষ্ঠে লোক চলিয়া কেবল একটি মাত্র দাগ আছে, কোথায় বা রাস্তা ১॥।২ ফিটের অধিক প্রসস্ত নয় ও তাহার এক পার্শ্বে পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে খাদ, নিম্ন দিকে চাহিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে। এই সকল স্থানে খাদের দিকে না চাহিয়া পর্ব্বত গাত্র ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিবার সময় দৃষ্টি কিন্তু সর্ব্বদা পথের উপর রাখিতে হইত। প্রত্যেক পদটি ফেলিবার আগে দেখিয়া ফেলিতে হইত, তাহা না হইলেই প্রস্তর খণ্ডে পা লাগিয়া কিম্বা নিম্ন স্থানে পা পড়িয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং তথায় পড়িলে খাদে পড়াও বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। উপরি উক্ত অপ্রশস্ত রাস্তায় চলিবার সময় এক স্থলে পার্শ্বের পর্ব্বত ঝুঁকিয়া রাস্তার উপর আসিয়াছে তথায় মাথা নীচু করিয়া হেট হইয়া চলিতে হয়। সোজা হইলে মাথায় পাহাড় লাগে ও পার্শ্ব

দেশে অধিক সরিলেই খাদে পড়িবার ভয়। সৌভাগ্যবশতঃ পর্ব্বত শীঘ্রই সরিয়া গিয়া পথের পার্শ্বে সোজাভাবে দাঁড়াইল। এক স্থলে রাস্তাটি বেশ বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এক স্থানে এক বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষ রাস্তার উপর পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইল। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া উৎরাইয়ের মুখে এক স্থলে পর্ব্বত গাত্র ধসিয়া গিয়াছে ও তাহার সহিত সামান্য রাস্তা যাহা ছিল তাহাও ধসিয়া গিয়াছে। এ স্থলে পর্ব্বত গাত্রের সেই ধসা মাটির উপর দিয়া চলিতে হইল। অগ্রে পাণ্ডা ও শিকারী গিয়া পদ দ্বারা সেই মাটির উপর চিহ্ন করিয়া দিল। আমরা তাহার পর ধীরে ধীরে সেই চিহ্নের উপর পা দিয়া ও এক হস্তে লাঠির উপর ও অপর হস্তে পর্ব্বতের গাত্রের উপর ভর রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তাহাতেও স্থানে স্থানে যেথায় পা রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহা হইতে ১।১৷৷০ ফুট নীচে গিয়া পা রাখিতে পারিলাম। এইরূপে সেই ভগ্ন অংশ অতিক্রম করিয়া আরও কিছু উৎরাইয়ের পর আমরা এক নদী গর্ভে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক ছোট কাষ্ঠের পুল পার হইয়া আবার চড়াই আরম্ভ হইল। এবার সেই এক মাইল ব্যাপি দীর্ঘ চড়াই। এখন আমি ও শিকারী সর্ব্বাগ্রে একত্রে চলিয়াছি, দলের অপর

সকলে পশ্চাতে আসিতেছে। এই চড়াইয়ের মুখে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সঙ্গে ওয়াটার প্রুফ কোটটি লইয়াছিলাম, আমার সচরাচর চলিবার পোষাকের উপর তাহা পরিয়া লইলাম। ইহাতে চড়াইয়ের পক্ষে কিছু অসুবিধা হইল, কিন্তু বৃষ্টি হইতে গাত্র বস্ত্র রক্ষা পাইল। শিকারী আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, তাহার সহিত আমাদের একটি বন্দুক ছিল। বন্দুক ভিজিবে এইরূপ ওজর করিয়া, কিন্তু বস্তুতঃ নিজেকে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য, সে পথি পার্শ্বস্থ এক পর্ব্বত গুহায় বসিয়া গেল। আমার কিন্তু আর দেরী সহিতে ছিলনা, কতক্ষণে যমুনোত্তরী যাইব আমি কেবল সেই জন্য উৎসুক। তাহাকে দলের অপর সকলের সহিত আসিতে বলিয়া একাই অগ্রসর হইলাম, ইচ্ছা দলস্থ সকলের অগ্রে যমুনোত্তরী দেখিব। রাস্তা এস্থলে কেবল একটি মাত্র অতএব ভুল হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। এস্থলে পর্ব্বত গাত্র ঘন বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া স্থানটিকে একটি নিবিড় বনে পরিণত করিয়াছে। আমি দ্রুতই উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা অক্র বক্র ভাবে ক্রমাগত পর্ব্বত গাত্রে উঠিয়াছে। কোনবার রাস্তার দুইটি কোনবার তিনটি বেঁক উঠিয়া দমের জন্য অল্প দাঁড়াইয়া আবার উঠিতেছি। ঘন বৃক্ষের জন্য পর্ব্বতের তলদেশ বা চূড়া কিছুই দেখা যাইতেছে না। আমিও যেন

তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নহি। আমি কেবল পর্ব্বতে উঠিতেছি আর গুনিতেছি এক, দুই, তিন বাঁক, তারপর দম লইতেছি, আবার চলিতেছি। পরে দুই বাঁক ও শেষে এক বাঁকের পরই দম লইতে হইতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ নিকটে বৃহদপক্ষীর উড়ার শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি কাল ও লাল রংঙের লম্বা ল্যাজ বিশিষ্ট একটি বড় পাখি উড়িয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল ইহা এক প্রকার বন্য মোরগ। তথায় অল্প দাঁড়াইলাম। পাখী উড়িয়া গেলে বন আবার নিস্তব্দ হইল। সঙ্গীদেরও কোন সাড়া পাইতেছি না, বোধহইল তাহারা অনেক দূরে। বৃষ্টি এখনও পড়িতেছে। চামড়ার দস্তানার ভিতর হইতে হাত বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এক হস্তে লাঠি ধরিয়া অপর হস্ত ওয়াটারপ্রুফের পকেটে রাখিতেছি কিন্তু তাহাতে বিশেষ গরম হইতেছে না। আরও কিছু দূর উঠিয়া একটু খোলা স্থানে আসিয়া উপরে চাহিয়া দেখি পর্বত শৃঙ্গ আর অধিক দূর নহে। এস্থল হইতে তথাকার গাছগুলি বেশ দেখা যাইতে লাগিল, অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চলিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঁকের পর বাঁক পার হইতে লাগিলাম তবু শিখর দেশ পাইলাম না। তবে এখানে পর্বত গাত্রে বৃক্ষ আর তত ঘন নয়, দেবদারু বৃক্ষই অধিক, ফাঁক ফাঁক দাঁড়াইয়া আছে।

এখন বৃষ্টির বদলে ছোট ছোট সাদা সাদা বরফের গুলি পড়িতে লাগিল। ইহাকে পাহাড়ীরা বজ্‌রী বলে। এখানে ঠাণ্ডা বেশী বোধ হইতে লাগিল। ঠাণ্ডাতে আর কোন কষ্ট হয় নাই, কেবল হাতের যে অংশ জামার বাহিরে ছিল, তাহা অসাড় হইয়া আসিতেছিল ও লাঠি ধরিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল। আবার এদিকে বিষম চড়াইয়ের জন্য জল পিপাসাও পাইতেছিল। একস্থলে বসিয়া বোতল হইতে কিঞ্চিৎ জল পান করিলাম ও বিশ্রাম করিলাম। বসিয়া বসিয়া চারিদিকে দেখিতেছি, হঠাৎ দেখিলাম আমার নিকটেই একটি গাছের ডালে পাটকিলে রংঙের একটি বৃহৎ পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। বন্দুকটি সঙ্গে থাকিলে পক্ষীটিকে মারা যাইত। এটি আমাদের দেশের তিতির জাতীয় পক্ষী, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, ইহাকে ইংরাজীতে Himalayan Partridge বলে। ইহার মাংস অতীব সুস্বাদু। আমি বসিয়া তিতির দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের বয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের চূড়া পার হইয়া যমুনোত্তরীর উৎরাই আরম্ভ হইল। ইহার অতি নিকটেই একটি অতি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে মন্দিরটি দেখিয়া হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইয়াছিল

এই বুঝি যমুনোত্তরী। নিকটে আসিয়া দেখি মন্দিরের নিকটস্থ দুই তিনটি বৃক্ষে অসংখ্য বস্ত্রখণ্ড বাঁধা রহিয়াছে। শুনিলাম যত যাত্রী যমুনোত্তরী দেখিতে যায়, দেখিয়া ফিরিবার সময় এই সকল বৃক্ষে এক খণ্ড কাপড় বাঁধিয়া যায়। কাপড় বাঁধার উদ্দেশ্যটি কি তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই। এই মন্দিরটি ভৈরবের। শুনিয়াছি সকল প্রধান তীর্থ স্থানেই একটি করিয়া ভৈরবের মন্দির আছে। এই ভৈরব দেবতাদের দ্বারপাল স্বরূপ। তাহার অনুমতি বিনা ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া না গেলে আসল দেবতা স্থানে পৌঁছান যায় না। আমরা যদিও তাহার মন্দির অতিক্রম করিলাম, কিন্তু যতদূর মনে আছে, তাহার কোন অনুমতি লই নাই। অনুমতি না লওয়াতে আমাদের যাইতে কেহ বাধা দেয় নাই। তবে এই নিয়ম পালন না করাতে তীর্থ যাত্রার সম্পূর্ণ ফল হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। আর কিছু দূর যাইলে এক স্থলে রাস্তা কিছু প্রশস্ত হইল, তথায় পাহাড় গাত্র যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে ও কিছু উচ্চে পাহাড়টি ঝুঁকিয়া রাস্তাটিকে ছাদের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এ স্থলে যখন আমি ও বয় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে। শীতে ও মধ্যাহ্ন আহারের সময় অতিরিক্ত হইয়া

যাওয়ায় ও চড়াই উঠিবার পরিশ্রমে শরীর কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখানে চা বা কিছু খাদ্য পাইবার কোন উপায় নাই। যে কুলীর সহিত খাদ্য দ্রব্যের সাজ সরঞ্জাম আছে সে অনেক পশ্চাতে। যদিও এই স্থানটিতে বৃষ্টি ও বজরী হইতে যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় পাওয়া যায় কিন্তু তথায় অপেক্ষা করিলেই দারুণ শীতে জমিয়া যাইতে হইবে। অতএব আমি অগ্রসর হওয়াই স্থির করিলাম। বয়কে অগ্রসর হইয়া গিয়া একটি আগুণ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিলাম। সে অগ্রে চলিয়া গেলে আমি পুনরায় অগ্রসর হইলাম। এখন আর বড় চড়াই নাই। সরু রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া চলিয়াছে। বৃষ্টি ও বজরী ছাড়িয়া এখন আবার তুষার পতন আরম্ভ হইল। এদেশে তুষার পতন এক অভিনব জিনিস, এত উচ্চে এত ঠাণ্ডা স্থানেই কেবল দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, পত্র, লতা, গুল্ম, তৃণ, সব তুষারে আবৃত। এখন যে পথে চলিয়াছি তাহা তৃণ ও ছোট ছোট লতা গুল্মে আচ্ছাদিত। চলিবার সময় সে সকল তৃণ, লতা ও গুল্ম হইতে তুষার মোজা ও জুতার উপর লাগিয়া তাহা গলিয়া মোজা ও জুতা ভিজিয়া গেল, তাহাতে আরও অধিক ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। আরও কিছু দূর গিয়া হঠাৎ সম্মুখে চাহিয়া দেখি, দূরে ও কিছু নিম্ন

দেশে, পর্ব্বতের মধ্যে, বৃক্ষ লতাদি যেন সরাইয়া দিয়া, তুষার ধবল কি এক লম্বা শুভ্র পদার্থ রহিয়াছে। তাহা দেখিয়াই হৃদয় যেন স্বতই স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বহু প্রত্যাশিত বস্তুর নিকটবর্ত্তী হইলে মন যেরূপ উত্তেজিত হয় সেইরূপ উত্তেজনা অনুভব করিলাম। ঐ কি যমুনোত্তরী যেথা হইতে পবিত্র সলিলা যমুনা তুষার বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। নিকটে কেহ নাই যে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ মিঠাই। সেই শুভ্র পদার্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দ্রুত পদে অগ্রসর হইলাম। শীঘ্রই সেই বরফ রাশির পাদ দেশে একটি ছোট প্রস্তরের মন্দির ও তাহার নিকটে ধর্ম্মশালার কাল ছাদ দেখিতে পাইলাম, মনে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ঐ সেই বহু বাঞ্ছিত কল্পনা রচিত যমুনোত্তরী। এইবার হৃদয়ের বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। চীৎকার করিয়া সেই চির পরিচিত "যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী" গাহিয়া উঠিলাম। স্বর তাল হইল কি না হইল তাহার দিকে লক্ষ্য নাই। মনে একটা এরূপ আনন্দ এরূপ আবেগ উপস্থিত যে তাহা কোন মতে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছে। কিন্তু "প্রবাহিনী" পর্য্যন্ত গাহিয়াই হঠাৎ কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া গেল, চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল বাহির হইল। যিনি আমাদের এই দুর্গম পথ অতিক্রম

করিয়া ইপ্সিত বস্তু লাভ করিবার সামর্থ দিয়াছেন তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইল। এইবার ইচ্ছা হইল যেন দৌড়িয়া গিয়া ঐ শুভ্র বরফ রাশির নিকট উপস্থিত হই। এই চিন্তা যেমন মনে হওয়া তখনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। তখন যেন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু উর্দ্ধ মুখে সেই দূরস্থিত বরফের দিকে চাহিয়া ১০।১৫ পা দৌড়াইতেই পা পথস্থিত প্রস্তর খণ্ডে বা লতা গুল্মে আটকাইয়া পড়িয়া গেলাম। কিন্তু তাহাতেও সংজ্ঞা হইল না, উঠিয়া আবার দৌড়িবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এপথে রাস্তার দিকে না চাহিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার যো নাই কাজেই আমি পূর্ব্বের ন্যায় আবার পড়িয়া গেলাম। এই দ্বিতীয় পতনের পর আমার যেন কিছু সংজ্ঞা হইল, মন কিছু প্রকৃতিস্থ হইল, ভাবিলাম পাগলের মত এ কি করিতেছি। রাস্তার উপর না পড়িয়া আর কিছু পাশে পড়িলে হয়ত একেবারে বহু নিম্নে চলিয়া যাইতাম। ইহার পর অপেক্ষাকৃত আস্তে চলিতে লাগিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে সময় আমি পূর্ব্বোক্ত সেই এক মাইল চড়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন হইতে যমুনাকে আর দেখিতে পাই নাই। চড়াইয়ের পর উৎরাইয়ের মুখে স্থানে স্থানে নদীর জলের শব্দ শুনিয়া ছিলাম। কিন্তু নদী বহু নিম্নে

হওয়াতে ও পর্ব্বত গাত্র বহু বৃক্ষ ও লতা গুল্মে আচ্ছাদিত থাকাতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যে পথে চলিতে ছিলাম সেই পথটি হঠাৎ নদীর কিনারে শেষ হইল। আরও চলিতে গেলে এখন নদী গর্ভে নামিতে হয়। নদী কিন্তু সে স্থান হইতে ১০০।১৫০ ফিট্ নিম্নে ও তাহার পাড় ও অত্যন্ত উচ্চ নামিবার রাস্তা কিছু নাই। পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া আরও কিছু দূর নামিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পাইলাম, তাহারই গা বাহিয়া ৬০।৭০ ফিট নামিলে তবে নদী গর্ভে উপস্থিত হওয়া যায়। নদী গর্ভে নামা ভিন্ন মন্দির ও ধর্ম্মশালায় যাইবার অন্য কোনও পথও দেখিতে পাইলাম না। সেই প্রস্তরটি প্রায় একরূপ সোজাসুজি ভাবে নদী গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়াছে। নামিতে গিয়া একেবারে ২০।২২ ফিট গড়াইয়া গিয়া কোন মতে লাঠি ও হস্ত পদের সাহায্যে অল্প দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম। সেইরূপ ভাবে আরও দুইবার গড়াইয়া কোন মতে নদী গর্ভে গিয়া পড়িলাম। এই যমুনোত্তরীর পথের শেষ অংশে, পূর্ব্বোক্ত স্থান যথায় পর্ব্বত ধসিয়া গিয়াছে ও এই স্থান আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুরুহ বোধ হইয়াছিল। নদী গর্ভে নামিয়া সেই শুভ্র বরফ রাশি বা মন্দির বা ধর্ম্মশালা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন ঠিক পথে আসিয়াছি কিনা ভাবিয়া মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত

হইল, কিন্তু নদী গর্ভে মনুষ্যের চলার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইলাম ও তাহা অনুসরণ করিয়া শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র চড়াইয়ের পাদ দেশে উপস্থিত হইলাম। আবার চড়াই দেখিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি পড়াতে দেখি একটি অপরিচিত ব্যক্তি সেই চড়াইয়ের উর্দ্ধ দেশে দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা সংঙ্কেত করিয়া আমায় ডাকিতেছে। তখন আবার নূতন উৎসাহে সেই চড়াই উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার কষ্টের অবসান হইয়াছিল। উপরে উঠিয়াই একেবারে ধর্ম্মশালার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার বয় আসিয়াছে কিনা, তাহাতে সে অঙ্গুলি দিয়া ধর্ম্মশালার একটি ঘর দেখাইয়া দিল। ৪।৫টি ছোট ছোট দরওয়াজা পার হইয়া যে ঘরে বয় একটি আগুণ প্রস্তুত করিয়াছিল তথায় উপস্থিত হইয়াই আগুণের পাশে শুইয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যের বিষয় ঘরের মেঝেয় কতকগুলি কাঠের তক্তা পাতা ছিল। বোধ হইল শরীরে আর কোন শক্তি নাই। বয় ভিজা বুট ও মোজা খুলিয়া দিলে কিছুক্ষণ হস্ত পদ আগুণে সেকিবার পর শরীর কিছু সুস্থ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তথাপি আর কাহারও দেখা নাই, তখন বেলা প্রায় ২॥০টা। এইবার দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। এরূপ ক্ষুধা জন্মে কখন হইয়াছিল

কিনা মনে পড়ে না। লোকে কথায় যে বলে "ক্ষুধার জ্বালা" এখন তাহার সত্য অনুভব করিলাম। কিন্তু নিরুপায়, খাবার জিনিষ পত্র সবই পশ্চাতে, কতক্ষণে পৌঁছিবে তাহার কিছু স্থির নাই। ক্ষুধা পাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়, সকাল ৭॥০টার সময় কেবলমাত্র দুই খানি বিস্কুট ও দুই পেয়ালা চা খাওয়া হইয়াছিল, তাহার পর আর কিছু খাওয়া হয় নাই। যে অপরিচিত লোকটির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সে যমুনোত্তরীর পূজারী, সেই খানেই থাকে, মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিন পরে খরশালী হইতে খাবার জিনিস পত্র লইয়া আসে। আমরা যাহাকে পাণ্ডা করিয়াছিলাম সে তাহারি লোক। আমাদের বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে কিছু খাবার দিতে পারে কি না। তাহাতে সে বলিল তাহার নিকট খাবার কিছুই প্রস্তুত নাই তবে আটা আছে রুটি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। আমি বলিলাম "ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায় তুমি যত শীঘ্র পার আমার জন্য কিছু রুটি প্রস্তুত করিয়া আন"। সে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬ খানা হাতে গড়া রুটি ও কিছু ডাল আনিয়া দিল। সে রুটি ও ডাল যে কি সুমধুর লাগিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। অতি শীঘ্র তাহা নিঃশেষ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম। পূজারীকে সেই খাবারের জন্য ॥০ আনা দিয়া ছিলাম।

কিন্তু ৮৲ টাকা দিলেও বোধ হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য হইত না। তবে ৷৷০ আনা পাইয়াই সে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। আরও প্রায় ১ ঘণ্টা পরে অপর সকলে আসিয়া পোঁছিল, তখন বেলা প্রায় ৪টা। সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, আগুণের ধারে আসিয়া বসিল। ফণী যখন আসিয়া উপস্থিত হইল দেখি তাহার কোমরে দড়ী বাঁধা। আজ কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া হাঁসিবার মধ্যে আমি একেলা, কেননা আমি খাইয়া ও বিশ্রাম করিয়া অনেক সুস্থ হইয়াছিলাম। অপর তিন জন তখন আগুণের পার্শ্বে অসাড় অবস্থায় বসিয়া, শীতে ও পথশ্রমে তাহাদের শরীর অবস হইয়া পড়িয়াছিল। পথে ক্রমাগত বৃষ্টি বজরী ও তুষার হওয়াতে কষ্ট বেশী হইয়াছিল। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম এপথে প্রায়ই বজরী ও বৃষ্টি হয়। ফণী শীঘ্রই কিরূপে সে এই পথ অতিক্রম করিয়াছে বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল শৈলেন আগেই আসিতে পারিত কিন্তু তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বরাবর তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। সেই এক মাইল চড়াইয়ের সময় ও পরে যখন নদীগর্ভে নামিতে হইয়াছিল দড়ীর সাহায্যে কুলীরা তাহাকে টানিয়া তুলিয়াছিল ও নামাইয়াছিল। দুইজন কুলী দড়ী ধরিয়া সম্মুখ দিক হইতে টানিয়াছিল ও দুইজন পশ্চাৎ দিক হইতে ঠেলিয়া ছিল। সত্যেন সমস্ত পথ দুইজন কুলীর

হস্ত ধরিয়া আসিয়াছিল। বাহিরে তাহার কুলীরা বলাবলি করিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল, যে সাহেব একেবারে তাহাদের জান বাহির করিয়া দিয়াছে। শীঘ্রই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ধর্ম্মশালার নিকট হইতে নদী গর্ভ কিছুদূর নীচে। নদীর অপর পার্শ্বের পাহাড় বেশীদূরে নয়। এ স্থানে দুইদিকের পাহাড় বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়াতে ও আকাশে মেঘ থাকাতে অন্ধকার আরও শীঘ্রই ঘনীভূত হইয়া পড়িল। আমরা ধর্ম্মশালার একটি ঘরেই চারিটি ক্যাম্প বেড বিছাইয়া রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ঘরটিতে আর বিশেষ স্থান রহিল না। মধ্য দেশে একটু স্থান করিয়া তাহাতেই আগুণ জ্বালা হইয়াছিল, কিন্তু কাঠ ভিজা হওয়াতে ঘরে এত ধুঁয়া হইল যে আগুণ বাহির করিয়া দিতে হইল। ঘরটি অতি ছোট হওয়াতে ও তাহাতে ৪ জন লোক থাকাতে রাত্রে আমাদের শীতের জন্য কষ্ট হয় নাই, তবে শীতের জন্য গাত্র বস্ত্রেরও যথেষ্ট সরঞ্জাম ছিল। আমার সহিত তিনটি কম্বল ও একটি তোষক ও একটি লেপ ছিল। কম্বলের মধ্যে দুইটি বিলাতী ও একটি থরশালী হইতেই ৯৲ টাকা দিয়া কিনিয়া ছিলাম। ইহা সেই স্থলেই ভেঁড়ার লোমে প্রস্তুত, দেখিতে যদিও তত পরিষ্কার নয় কিন্তু বেশ গরম।

যমুনোত্তরী দেখিয়া খরশালী প্রত্যাবর্ত্তন।

——o——

১১ই অক্টোবর ১৯১৪।

গত কল্য যদিও যমুনোত্তরী আসিয়াছিলাম কিন্তু কিছুই দেখা হয় নাই। আসিবার অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইয়াছিল। সকালে উঠিয়া ধর্ম্মশালা হইতে নদী বক্ষে নামিলাম। নদীটি এখানে অনেকগুলি ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। সকল ধারা গুলি পার হইয়া অপর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে পর্ব্বত গাত্রে যমুনা দেবীর মন্দির। মন্দিরে যাইতে হইলে জুতা রাখিয়া নগ্নপদে যাইতে হয়। আমরা তাহাই করিলাম। প্রথমে অত্যন্ত ঠাণ্ডাতে পা কন্‌কন্‌ করিতে লাগিল কিন্তু ক্রমশঃ কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। মন্দিরের নিম্নে নদী গর্ভে এক বৃহৎ প্রস্তর রহিয়াছে ও তাহার অভ্যন্তরে একটি বৃহৎ গুহা আছে। যে ব্রাহ্মণ যমুনা দেবীর পূজা করে সে সেই গুহাতে বাস করে। পূর্ব্বে যে অপরিচিত ব্যক্তির কথা বলিয়াছি ও যে আমাকে গত কল্য রুটি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়াছিল সে এই গুহাতেই থাকে। গুহার মুখটি বেশ প্রশস্ত কিন্তু বেশী উচ্চ নয় প্রবেশ করিতে হইলে মস্তক নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। সে লোকটি

ও আমাদের পাণ্ডা বলিল যে গুহাটির অভ্যন্তর বেশ প্রশস্ত ও ভিতরে ঢুকিলে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়ান যায়, ছাদ মস্তকে ঠেকে না। গুহাটির মুখ প্রশস্ত হওয়ায় ও বন্ধ করিবার কিছু না থাকায় আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম এত ঠাণ্ডাতে রাত্রে মানুষ তাহার মধ্যে কিরূপে থাকে। তাহাতে তাহারা বলিল গুহার মধ্যে কখন শীত হয় না। অগ্নি না জ্বালাইয়াই পূজারীরা আরামে তাহার মধ্যে নিদ্রা যায়। অহার কারণ গুহার সম্মুখেই দুই তিনটি উষ্ণ জলের প্রস্রবন আছে। যমুনোত্তরীতে এই এক অদ্ভুৎ দৃশ্য দেখা গেল। এক দিকে নদী জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে ও সেই বরফের নিম্ন দিয়া ও বরফ গলিয়া তুষার শীতল জল স্রোত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আবার সেই বরফের পাদ দেশ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, মন্দিরের নিম্নে, নদী গর্ভে ও তাহার পার্শ্বে ৮।৯টি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। এই সকল প্রস্রবণ হইতে ক্রমান্বয়ে জল রাশি নির্গত হইয়া যমুনার স্রোতে মিশ্রিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত গুহার মুখে যে ২।৩টি প্রস্রবণ তাহার জল ফুটন্ত জলের ন্যায় উষ্ণ। গুহার মুখে এই ফুটন্ত জলের প্রস্রবণ থাকাতে গুহার ভিতর সকল সময় বেশ গরম থাকে। বাহিরে যখন দুরন্ত শীত তখনও ইহার মধ্যে বেশ আরামে বাস করা যায়। এই ৮।৯টি প্রস্রবণের মধ্যে ৩।৪টি হইতে জল স্ফুরণ হইতেছে দেখিতে

পাওয়া যায়। তুবড়ী বাজীতে আগুণ দিলে প্রথমে ফর্ ফর্ করিয়া আওয়াজ হইয়া যেরূপ অল্প অল্প অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে, এই ৩।৪টি প্রস্রবণ হইতে জল সেইরূপ তুবড়ীর ন্যায় ছিদ্রযুক্ত পর্ব্বত গাত্র হইতে ফর্ ফর্ শব্দে নির্গত হইতেছে। অপর গুলিতে জল নির্গত হইয়া ছোট ছোট কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে ও সেই সকল কুণ্ড হইতে উষ্ণ জল ধারা নির্গত হইয়া যমুনায় মিশিয়াছে। ৩।৪ কুণ্ডের জলের উত্তাপ ফুটন্ত জলের ন্যায় ও সেই সকল কুণ্ডে চাউল ইত্যাদি কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিয়া দিলে শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া যায়। তাহাতে আটার রুটি প্রস্তুত হয় শুনিয়া, আমরা কিরূপে তাহা হয় দেখিতে চাহিলে, পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ, কিছু আটা জলে ভিজাইয়া তাহা হইতে ৩।৪ খানি পাতলা রুটি হাতে গড়িয়া, একটি কুণ্ডের জলে ফেলিয়া দিল। রুটি গুলি কুণ্ডের তলায় চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ৫।৭ মিনিট পরে সেগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে সে বলিল যে রুটি সিদ্ধ হইয়াছে ও উহা খাইতে পারা যায়। অবশ্য এ রুটি আগুণে সেঁকা রুটির মত ফুলিয়া উঠে নাই, তবে কোন প্রকারে খাওয়া চলে। কয়েকটি উষ্ণ কুণ্ডের ও প্রস্রবণের জল একটি প্রস্তরের প্রস্তুত চৌবাচ্ছায় আসিয়া পড়িতেছে। এই চৌবাচ্ছার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল উহা

স্বাভাবিক নয় মনুষ্য হস্তে প্রস্তুত। ইহার জল নাতি শীতোষ্ণ হওয়ায় কতক গুলি কুলী এখানে মহানন্দে অবগাহন করিয়া স্নান করিল ও তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিল। মুসূরী হইতে ছাড়িবার পর এই বোধহয় তাহাদের প্রথম স্নান। ফণী ও আমি এখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলাম। যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী ও উত্তর কাশী এই তিন স্থানেই শ্রাদ্ধ করার নিয়ম আছে। আমি এই তিন স্থানেই শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। যে স্থলে যমুনার শীতল জল ও এই সকল উষ্ণ কুণ্ডের জল মিশিয়া নাতি শীতোষ্ণ জল হইয়াছে সেই স্থানে শীঘ্র স্নান সমাপন করিয়া গরম কাপড় পরিয়া শ্রাদ্ধ করিলাম। পাণ্ডাই শ্রাদ্ধ করাইল। নয়টি পিণ্ড দান করাইল। তিনটি পিতৃকুলের, তিনটি মাতৃকুলের, একটি অপর আত্মীয় স্বজনের জন্য, একটি বন্ধু বান্ধবের জন্য, আর শেষটি যাহার কেহই নাই তাহার জন্য। পিণ্ডগুলি বালির। সংস্কৃত একটি ছোট পুঁথি হইতে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িতে লাগিল ও আমাদের পাণ্ডা তাহা আমাদিগকে বলাইল। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কার্য্য সারিয়া লইল। তাহার পর আমরা মন্দিরের নিকট গেলাম। যমুনা গঙ্গা ও সরস্বতীর মূর্ত্তি মন্দিরের বাহিরে ও পশ্চাদ্ভাগে রাখা হইয়াছে, উপ.র একটি বস্ত্রের চাঁদোয়া টাঙ্গান রহিয়াছে। মন্দিরের

সম্মুখ দিকে গিয়া দেখি মন্দিরের দ্বার বন্ধ রহিয়াছে ও তাহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া কতকগুলি প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছে। শুনিলাম আরও শীত পড়িলে নদী জমিয়া বরফ মন্দির গাত্রে আসিয়া পড়ে ও সেই বরফের চাপে মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য নির্ম্মিত মন্দির আরও উর্দ্ধে ছিল, কিন্তু বরফের চাপে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাও এখন ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে। আবার ফিরিয়া ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দেখি আমাদের একজন কুলী তথায় বসিয়া মুখে "ব-ব-ব-ব-ব" শব্দ করিতেছে, ও পৌষ মাসের দারুণ শীতে স্নান করিয়া উঠিলে সর্ব্বশরীর মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় এক এক সময় যেরূপ দারুণ বেগে কম্পিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব শরীর কম্পান্বিত করিতেছে, আরও জন কয়েক কুলী তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে উহার শরীরে দেবতা আসিয়াছেন। বোধহয় আমাদের দেশে আমরা যাহাকে ভূতে পাওয়া বলি ইহা তাহারই ন্যায় কিছু হইবে। যাহা হউক আমরা দেবতাকে বিশেষ প্রশ্রয় না দেওয়াতে দেবতা শীঘ্রই তাহাকে ছাড়িয়া গেল। তাহার পর আমরা বরফের পাদদেশ পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া ধর্ম্মশালায় গেলাম ও তথায় আহারাদির

পর স্থির হইল ফণী ও সত্যেন ও সকল কুলীরা ফিরিয়া খরশালী যাইবে, কেবল আমি শৈলেন দুই জন পাণ্ডা ও আমাদের শিকারী বরফের উপর কিঞ্চিৎ দূর উঠিয়া দেখিয়া যাইব। পাণ্ডারা বলিল বরফের উপর কিম্বা পর্ব্বত গাত্রে সম্ভবতঃ তাহারা কিছু শিকার দেখাইয়া দিতে পারিবে। বেলা ১২টার সময় আমরা আমাদের রাইফ্যালটি সঙ্গে লইয়া বরফের দিকে অগ্রসর হইলাম, অপর দল খরশালী অভিমুখে চলিয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ আজ বরফ কি বজ্‌রী কিছুই ছিল না, আকাশ পরিষ্কার হইয়া রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমরা বরফের নিকটে আসিয়া দেখি দুই পার্শ্বের পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমস্ত এক প্রকাণ্ড বরফের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্র উচ্চ হইতে ক্রমশঃ আমাদের দিকে গড়াইয়া আসিয়াছে ও তাহার পাদদেশ আসিয়া আমাদের সম্মুখস্থ নদী বক্ষে মিশিয়াছে। সেই বরফের পাদদেশ হইতে যমুনার স্রোত সবেগে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে কেবল মাত্র বরফ গলিয়া জল স্রোত নির্গত হইতেছে না। কিন্তু বরফের নীচে দিয়া অনেক দূর হইতে এই স্রোত প্রবাহিত। আমরা বরফের পাদদেশ দিয়া তাহার উপর উঠিলাম। কিন্তু দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই "মট্" করিয়া একটি জোরে আওয়াজ হইল।

বরফ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আশঙ্কা করিয়া আমরা ফিরিব কিনা এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইলাম। যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম বরফের পাদদেশ হইতে ২০।২৫ হস্ত ঊর্দ্ধে বরফ ফাটিয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সূতার ন্যায় একটি দাগ হইয়াছে। আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলাম। উপরে উঠিতে অনেক সময়ে পদস্খলন হইতে লাগিল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া বরফের ক্ষেত্র অনেকটা সমতল হওয়াতে অপেক্ষাকৃত সহজে চলিতে পারিলাম। স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ড ও বৃক্ষের ডাল পালা ইত্যাদি বরফে প্রোথিত রহিয়াছে দেখিলাম। বরফের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইবার পর দেখিলাম সম্মুখে অত্যুচ্চ পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে। সে পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়া বরফের ক্ষেত্র শেষ হইয়াছে ও সেই পর্ব্বতের গা বহিয়া তাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে তিনটি জল স্রোত পড়িতেছে। পাণ্ডারা বলিল এই তিন স্রোত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। এই স্থলে গঙ্গা ও সরস্বতী কোথা হইতে আসিল তাহা আর প্রশ্ন করিলাম না। তিনটি জল ধারা পাহাড়ের গা বহিয়া একেবারে বরফের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে ও আমরা যে বরফ ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি তাহার নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার পাদদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এতদূর বরফের উপর আসিয়া

ও এই তিন জল ধারাকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে পড়িতে দেখিয়া মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। আমরা দেখিতে আসিয়াছি যমুনোত্তরী, যমুনার উৎপত্তি স্থান, তাই কেবল মাত্র মন্দির দেখিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া আমরা সেই উৎপত্তি স্থান দেখিতে অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি যে জল ধারা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পড়িতেছে, ঐ শৃঙ্গের নাম যমুনোত্তরী শৃঙ্গ উহা বান্দর পঞ্চ নামক শৃঙ্গের অতি নিকটবর্ত্তী। দুই শৃঙ্গই ২০,০০০ ফিটের অধিক উচ্চ। তথায় উঠিতে হইলে আমাদিগকে আরও প্রায় ৯০০০ ফিট উচ্চে উঠিতে হইবে। পর্ব্বত গাত্র ও এ স্থলে প্রায় সোজা উঠিয়াছে। পাণ্ডারা বলিল য আমরা যে স্থলে আসিয়াছি তাহারা তাহা হইতে আরও অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ও আমাদের লইয়া যাইতে রাজি আছে। কিন্তু আমরা দেখিলাম তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে ও আমাদের সঙ্গী লোক জন ও রসদ সমস্তই খরশালী চলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতে গেলে যমুনোত্তরীতেই আর এক রাত্রি বাস করিতে হইবে, কিন্তু তাহার সরঞ্জাম কিছুই আমাদের সহিত নাই। অতএব এই স্থান হইতে ফিরাই স্থির করিলাম, মনে কিন্তু কিছু আক্ষেপ রহিয়া গেল। তাহার পর পাণ্ডাদের নিকট শুনিলাম বাঁন্দর পঞ্চের নিকট পর্ব্বত শৃঙ্গে এক বিস্তৃত হ্রদ আছে, যমুনা

নদী সেই হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধারাবাহিরূপে পর্ব্বত গাত্র বহিয়া পতিত হইতেছে। জানিনা এই সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ আর কখন দেখা হইবে কিনা, এবারে ত হইল না। এই স্থলে বরফের উপর দাঁড়াইয়াই চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। স্থানটি যেন একটি বৃহৎ প্রাঙ্গন। যে পথে আমরা আসিয়াছি সেইটি প্রবেশের পথ, আর সমস্ত দিক উচ্চ পর্ব্বতে ঘেরা। কেবল মাত্র যমুনার জলপ্রপাতের শব্দ ভিন্ন অপর কোন শব্দ নাই। এখানে ৩।৪ খানি ছবি লইলাম, কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটিই ঠিক উঠে নাই। নামিয়া আসিবার সময় শৈলেনই অগ্রে আসিতে ছিল। যখন বরফ হইতে নামিবার আরও ৮০।৯০ ফিট্ বাকি ছিল, সেই স্থলে আসিয়া শৈলেন আবার তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল ও তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন সে বিপদের আশঙ্কা করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বলিল, যে আসিবার সময় বরফের যে স্থল ফাটিয়াছিল এখন সে স্থল প্রায় এক ফুট ফাঁক হইয়াছে ও নীচের দিকের বরফের এক কোন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নামিবার অন্য কোন পথ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে পাণ্ডারা বলিল, অন্য পথ তাহারা ঠিক জানে না ও থাকিলেও বহু উর্দ্ধে পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিলে তবে অন্য দিক দিয়া নামিতে পারা যাইতে পারে। তাহাদের কথায়

বিশেষ আশ্বস্থ হইলাম না। আমি স্থির করিলাম যে বরফ আর বেশী ফাঁক হইবার অগ্রেই যে স্থান ফাঁক হইয়াছে সেই স্থানটি ডিঙ্গাইয়া বরফের উপর দিয়াই নামিয়া পড়া যুক্তিযুক্ত। এবার আমিই অগ্রে চলিলাম। অল্প অগ্রসর হইতেই বরফ এত গড়ানে বোধ হইল যে বসিয়া বসিয়া, হস্ত পদ ও শরীরের সাহায্যে, গড়াইয়া চলিলাম। সেই ফাঁকের নিকট আসিয়া দেখি, যে বরফের নীচের অংশ সমস্ত সরিয়া নামিয়া গিয়াছে, ও উপরের ও নীচের অংশের মধ্যে প্রায় ১ ফুটের অধিক ব্যবধান হইয়াছে, আর নীচের অংশের এক দিক হইতে কতক অংশ ভাঙ্গিয়া নদী গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। বরফ এই স্থলে অনুমান ২০ ফিট্ মোটা হইবে। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া বরফের মধ্যে ঢুকিয়া গেলে বাহির হইবার আর কোন উপায় নাই। এই জন্যই পাহাড়ে বরফের উপর চলিতে হইলে ভ্রমণকারীরা লম্বা এক দড়ী দিয়া পরস্পরকে বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। দলের মধ্যে কেহ যদি এইরূপ বিপদজনক স্থানে পতিত হয় দড়ী দিয়া বাঁধা থাকিলে তাহাকে টানিয়া তুলিবার উপায় থাকে। আমি সেই ফাঁকের নিকট আসিয়া সেই স্থানটি লাফাইয়া পার হইলাম ও গড়াইয়া শীঘ্রই বরফের পাদদেশে পৌঁছাইলাম। অপর সকলেও আর অপেক্ষা না করিয়া একে

একে ঐরূপভাবে নামিয়া আসিল। পাণ্ডাদের বরফ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাহারা বলিল বরফ যেরূপভাবে ফাটিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া একেবারে নীচে নামিয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক সে বিষয় আর বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমরা খরশালী অভিমুখে চলিলাম। আজ বৃষ্টি বাদল না থাকাতে চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। আজ প্রাতে যখন আমরা শ্রাদ্ধশান্তি করিতেছিলাম শিকারী হিমালয়ের তিতির জাতীয় একটি পক্ষী মারিয়াছিল। টিহরীর রাজার আদেশ অনুসারে এই পক্ষী মারা নিষেধ। কিন্তু নিষেধ থাকিলে সেই কার্য্য করাই মানুষের কতকটা স্বভাব সিদ্ধ। পক্ষীটির প্রায় ২।২॥০ সের মাংস হইবে। এরূপ সুস্বাদু মাংস বোধ হয় আর আস্বাদ করি নাই। বেলা প্রায় ৩টার সময় খরশালী হইতে প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী পুলটি পার হইলাম। এই স্থান হইতে রাস্তা ভাল। এই স্থানে আসিয়া পাণ্ডা আমাদের একটি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, যে যাহাদের সঙ্গে বন্দুক থাকে তাহারা সকলেই যমুনোত্তরী দেখিয়া ফিরিবার সময় ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি মারে। ইহার অর্থ যে যমুনোত্তরী জয় হইয়াছে। আমাদের এপথে গুলি চালাইবার প্রয়োজন অতি অল্পই হইয়াছিল, কাজেই পর্ব্বত শৃঙ্গে গুলি মারিতে

কিছুই আপত্তি হইল না। আমি রাইফ্যাল বড় একটা ছুঁড়ি নাই, অতবড় পাহাড়টা ফস্কাইব না এই আশায় আমিই গুলি চালাইলাম। ৫০০।৭০০ গজ উর্দ্ধস্থিত পর্ব্বত শৃঙ্গে গুলি লাগিল কিনা বলা মুস্কিল, তবে পাণ্ডারা বলিল লাগিয়াছে, আমিও তাহাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু মনে মনে কিছু সন্দেহ রহিয়া গেল। প্রায় ৪টার সময় খরশালী পৌঁছিয়া ফণী ও সত্যেনের নিকট বরফের গল্প করিলাম। আজ রাত্রি খরশালীতেই কাটান হইল।

খরশালী হইতে কুতনোর।

১৪ মাইল।

---o---

১২ই অক্টোবর ১৯১৪।

এক রাত্রি যমুনোত্তরী ও দুই রাত্রি খরশালীতে থাকিয়া আজ ফিরিবার পালা। আমাদের একটি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এত অল্প সময়ের জন্য পরিচয় হইলেও যেন এই স্থান ছাড়িতে মনে একটু কষ্ট হইল। মনে হইল জীবনে বোধ হয় এ স্থান আর কখনও দেখা হইবে না। যাইবার সময় পাণ্ডার প্রাপ্য দিবার সময় দেখিলাম, আমাদের সঙ্গেকার রৌপ্য মুদ্রা কমিয়া গিয়াছে। উত্তরকাশীর অগ্রে টাকা ভাঙ্গাই-বার কোন আশাও নাই। পথে কুলীদের ও আমাদের খাইবার খরচের জন্য নগদ মুদ্রার আবশ্যক। খরশালীতে এক খানি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলে কেহই দিতে পারিল না বা দিল না। অতএব যদিও আমরা পাণ্ডাকে ১০৲ টাকার কম দিব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু খুচরা টাকা কম থাকাতে ১০৲ টাকা দিতে বাধ্য হইলাম। সেও ১০৲ টাকার নোট লইতে ইতঃস্তত করিতেছিল ও নগদ টাকা পাইলে কিছু

কম পাইলেও সন্তুষ্ট হইত, কেননা এই নোট ভাঙ্গাইতে তাহাকে হয় উত্তরকাশী বা টিহরী যাইতে হইবে। আমরা পাণ্ডার খাতায় নাম ধাম লিখিয়া ও তাহাকে ১০৲ টাকার এক খানি নোট দিয়া খরশালীর নিকট বিদায় লইলাম। এবার উজ্‌রীতে না থামিয়া আমরা কুতনোরে গিয়া রাত্রির জন্য থামিলাম। কুলীরা যদিও ১৪ মাইল চলিতে প্রথমে অল্প গোলযোগ করিতে-ছিল, কিন্তু আসিবার সময় উজ্‌রীতে তাহারা খাইবার সব জিনিস না পাওয়ায় কুতনোর পর্য্যন্ত যাইতে রাজি হইল। আমরা বেলা আন্দাজ ৪টার সময় কুতনোরে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটী বড় দেবদারু বৃক্ষের নিচে তাম্বু গাড়িলাম। এখানে আসিয়া আমাদের আবার ডাক্তারী করিতে হইল। শৈলেন যমুনোত্তরী যাইবার সময় যে লোকটিকে, তাহার স্ত্রীর মস্তিষ্কের অসুখ বলাতে, কতক গুলি ল্যাক্সিটিভ্ পিল্ (জোলাপের বড়ী) দিয়াছিল, সে, বড়ী বেশী না পাওয়াতে, সেগুলি তাহার স্ত্রীকে না দিয়া নিজেই খাইয়া ফেলিয়াছিল, ও তাহাতে তাহার বহু কালের কোষ্ঠ বদ্ধতা সারিয়া গিয়াছিল। ইহাতে শৈলেনের চিকিৎসা ও ঔষধের উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়াই সে ভেঁট স্বরূপ পুনর্ব্বার একটি বড় শসা লইয়া উপস্থিত হইল ও নানা

প্রকারে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল। তাহাদের গ্রামের একটি মেয়ে বহুদিন হইতে মাথার ব্যারামে ভোগাতে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, এমন কি টিহরীর ডাক্তারেরাও তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। এই মেয়েটি গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের মেয়ে। সেই জন্য, এই লোকটি, এই মেয়েটিকে দেখিবার জন্য, শৈলেনকে বিষেশরূপে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে যে গ্রামে থাকে তাহা আমাদের যাইবার রাস্তা হইতে কিছু দূর হওয়ায় শৈলেন যাইতে রাজী হইল না। অরাজী হইবার আর এক কারণ, রোগের যে সকল উপসর্গ এই লোকটি বলিল তাহা মেডিসিন বক্সের সহিত যে পুস্তক থাকে তাহাতে পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের ডাক্তারীর যশ এ স্থানে এত রাষ্ট্র হইয়াছিল যে এখানকার রোগীদের ল্যাক্সিটিভ্ পিল্ দিতে দিতে তাহা শেষ হইয়া গেল। তখন আমাদের সহিত মাথায় মাখিবার জন্য যে গন্ধ যুক্ত ক্যাষ্টর-ওয়েল বা রেঁড়ীর তেল ছিল, তাহাই অকাতরে দেওয়া হইল। এই সুগন্ধি রেড়ীর তেলের কি ফল হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে এরূপও হইতে পারে যে ভবিষ্যতে কুতনোর গ্রামে শসার বদলে লাঠি ভেট মিলিতে পারে।

যমুনোত্তরী

কুতনোর হইতে নন্দগাঁও।

প্রায় ৮ মাইল।

১৩ই অক্টোবর ১৯১৪।

আজ কুতনোর হইতে ক্রমশঃ নামিয়া আমরা গঙ্গানী আসিয়া যমুনার ধারে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন ও স্নান করিলাম। যমুনার বক্ষ এই স্থলে বেশ প্রশস্ত ও তাহাতে যে সকল প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট। যাইবার সময় এই স্থানটি ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, এখন দেখিলাম স্থানটি বেশ মনোরম। এখানে একজন মান্দ্রাজীর সহিত দেখা হইল। সে আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিল। বলিল, সে এস্থানে কিছু দিন হইতে অবস্থিতি করিতেছে, এ প্রদেশে ভ্রমণই উদ্দেশ্য। আমরা এখানে গঙ্গার মন্দির দেখিলাম, ও তাহারই নিকটে একটি ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত চৌবাচ্ছায় জল ও তাহাতে বিস্তর মাছ রহিয়াছে দেখিলাম। জল চৌবাচ্ছার নীচে পর্ব্বত গাত্র হইতে বাহির হইয়া, চৌবাচ্ছা পরিপূর্ণ হইলে, তাহার এক পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রবাদ আছে যে, এই জল গঙ্গা হইতে পাহাড়ের মধ্য দিয়া

আসিয়া এই স্থানে নিস্ক্রান্ত হইয়া যমুনার সহিত মিশিতেছে, । সেই জন্য এই স্থানটির নাম গঙ্গানী। আমরা একটি রুটি লইয়া টুকরা করিয়া মাছেদের দিলাম! মাছগুলি রুটির টুক্‌রা ধরিবার জন্য এক স্থানে জমা হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিল। এখান হইতে নন্দগাঁও পাকৃডাণ্ডী দিয়া গেলে প্রায় ১।১৷৷৹ মাইলের চড়াই, আর ঘুরিয়া রাস্তা দিয়া গেলে ২।২৷৷৹ মাইল হইবে। আমরা পাকডাণ্ডী দিয়াই চলিলাম। অল্প দূর যাইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে যত উঠিতে লাগিলাম পাকডাণ্ডি বেশ পিচ্ছিল হইল, অতি কষ্টে লাঠিতে ভর রাখিয়া আস্তে আস্তে উঠিতে হইল। উপরে উঠিয়া ২।৩টি ক্ষেত পার হইয়া, গ্রামের নীচে, একটি সমতল ক্ষেত্রে, আমাদের তাম্বু টাঙ্গান হইল। বৃষ্টি কিন্তু থামিল না অল্প অল্প পড়িতে লাগিল। গ্রামটি বড় গ্রাম ও তাহার নিকটেই তাম্বু পড়াতে স্থানটি তত পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইল না। আমরা বুটের তলায় লাগাইবার জন্য কতকগুলি কাঁটা যুক্ত স্ক্রু লইয়া আসিয়াছিলাম, এত দিন তাহা বুটের নীচে লাগান আবশ্যক বিবেচনা করি নাই, কিন্তু আজ পাকৃডাণ্ডীতে উঠিবার সময় পা যেরূপভাব পিছলাইয়া ছিল তাহাতে সেই স্ক্রু গুলি জুতায় লাগান স্থির করিলাম। মুচী খোঁজাতে গ্রামে একজন মুচী পাওয়া গেল ও সে অল্প সময়ের

মধ্যেই জুতার তলায় স্ক্রু গুলি লাগাইয়া দিল। রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে দেখা গেল যে আমাদের তাম্বু গুলি একেবারে ওয়াটার প্রুফ্ নয়। স্থানে স্থানে জল পড়িয়া লেপ ইত্যাদি ভিজিয়া গেল। আমাদের শয্যার এক পার্শ্ব প্রায় তাম্বুর গায়ে লাগান থাকিত। যে অংশ তাম্বুর সহিত লাগান ছিল তাহা ভিজিয়া গেল। ওয়াটার প্রুফ্ কোটটি বিছানার উপর চাপাইয়া কতক অংশ রক্ষা করা গেল, কিন্তু আজ রাত্রে ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইল।

নন্দগাঁও হইতে সিঙ্গোটা

প্রায় ১০ মাইল।

১৪ই অক্টোবর ১৯১৪।

---o---

গত কল্য গঙ্গানী হইতেই আমরা ধরাসুর রাস্তা ছাড়িয়া উত্তরকাশীর রাস্তায় চলিয়াছি। ধরাসু ও গঙ্গানীর মধ্যে যেমন একটি বড় চড়াই আমারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এখন শুনিলাম উত্তরকাশী যাইতে তদপেক্ষাও একটি বড় চড়াই পার হইতে হইবে। ইহা হইতে জানিতে পারিলাম যে গঙ্গার উপত্যকা হইতে যমুনার উপত্যকায় আসিতে হইলে ঐরূপ বৃহৎ পর্ব্বত একটি উল্লঙ্ঘন না করিলে আসা যায় না। তবে চড়াই এখন অনেক অভ্যস্ত হইয়াছিল, এখন চড়াই শুনিলে আশঙ্কা হইত না। নন্দগাঁও ছাড়াইয়া ২।২৷৷০ মাইল আসিবার পর চড়াই সুরু হইল। এতদূর আমরা দুই তিন খানি বড় বড় গ্রামের মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলাম, গ্রামগুলি স্থানে স্থানে বড় অপরিষ্কার। চড়াই আরম্ভ হইতেই পর্ব্বত গাত্রে বৃক্ষ দেখা দিল। প্রথমে বৃক্ষগুলি ছোট ছোট ও কিছু ফাঁক ফাঁক হওয়াতে কতকটা উদ্যানের মত দেখাইতে

ছিল। মধ্যে মধ্যে ফল ফুলের বৃক্ষও রহিয়াছে দেখিলাম। আর কিছু উর্দ্ধে উঠিতেই পর্ব্বত গাত্র ঘন বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইল। এখন আমরা ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। একটি পর্ব্বতের উপর আসিয়া কিছু সমতল ভূমি পাই কিন্তু পথ পুনরায় আর একটি পর্ব্বত গাত্রে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে একে একে আমরা তিনটি পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিলাম। পথে উঠিতেছি ও ঝরণা হইতে বোতলে জল লইয়া পান করিতেছি। দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি বেঁক উঠিয়া এক একবার দম লইবার জন্য দাঁড়াইতে হইতেছে। একস্থানে কিয়ৎ পরিমাণ সমতল ক্ষেত্রে ইষ্টক খণ্ডের ন্যায় পোড়া মৃত্তিকা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানে মনুষ্যের বসবাসের কোন চিহ্নই দেখিলাম না। হইতে পারে এই স্থানে লাল কাঙ্করের খণি আছে। কিন্তু সে বিষয় বিশেষ অনুসন্ধানের সুবিধা আমাদের হইল না। অবশেষে চড়াই শেষ হইল। পর্ব্বতের শিখর দেশে আসিয়া অপর পার্শ্বের উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। আমাদের অনেক নিম্নে দূরে শস্য ক্ষেত্র সকল ও দুই একটি নদী দেখিতে পাইলাম। এইবার উৎরাই আরম্ভ হইল। যমুনোত্তরীর পথে যেদিন গঙ্গানী যাই সেদিন যেরূপ উৎরাইএর অন্ত ছিল না এ সেই প্রকার অধিকন্তু

এদিককার পর্ব্বত গাত্র কিছু সোজা হওয়াতে পায়ের উপর বেশী ভর পড়িতে লাগিল। বোধ হয় এক ঘণ্টা কালেরও অধিক উৎরাইয়ের পর আমরা একটি দেবদারু বৃক্ষের বনে প্রবেশ করিলাম। দেবদারু বৃক্ষের তলা গুলি প্রায়ই পরিষ্কার হয় অর্থাৎ তথায় বিশেষ জঙ্গল থাকে না। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অনেকক্ষণ হইতে একটি স্থান খুঁজিতে ছিলাম। কিন্তু এই উৎরাইয়ের মুখে একটিও ঝরণা দেখিতে না পাওয়ায় দাঁড়াইতে পারি নাই। দুই এক জন পাহাড়ী লোকের সহিত পথে দেখা হওয়ায় তাহারা বলিল ঝরণা আরও নীচে। ক্রমাগত এক ঘণ্টা চলিয়া আমরা অনেক দূর নামিয়া আসিয়াছিলাম, তথাপি ঝরণা না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভগ্ন মনোরথ হইয়াছিলাম। যাহা হউক এই দেবদারু বন হইতে ঝরণা নিকট শুনিয়া ও স্থানটি পরিষ্কার দেখিয়া আমরা তথায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য থামিলাম। এখানে আহারাদি ও বিশ্রামের পর একটি পাকডাণ্ডি দিয়া ঝরণার নিকট রাস্তায় নামিলাম। সেখান হইতে দুই মাইল চলিবার পর সিঙ্গোটা গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটি পর্ব্বত গাত্রে, আমরা যে পথে যাইতেছিলাম ইহা হইতে অনেক উচ্চে। আমরা গ্রামের নিকট না গিয়া পথি পার্শ্বস্থ শস্য ক্ষেত্রেই তাম্বু গাড়া ঠিক করিলাম। তাম্বু ফেলিবার স্থানে আসিবার

আগে একটি নদী পার হইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। নদীর উপর পুল ছিল না, কেবলমাত্র একটি কড়ি জল হইতে প্রায় ১০ ফিট উচ্চে নদীর এক দিক হইতে অপর দিকের পর্ব্বত গাত্রে পড়িয়া ছিল। নদীর বক্ষ এই স্থলে প্রায় ৩০ ফিট লম্বা, স্রোতের বেগও অতি প্রখর। পূর্ব্বোক্ত কড়িটি প্রায় ৪০ ফিট লম্বা কিন্তু প্রস্থে কেবল মাত্র ১৭।১৮ ইঞ্চ হইবে। আমি নদীর ধারে আসিয়া নদী পার হইবার জন্য কেবল মাত্র একটি কাঠ দেখিয়া কিছু ভীত হইলাম। নদী পার হইতে হইলে হয় এই কড়ির উপর দিয়া বা জলস্রোতের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। এই দুই ভিন্ন নদী পারের আর কোন উপায় দেখিলাম না। দুইটির কোনটিই সহজ নয়। কড়ির উপর দিয়া যাইবার সময় মাথা ঘুরিয়া পদ স্খলন হইবার সম্ভাবনা ও একবার পদ স্খলন হইলে সেই ভীষন স্রোতের মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় যে চলিয়া যাইব তাহার ঠিক নাই। নদীর ধারে বসিয়া ইতঃস্তত করিতেছি এমন সময় আমাদের মোটবাহী একটি কুলী আসিয়া পৌঁছিল, ও কোনরূপ ভাবনা চিন্তা না করিয়া, আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া, সেই কড়ির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। অপর পারে গিয়া মোট নামাইয়া আমাকে ডাকিল "আওনা সাহেব"। আমারত ইচ্ছা

যাই কিন্তু মনে কিছু কিছু ভয় হইতে ছিল ও পা শীঘ্র চলিতে চাহিতে ছিল না। যাহা হউক অল্প চিন্তার পর, কুলীর ন্যায় সেই কড়ির উপর দিয়াই পার হওয়া স্থির করিয়া, আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। একাগ্র চিত্তে, নিম্নস্থ সেই কড়ির ১॥০ ফুট প্রস্থ কাষ্ঠের উপর মনোনিবেশ করিয়া, লাঠিটি ধীরে ধীরে তুলিয়া সম্মুখে ফেলিতে ফেলিতে, এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইলাম। সে সময়ে আমার পদদ্বয় ও সেই কড়ি ভিন্ন পৃথিবীতে যে অপর কোন পদার্থ আছে এ কথা আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু কড়িটির মাঝখানে আসিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন কড়িটি আমার পায়ের নীচে হইতে বাঁ দিকে সরিয়া যাইতেছে। এই-রূপ মনে হইতেই মাথা অল্প ঘুরিয়া গেল ও ফেণ্ট্ (অজ্ঞান) হইবার আগে শরীর যেমন অসাড় হইয়া আসে সেইভাব এক মুহুর্ত্তের জন্য অনুভূত হইল। পর ক্ষণেই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম কড়ির নীচে দিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত জল রাশির উপর দৃষ্টি পড়াতেই বোধ হইয়াছিল পায়ের নীচের কড়িটিই যেন স্রোতের বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। দ্রুতগামী রেলের গাড়ী হইতে বাহিরের গাছ পালা গুলি দেখিলে যেমন মনে হয় যে তাহারা দ্রুত বেগে রেলের গতির বিপরীত দিকে দৌড়াইতেছে এ স্থলেও ঠিক তদ্রুপই হইয়াছিল। একবার

যখন বুঝিতে পারিলাম যে আমার দেখিবার ভুলেই ঐরূপ বোধ হইয়াছিল, তখন, মনকে শক্ত করিয়া, অগ্রসর হইলাম ও নিরাপদে অপর পারে পৌঁছিলাম। কিন্তু অপর পারে গিয়া যখন অল্প চিন্তার সময় পাইলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম যে অত্যন্ত দুঃসাহসিকের মত কাজ করা হইয়াছে। আমি পার হইবার অল্প পরেই ফণী অপর পারে পৌঁছাইল ও তাহার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কড়ির উপর দিয়া পার হইল। সে উপায় এই, তাহার অগ্রে একটি কুলী চলিল ও সে কুলীর দুই কাঁধ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ উপায়েও যথেষ্ট সাহস আবশ্যক। তাহার কিন্তু এ সাহসের অভাব কখনও দেখি নাই। তাহার অল্প পরে শৈলেন অপর পারে আসিয়া কড়ি দেখিয়া ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া আমি আমার নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহাকে বিনা সাহায্যে কড়ির উপর দিয়া আসিতে বারণ করিলাম, তাহাতে সে জুতা খুলিয়া নদীর মধ্য দিয়াই আসিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই নদীটির স্থানে স্থানে জল অল্প হওয়াতে জলের মধ্য দিয়া পার হওয়া যায়। সত্যেন আসিয়া ডাণ্ডি হইতে না নামিয়া ডাণ্ডি সমেত কুলীদিগকে পার করিতে বলিল। কুলীরা তাহাতে প্রথমে কিছু আপত্তি করিল কিন্তু সে আপত্তি না শুনাতে তাহারা অতি কষ্টে ডাণ্ডি সহিত

তাহাকে নদী পার করিল। তাম্বু ফেলিবার জমী খুঁজিতে আমাদের কিছু সময় লাগিল। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ীরা ক্ষেত করিবার জন্য যে সকল সমতল জমী প্রস্তুত করে সেই সব জমীতেই আমাদের তাম্বু ফেলিতে হইত, কেননা তাহা ছাড়া "পড়াওয়ের" জায়গায় অনেক সময় সমতল ভূমি পাওয়া যাইত না। কিন্তু এ স্থানের সকল ক্ষেত গুলিই প্রায় লাঙ্গল দিয়া চসা হইয়াছিল সেই জন্য মাটি নরম থাকাতে তাহাতে তাম্বুর খোঁটা বসাইয়া রাখা দুরুহ হইল। অনেক খুঁজিবার পর আমরা একটি জমি পাইলাম যাহাতে ধান কাটা হইয়াছে কিন্তু লাঙ্গল দেওয়া হয় নাই, সেই স্থানেই তাম্বু ফেলিলাম। ইহার অল্প পরেই কুলীরা বলিল যে শিকারী একটি হরিণ মারিয়াছে ও আনিবার জন্য কুলীদের ডাকিতেছে। হরিণ মারিয়াছে শুনিয়া আমরা মহা আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আটার রুটি ও কুমড়ার তরকারীতে আর রুচি ছিল না। কিছু পরে কুলীরা এক বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া একটি প্রায় ১ মন আন্দাজ ওজনের হরিণ লইয়া আসিল। ধরাসুর নিকট যে "গোড়র" মারা হইয়াছিল ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, পিঠের উপরকার লোম কাল ও পেটের লোম শাদা, শিং কাল ছোট ছোট। আমরা হরিণ দেখিয়া মহা উল্লাসিত হইলাম। আজ সকলেরই

ভাগ্যে যথেষ্ট মৃগ মাংস জুটিল। আমরা মৃগ মাংস অল্পই লইলাম ও কিছু আমাদের বয়কে পর দিনের জন্য সঙ্গে লইতে বলিলাম। অবশিষ্ট মাংস কুলীরা মহা আনন্দে লইয়া গেল। মৃগ চর্ম্ম ও মস্তক রাখিয়া দিতে বলিলাম, ইচ্ছা দেশে লইয়া যাইব।

—— —

সিঙ্গোটা হইতে উত্তরকাশী।

প্রায় ১০ মাইল।

১৫ই অক্টোবর ১৯১৪।

আজ উত্তরকাশী যাইব ও সতীশের সহিত দেখা হইবে বলিয়া আমরা সকলেই উৎফুল্ল। গতকল্য যে উৎরাই সুরু হইয়াছিল এখনও তাহাই চলিয়াছে। আজ ফণী ও সত্যেন উৎরাই পাইয়া পদব্রজেই চলিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা চলিবার পর আমাদের উৎরাই শেষ হইল। ধরাসু ও ঢুডা হইতে যে রাস্তা উত্তরকাশীর দিকে গিয়াছে, আমরা সেই রাস্তা পাইলাম। নিকটেই একটি ছোট ধর্ম্মশালা, রাস্তা হইতে কিছু নিম্নে, গঙ্গা তাহারও বহু নিম্নে। ধরাসু ছাড়িবার পর গঙ্গার সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ। এই স্থলেই যমুনোত্তরীর পথ শেষ করিয়া আমরা গঙ্গোত্তরীর পথ পাইলাম। এই স্থলে পথের বহু নিম্নে নদীর উপর একটি দড়ীর পুল আছে। হিমালয়ের পথে এইরূপ পুল মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। আমাদের উত্তরকাশীর রাস্তা এই পুলের উপর দিয়া যায় নাই। কিন্তু এই পুল গুলি কি প্রকার তাহা দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় আমি পাক ডাণ্ডি দিয়া নামিয়া

পুলের নিকট গেলাম। যাহা দেখিলাম নীচে তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। দুইটি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ ও মোটা কাঠের খুঁটি পুলের সম্মুখে প্রায় ৩।৩॥০ ফিট ব্যবধানে পর্ব্বত গাত্রে পোঁতা হইয়াছে। খুঁটি দুইটির উপরিভাগে খাঁজ করা আছে। দুইটি মোটা ও লম্বা দড়ী পর্ব্বত পার্শ্বস্থ গাছে দৃঢ় রূপে বাঁধা হইয়াছে ও পূর্ব্বোক্ত খোঁটা দুইটির উপরকার খাঁজের মধ্য দিয়া তাহাদের অপর মুখ দুইটি নদীর অপর পারে টানিয়া লইয়া গিয়া তথায় অপর দুইটি খুঁটির উপর দিয়া পার্শ্বস্থ গাছে বাঁধা হইয়াছে। এই দড়ী দুইটি কোন পার্ব্বতীয় বৃক্ষের ছাল পাকাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই দুইটি দড়া হইতে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সরু দড়ী প্রায় ১।১॥০ ফিট তফাতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ও এই দড়ীগুলির নিম্নভাগে কতকগুলি সরু সরু ছোট ছোট কাঠ বাঁধা আছে, ও অপর একটি লম্বা দড়ী দিয়া কাঠ গুলি একটির সহিত অপরটি বাঁধা হইয়াছে। উপরের দুইটি মোটা দড়ী দুই হাতে ধরিয়া ও ঐ ছোট ছোট কাঠগুলির উপর পা রাখিয়া নদী পার হইতে হয়। দেখিলে বোধ হয় যেন আমাদের দেশের একটি মইকে (সিঁড়ি) শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর দিয়া চলা হইতেছে। তফাতের মধ্যে মইয়ের কাঠগুলি পা দিলে নড়ে না, এই কাঠগুলির এক পার্শ্বে পা

পড়িলে অপর পার্শ্বটি উঠিয়া পড়ে। এই কাঠগুলির ঠিক মধ্য স্থলে পা রাখিলে তবে কতকটা স্থির থাকে। এই পুলের নিকট যাইয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা হইল। উপরের মোটা দড়ী দুইটি দুই হস্তে ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচের কাঠগুলিতে পা রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সমস্ত পুলটি আমার ভারে দুলিতে লাগিল। প্রথমে মোটা দড়ী দুইটি দৃঢ়রূপে ধরিয়া হস্তের উপরই সমুদয় ভার রাখিয়া চলিলাম কিন্তু তাহাতে পুল বেশী দুলিতে লাগিল। পরে নীচের কাঠগুলির ঠিক মধ্য স্থলে পা দিয়া চলাতে হাতে আর বেশী জোর লাগিল না। কিন্তু যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম পুল তত বেশী নাচিতে লাগিল, আর নীচে জলের দিকে চাহিতেই গত কল্য কড়ির উপর দিয়া নদী পার হইবার সময় যেরূপ বোধ হইয়াছিল, সেইরূপ বোধ হইল, যেন পুল পায়ের নীচ হইতে স্রোতের বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। পুলের মাঝখান হইতেই ফিরিয়া সত্যেন ও ফণীর নিকট রাস্তায় উপস্থিত হইলাম ও সকলে মিলিয়া উত্তরকাশীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আজ কতকগুলি সমতল ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। তাহাতে রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী লাগিল। যে দিন টিহরী গিয়াছিলাম, সে দিন যেরূপ রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল, আজও সেইরূপ বোধ হইল।

প্রায় ৪ মাইল পথ এইরূপ ধান্য ক্ষেত্র ও সমতল প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়া চলিয়া আবার নদীর ধারের রাস্তা পাইলাম। কিন্তু আজ আর কোথাও ছায়া নাই। উত্তরকাশী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে, একটি ঝরণার পার্শ্বে, একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ কথঞ্চিৎ ছায়া প্রদান করিতেছিল, আমরা সেখানে আহারের জন্য থামিলাম। এই ঝরণার পরিষ্কার জলে আমিও ফনী স্নান করিলাম। যদিও রৌদ্রের জন্য বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল ও ঝরণার জলে অবগাহন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ঝরণার জল এত শীতল যে তাহাতে এমন কি হস্ত পদ ডোবাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলেই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল অবগাহন ত দূরের কথা। শৈলেন আজ আমাদের সঙ্গে আসে নাই ও এখানে না দাঁড়াইয়া একেবারে উত্তরকাশী চলিয়া গিয়াছিল। এইখানে সতীশ প্রেরিত একটি দূতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এই দূতটি ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক একটি গৌর বর্ণ ব্রাহ্মণ যুবক বা বালক। সে বলিল সতীশ প্রায় ৬ দিন হইল উত্তরকাশী আসিয়াছে ও কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আছে। সে উত্তরকাশীর পাণ্ডা। আমরা তাহার সহিত উত্তরকাশী চলিলাম। প্রায় ১॥০ মাইল পথ চলিবার পর উত্তরকাশী দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্ব কাশীতে গঙ্গার পুলের উপর হইতে এক অদ্ভুত দৃশ্য নয়ন পথে পতিত

হয়, অসংখ্য ঘাট, মন্দির ও সৌধমালা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া আছে, ও সর্ব্বোচ্চে বেণীমাধবের ধ্বজা হিন্দু ধর্ম্মের দুর্গ ভেদ করিবার বৃথা আয়াস করিয়া যেন হিন্দু মন্দির মধ্যে বন্দী স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ উত্তরকাশীতে সেরূপ মন্দির বা ঘাটের আস্ফালন কিছুই নাই তথাপি টিহরী ছাড়িবার পর এ পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী স্থান আর দেখি নাই। দূর হইতে অনেক গুলি মন্দিরের চূড়া, কতকগুলি ধর্ম্মশালা ও দুই একটি ঘাট দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বকাশীর ন্যায় গঙ্গা এখানে উত্তর বাহিনী হইয়া একটি বৃহৎ, প্রায় ১৷১॥০ বর্গ মাইল ব্যাপি, উপত্যকাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা। এই উত্তরকাশী পরশুরামের তপস্যার ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত। আমরা পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডার সহিত একটি ছোট দরয়াজার মধ্য দিয়া বাবা কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ধর্ম্মশালাটি বেশ বড় মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকে দ্বিতল কাষ্ঠের নির্ম্মিত গৃহ। পশ্চিম দিকের দ্বিতল বারাণ্ডায় গিয়া দেখি সতীশ ও শৈলেন বসিয়া আছে। সতীশ বলিল "তোমরা যে যমুনোত্তরী দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে আমার সে আশা ছিলনা অতএব উত্তরকাশীতে আমি তোমাদের

শ্রাদ্ধ শান্তির যোগাড় করিতেছিলাম"। আমরাও সতীশকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ধরাস্থতে তাহাকে একেলা ছাড়িয়া গিয়া মন কিছু অস্থির ছিল। সতীশের সঙ্গে সাদর সম্ভাষণের পর একটি বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে আলাপ হইল। বয়স প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর, হৃষ্ট পুষ্ট প্রফুল্ল বদন। পরিচয়ে জানিলাম তিনি কলিকাতারই লোক ও শিক্ষিত, বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হিমালয়ে চলিয়া আসিয়াছেন, নাম স্বামী শ্যামানন্দ ভারতী। ইনি বাবা কম্বলীওয়ালার গঙ্গোত্তরীর ধর্ম্মশালার ম্যানেজার। তথাকার ধর্ম্মশালা বন্ধ হওয়াতে তিনি এখন টিহরী যাইতেছেন। পরে এখানকার ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ ভকতরাম ও সংস্কৃত স্কুলের অধ্যাপকের সহিত আলাপ হইল। এখানে আসিয়াই মুসূরীতে টাকার জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। চা পান করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বামীজির সঙ্গে আমরা উত্তরকাশীর মন্দির সকল দেখিতে বাহির হইলাম। স্থানটি যেন বাংলা দেশের একটি পল্লী-গ্রামের মত। রাস্তাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিটা ও প্রাঙ্গণের ধার দিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য রমণীরা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত আমাদের দেখিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের কারণ এস্থানে হ্যাট্ কোটধারী মূর্ত্তি বিরল ও নূতন। পথে

এখানকার ডেপুটির সহিত আলাপ হইল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার কার্য্যের বিচারের ভার তাঁহারই উপর। লোকটি অতি অমায়িক, দেখিতে অতি সুপুরুষ ও আচার ও ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র, ও সে ভদ্রতা খাঁটি, কেবল মুখের নয়। অল্প সময়ের আলাপেই লোকটিকে যেন আপনার বলিয়া বোধ হইল। তিনিও আমাদের সহিত মন্দির দেখিতে আসিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট দুইটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত আলাপ হইল। ইহারা রামকৃষ্ণ মিশনের লোক ছুটিতে সাধন ভজনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এরূপ স্থলে বাঙ্গালী পাইয়া এক কথায় আলাপ হইয়া গেল। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। আমরা যে সকল মন্দির দেখিলাম তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও পরশুরামের মন্দিরই প্রধান। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই অষ্টধাতু নির্ম্মিত একটি বৃহৎ ত্রিশূল মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে। ত্রিশূলটির চতুর্দ্দিকে একটি মন্দির নির্ম্মান করা হইয়াছে কিন্তু ত্রিশূল এত লম্বা যে ইহার ফলক মন্দিরের উপরিভাগে বাহির হইয়া আছে। ত্রিশূলটি প্রায় ২৫।৩০ ফিট উচ্চ হইবে, ইহার গায়ে পুরাতন ভাষায় লেখা রহিয়াছে। প্রবাদ মহিষাশূর বধের সময় দুর্গা এই ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের

লিঙ্গ মূর্ত্তি পূর্ব্বকাশীর মূর্ত্তি অপেক্ষা অনেক বড়। পরশুরামের মন্দিরটি দেখিলে অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া বোধহয়। পৃথিবী নিঃক্ষত্রীয় করিবার আগে পরশুরাম এইস্থলে বসিয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ। পূর্ব্বকাশীর ন্যায় এখানে অন্নপূর্ণারও এক মন্দির আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও নূতন জয়পুরের রাণীর প্রতিষ্ঠিত আম্বাজির মন্দির। কিন্তু স্বাভাবিক সুন্দর এইস্থানে মনুষ্যের কারু কার্য্য খচিত এই মন্দির যেন শোভা পাইতেছে না। এই সকল মন্দির দেখিতেই সূর্য্যদেব পাটে নামিলেন, ও আমরাও আমাদের নূতন বন্ধুবর্গে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। আমরা যে প্রশস্ত বারাণ্ডায় আশ্রয় লইয়াছিলাম তাহার নীচেই গঙ্গা ভীষণ বেগে প্রবাহিতা গঙ্গার অপর পারে কিছু দূরেই পর্ব্বত শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। স্বভাবের তখনকার শোভা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। নিপুন চিত্রকর বা কবি হইলে বোধহয় সে শোভার চিত্র আঁকিতে পারিতাম। শীঘ্রই সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া সে চিত্রকে ঢাকিয়া দিল। রামকৃষ্ণ মিশনের যুবকদ্বয় যদিও সন্ন্যাসী হইয়াছেন তথাপি ফুটবলের

কথা ভুলিতে পারেন নাই। শৈলেনের নিকট তাহারা ফুটবলের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মোহনবাগান ক্লব এবার ফুটবলে কিরূপ করিয়াছে, কটা গোরা বা বড় সাহেব ক্লবকে হারাইয়াছে, এই সব সংবাদ জানিতে তাহারা অত্যন্ত উৎসুক। এই দুই বাঙ্গালী যুবকের ফুটবলে আগ্রহ দেখিয়া, ফুটবল যে বাঙ্গালী বালক ও যুবকদের কত প্রিয় হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। এই দুই যুবক আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না, সে বিষয়ে তাহারা উদাসীন, কিন্তু ফুটবলের খবর জানিবার জন্য ব্যস্ত। এই যুবকদ্বয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাহারা হরিদ্বার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কার্য্য করেন এখন কিছুদিনের অবকাশ পাইয়া এখানে আসিয়াছেন। এখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন আশ্রমে থাকেন, ভিক্ষা দ্বারা জিবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাহাদের মুখে শুনিলাম এখানে ভিক্ষুকদের বড় আদর। দ্বারে ভিক্ষুক আসিলে গৃহস্বামী বা কর্ত্রী ভিক্ষা না দিয়া কোন কার্য্যই করেন না। ভিক্ষুকের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীই বেশী। ইহাঁরা দৈনিক আহারের জন্য এক বার ভিক্ষায় বাহির হন, আর গৃহস্থেরা যাহার যেরূপ সাধ্য, কেহবা এক মুঠা চাল, কেহবা দুইখানা রুটি দিয়া ভিক্ষুকের

সম্বর্দ্ধনা করেন। ভরপূর হইলেই ভিক্ষুক ভিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন। কলিকাতার মত এখানে পেসাদারী ভিক্ষুক নাই, সেই জন্য ভিক্ষুকের আদর আছে। বাঙ্গালী স্বামীজির নিকট হিমালয়ের অনেক গল্প শুনিলাম। সাধু মহাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, প্রত্যক্ষ কোন মহাত্মা দেখেন নাই, কিন্তু কোন গুহায় বাস কালে বালির উপর এক হস্ত পরিমিত মহাত্মার পদ চিহ্ন দেখিয়াছেন। আমাদের "গোড়র" ও হরিণ শিকারের গল্প স্বামিজীর নিকট করিলাম। স্বামিজী তাহাদের চর্ম্মগুলি দেখিয়া আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমরা গোড়রের চর্ম্মটি তাঁহাকে দিলাম। পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি বাবুর দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইলাম। তিনি আমাদের ১০৲ টাকার নোট গুলি বদলাইয়া তাঁহার ট্রেজারি হইতে নগদ টাকা দিলেন, ও আমাদের সহিত টাকা কম আছে শুনিয়া, কিছু টাকা আবশ্যক হইলে তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন। আমরা তাহার নিকট ৫০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম। তিনি বার বার বলিলেন "আরও বেশী যদি আবশ্যক হয় বলিতে দ্বিধা করিবেন না"। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমাণী কিন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ সৌজন্য ও পরোপকারের ইচ্ছা কোথায়। পশ্চাত্য শিক্ষার সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই

ইংরাজী কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা এক অক্ষর ও যিনি জানেন না, তিনি এক ঘণ্টার পরিচয়ে যত টাকা আবশ্যক আমাদিগকে দিতে প্রস্তুত হইলেন, এ সৌজন্য ইহাকে কে শিখাইল। আমাদের স্বদেশে ও স্বধর্ম্মেই তিনি এ শিক্ষা পাইয়াছেন। পাঠক একবার মনে ভাবিয়া দেখুন যে অবস্থায় এই ভদ্রলোক আমাদের টাকা ধার দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের স্বজাতী এমন কি আত্মীয় কুটুম্ব কয়জন সেইরূপ করিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার সৌজন্যে অতীব প্রীত হইয়া আমাদের নিকট যে হরিণের মাংস ছিল তাহার কিছু তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আগত বন্ধুরা সকলে বিদায় লইলে গঙ্গার উপরকার সেই বারাণ্ডায় আমাদের ক্যাম্প খাট বিছাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম। গঙ্গার অবিরত কলকল ধ্বনি আমাদের বিশ্রামের কোনরূপ ব্যাঘাত না করিয়া বরং সাহায্য করিল। উত্তমরূপ গাত্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া খোলা জায়গায় নিশা যাপন করাতে কোনরূপ অসুখ হইল না। আমার বিশ্বাস পাহাড়ের নির্ম্মল বায়ুতে খোলা যায়গায় উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হইয়া নিদ্রা যাইলে কোনরূপ অসুখ হয় না। এবার হিমালয় ভ্রমণকালে অধিকাংশ সময়ে রাত্রে আমরা এইরূপ বারাণ্ডায় বা দালানে শুইয়া রাত্র কাটাইয়াছি তাহাতে কোনরূপ অসুখ বা অসুবিধা বোধ করি নাই।

উত্তরকাশী হইতে মনেরী।

প্রায় ৯ মাইল।

১৬ই অক্টোবর ১৯১৪।

আজ সকালে উঠিয়া আমরা শীঘ্রই উত্তরকাশীর উপত্যকা ছাড়িয়া পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। পথে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে পাইলাম। প্রায় ১॥ মাইল পথ আসিবার পর পথি পার্শ্বস্থ টিহরী রাজার বাংলা দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম সেখানে একজন মিশনারী মেম থাকেন। উত্তরকাশী ছাড়িবার পর আমাদের রেলের টিকিটের সময় বাড়াইয়া ৮ মাসের রিটারন্ করিয়া লওয়া স্থির হইল। সেই মর্ম্মের ১ খানি চিঠি মুসূরীতে লিখিলাম। কিন্তু উত্তর কাশীর পর আর ডাক না থাকাতে ১ জন কুলী মারফত চিঠি সতীশের নিকট উত্তর কাশীতে পাঠাইয়া দিলাম, সেখান হইতে ডাক যোগে চিঠি মুসূরী যাইবে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি সতীশ আমাদের সঙ্গে না আসিয়া উত্তর কাশীতেই রহিয়া গেল। তাহার শরীর তখনও অপটু, পার্ব্বত্য পথের ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম, উত্তর কাশীতে থাকিবার ও কিছু অসুবিধা ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডা বালক তাহার সেবা করিত ও খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিত। সঙ্গীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি বাবু ছিলেন, থাকিবার স্থান ও অতি মনোরম, আমরাও সেই জন্য এবার আসিবার জন্য তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করি নাই। পূর্ব্বোক্ত বাংলার নিকট আসিবার পর উৎরাই আরম্ভ হইল। প্রায় ৫ মাইল আসিয়া রাস্তার ধারে একটি ঘরে একটি আলুর গুদাম দেখিলাম। ছোট ছোট চামড়ার ব্যাগে ছাগলের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া এখানে আলু আনা হয়। আজও এই ৫ মাইল পথের মধ্যে আমরা অনেক সমতল ক্ষেত্র পাইয়াছিলাম ও তাহাতে রৌদ্রের উত্তাপে কষ্ট হইয়াছিল। এই আলুর গুদামের নিকট বিশ্রামের জন্য থামা হইল। পথের ধারে আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় গঙ্গোত্তরীর দুই জন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা উত্তর কাশীতেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। পাণ্ডা দেখিলেই প্রথমে একটা বিরক্তির ভাব আসে, মনে হয় এখনই খাতা বাহির করিয়া বিরক্ত করিবে। কিন্তু ইহারা সেরূপ কিছু করিল না, সসম্ভ্রমে দূরে বসিয়া রহিল, আমরা কোন কথা বলিলে কেবল মাত্র তাহার জবাব দিল। আমি গঙ্গোত্তরীর মন্দির, পাণ্ডা, পূজারী ও পার্ব্বতীয় জাতীর

সম্বন্ধে তাহাদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল যে পাণ্ডারা ব্রাহ্মণ। টিহরীর কোন রাজা তাহাদের কোন পূর্ব্ব পুরুষকে গঙ্গোত্তরীর মন্দিরে পূজা করিবার জন্য ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্র হইতে পাহাড়ে লইয়া আসেন। সেই সময় হইতে তাহারা বংশানুক্রমে গঙ্গোত্তরীর মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখন পাণ্ডাদের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে ও পূজার পালা হইয়াছে। পাণ্ডারা সকলে, ধরালী নামক স্থানের নিকট, গঙ্গার অপর পারে, মুখুবা নামক এক গ্রামে থাকে। সেই গ্রামে গঙ্গার এক মন্দির আছে। শীতের সময় ছয় মাস গঙ্গা দেবীর মূর্ত্তি গঙ্গোত্তরী হইতে সেই স্থলেই আনিয়া রাখা হয়। যাত্রীদের নিকট তাহারা যাহা পায় তাহা ছাড়া ক্ষেত ও জঙ্গল হইতে কিছু আমদানী না হইলে তাহাদের চলে না। এই পাণ্ডাদের মধ্যে এক জনের পিতা প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত গঙ্গোত্তরীর মন্দিরের সুপারিণ্টেণ্ডেটের কিছু গোলমাল হওয়ায়, বর্ত্তমান উজীর, তাহার ক্ষমতা অনেক হ্রাস করিয়া, এক কমিটির উপর মন্দিরের ব্যবস্থার ভার দিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে সে অনেক কথা বলিল ও অভিযোগ করিল। সেখান হইতে আর ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা মনেরী পৌঁছিলাম। সেখানে

৩টি ধর্ম্মশালার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন আমরা সেইটিতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু ধর্ম্মশালার ঘর গুলি এত ছোট যে দালানেই রাত্রি যাপন করা স্থির হইল। ধর্ম্মশালার নিকটেই একটি দোকান আছে ও তাহার নীচে দিয়া এক বৃহৎ নদী গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। নদী ও পাহাড়ের দৃশ্যটি এস্থলে বড় মনোরম কিন্তু ধর্মশালাগুলি একতলা ও অপরিষ্কার। দোকানে কাঁচা চিনার বাদাম পাওয়া গেল। সেগুলি আমরা চিনির রসে ফেলিয়া মুগরিদানা প্রস্তুত করিলাম, তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু হইয়াছিল।

যমুনোত্তরী

মনেরী হইতে ভাটোয়ারী।

প্রায় ৯ মাইল।

১৭ই অক্টোবর ১৯১৪।

সকালে উঠিয়া দেখি আকাশে মেঘের ঘন ঘটা হইয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া কেহই চলিতে রাজি হইল না, কাজেই বৃষ্টি থামা পর্য্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখাই ঠিক হইল। কার্য্য না থাকিলেই অকার্য্যে মন যায়। আমাদের তাহাই হইল। "বয়" আসিয়া তৈজস পত্রাদি কিনিবার পয়সা চাহিতেই শৈলেন তাহার নিকট আমাদের খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে নানাবিধ হিসাব নিকাশ চাহিতে লাগিল। জেরাতে আসামী যে কতদূর কাবু হইয়াছিল বলা শক্ত কিন্তু জেরাকারীর মস্তিষ্ক যে কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, ও জেরাকারী ও বিচারক একই ব্যক্তি হওয়াতে ফলে যে সে দোষী সাব্যস্ত হইল তাহার আর বিচিত্র কি। যখন দেখিলাম তাহাকে অনেক গালি গালাজ করা হইয়াছে তখন আমি তাহার পক্ষে দুই চার কথা বলাতে মহা তর্ক বাঁধিয়া গেল। আমাদের "বয়টির" যে চুরি বিদ্যা একেবারে

ছিল না এরূপ নহে। কিন্তু সেটা বোধ হয় "বয়" মাত্রেরই স্বভাব। ধার্ম্মিক "বয়" বড় একটা দেখা যায় না। অন্ততঃ আমিত দেখি নাই। আর ইহাদের উপর বেশী কড়া হইলে ইহারা পেটে মারে। বেলা ১০টা, ১১টা নাগাদ বৃষ্টি থামিল। আমরাও মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া ভাটোয়ারী অভিমুখে চলিলাম। গোড়ার দিকে রাস্তায় বেশী চড়াই উৎরাই নাই। কিছু দূর গিয়া কতকগুলি জিপ্‌সির আড্ডা পাইলাম। পথের কিছু নীচে ছোট ছোট সমতল ক্ষেত্র দেখিয়া তাহাদের তাম্বু টাঙ্গাইয়াছে। এক একটি তাম্বুতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, কুকুর ইত্যাদি অনেক গুলি প্রাণী থাকে। ইহারা পার্ব্বতীয় ছাগলের লোম ও তাহাতে প্রস্তুত কম্বল ইত্যাদি বিক্রী করে। গ্রীষ্মকালে ইহারা পাহাড়ের আরও উচ্চ দেশে থাকে। ইহারা নিলংয়ের পথ দিয়া তিব্বৎ দেশে যায়। ইহাদের নিকট শিলাজতু ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় ঔষধ পাওয়া যায়। এই জিপ্‌সিদের বসতির নিকট পথের উপর কতকগুলি পার্ব্বতীয় টাট্টু ঘোড়া চরিতেছিল। ঘোড়াগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও দেখিতে সুন্দর, লোম বড় বড়। আর কিছু দূর গিয়া পথের ধারে একটি মাইল ষ্টোন দেখিতে পাইলাম। এই সকল মাইল ষ্টোন দেখিলে

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কতদূর আসা গিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। আমি যে মাইল স্টোনটি দেখিলাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে "গঙ্গোত্তরী ৪০ মাইল"। টিহরীর নিকট মাইল স্টোন গুলি বেশ পরে পরে যথা স্থানে বসান আছে, তাহাতে পথিকের অত্যন্ত সুবিধা হয়। এই মাইল স্টোন অনেক দিন পরে পাইলাম। মাইল স্টোন দেখিলে মনে একটা বেশ উৎসাহ হইত। তখনই মনে মনে একটা হিসাব হইয়া যাইত এত পথ চলিয়াছি ও এত বাকী আছে। মনেরী হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল চলিয়া আসিবার পর নদী গর্ভ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল ও দুই দিকের পাহাড় কাছাকাছি সরিয়া আসিল, মাঝে মাঝে পাহাড় ঝুঁকিয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে দেখা গেল। আমি আজ বেশ জোরেই চলিয়াছি। তখনও যেন ২।৩ মাইল চলিতে হইবে, এই রূপ আন্দাজে চলিয়াছি। হঠাৎ রাস্তার একটি বেঁক পার হইয়াই দেখি সম্মুখে একটি গ্রাম, তাহাতে একটি মন্দির ও কতকগুলি ঘর রহিয়াছে। ইহাই ভাটোয়ারী। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে এবং অনেক বেলা থাকিতে ভাটোয়ারীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে টিহরী রাজের বেশ একটি ভাল বাংলা আছে। তাহাতে দুইটি ঘর ও একটি বারাণ্ডা। বাংলাটি রাস্তার

ধারেই। রাস্তার অপর পারে কিঞ্চিৎ উচ্চে একটি মন্দির ও তাহারও কিছু উচ্চে পর্ব্বত গাত্রে গ্রাম। বাংলা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। আমি বাংলার বারাণ্ডায় বসিয়া অপর সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাংলার ঘর দুইটিতে চাবি বন্ধ ছিল। যাহার নিকট চাবি সে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। গ্রামস্থ বালক, বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত দূর হইতে আমাকে এক একবার দেখিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমার সহিত আলাপ সুরু করিল। বলিল বাংলা তাহারি প্রস্তুত, প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছে। লোকটি পাহাড়ী ও রাজমিস্ত্রি জাতীয়। সে মনের দুঃখে আমাকে জানাইল যে, "যদিও সাহেবদের জন্য এই বাংলা প্রস্তুত হইয়াছে দুঃখের বিষয় সাহেবরা আজকাল আর এদিকে আসেন না"। এই পাহাড়ী বিশ্বকর্ম্মাটির কথায় তত আমোদ হইল না। আরও কিছুক্ষণ পরে দলস্থ অপর সকলে একে একে উপস্থিত হইল। আজ কাহারও বেশী পরিশ্রম না হওয়াতে সকলেই মনের স্ফুর্ত্তিতে ছিল। রাত্রে একটা নূতন কিছু খাদ্য প্রস্তুত করা সাব্যস্ত হইল। একজন বলিল "মুগের ডাল আছে বড়া করা যাক"। বাড়ীতে মুগের কিম্বা ছোলার ডালের বড়া

যেরূপ ওজন হিসাবে সহজেই "পার" করা যায় তাহাতে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে তাহা প্রস্তুত করাও তাহা অপেক্ষা বেশী শক্ত নয়। কড়ায় তেল গরম করিয়া ছাড়িয়া দিলেই বড়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু প্রস্তুত করিতে গিয়া প্রায় অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া যাহা প্রস্তুত করা গেল তাহাকে যদিও আমরা বড়া বলিলাম কিন্তু তাহা ঠিক বড়া নয়। সেরূপ বড়া বাড়ীতে প্রস্তুত হইলে রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে ঘটি বাটি ছুঁড়িয়া মারিবার ইচ্ছা হয়। প্রথমেই দেখা গেল ডাল না ভিজাইলে তাহাকে পিষা যায় না। যদিও আমাদের ইচ্ছা ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে ডাল হইতে বড়া প্রস্তুত করিয়া রসনা তৃপ্তি করি কিন্তু কার্য্যে দেখা গেল অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জলে রাখিয়াও মুগ হেন এমন নরম ডাল, যাহা খাইয়াই বাঙ্গালীদের স্বভাব এত নরম, তাহাও ভাল নরম হইল না। তার পর দ্বিতীয় সমস্যা, ডাল পিষা হইবে কিরূপে। সঙ্গে শীল নোড়া ছিলনা। "বাঁশবনে ডোম কানা" গোছ, আমরা পাহাড়ের মধ্যে বসিয়াও শীল নোড়ার জোগাড় করিতে পারিলাম না। সঙ্গে "হামান দিস্তা" (কথাটি ঠিক লেখা হইল কিনা জানিনা) ছিল, একজন বলিল উহাতেই হইবে,

কিন্তু তাহাতে ডাল গুঁড়া হইয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। কিছু গবেশনার পর "চাকি ও বেলুনকে" শীল নোড়া রূপে ব্যবহার করাতে কার্য্য কতক সফল হইল। কিন্তু তাহাতে ডাল তত মিহি পেষা হইল না, ডালের দানা অনেক আস্ত রহিয়া গেল। এইরূপে পিষিতে সময়ও অনেক লাগিল। আর একজনের পরামর্শে তাহাতে কিছু আটা মিশান হইল। এখন সকলেরই বিশ্বাস হইল এবার বড়া নিশ্চই হইবে। বড়াও হইল, কিন্তু খাইতে গিয়া দেখা গেল যে তাহা বাহিরে শক্ত ও ভিতরে নরম ও কাঁচা। নেহাৎ অপ্রস্তুত হইব না বলিয়া, এইরূপ "বাহিরে মধুর ও অন্তরে গরল" গোছ দুই চারিটি বড়া অতৃপ্ত রসনাকে তৃপ্ত করিল, বা সত্য কথা বলিতে গেলে পোড়াইল, কেননা সেগুলি অত্যন্ত গরম অবস্থায় খাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এত পরিশ্রমের জিনিস হইলেও বড়া কেহ বিশেষ খাইতে চাহিল না। বড়া রাঁধিতেই রাত্রি অনেক হইল।

১৮ই অক্টোবর প্রাতে উঠিয়া দেখি বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে, ছাড়িবার বিশেষ লক্ষণ নাই। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও জিনিস পত্র ভিজাইয়া যাওয়া কাহারও মনোমত না হওয়াতে আজ ভাটোয়ারীতে থাকাই স্থির হইল। একদিন ছুটি পাইয়া

আজ রাঁধা, খাওয়া, বই পড়া, ছবি তোলা ইত্যাদি কার্যে দিন কাটান গেল। এখানে দেখিবার মধ্যে বাংলার নিকটেই শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ভাস্করেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির আছে। এই মন্দিরের একটি ছবি লইলাম।

ভাটোয়ারীর ভাস্করেশ্বর মহাদেবের মন্দির।



এই মহাদেব শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। তবে মন্দিরটি কোন সময় প্রস্তুত বলা কঠিন।

২১৬ পৃষ্ঠা।

ভাটোয়ারী হইতে গাঙ্গনানী।

প্রায় ৯ মাইল।

১৯শে অক্টোবর ১৯১৪।

একদিন বিশ্রামের পর আজ প্রাতে ৭।২০ মিনিটের সময় আমরা চলিতে সুরু করিলাম। পথের দৃশ্য প্রায় পূর্ব্ব দিনেরই মত। মাতা ভাগিরথী পর্ব্বত বক্ষঃ ভেদ করিয়া আপনার জন্য গভীর পথ প্রস্তুত করিয়া লইয়া খরস্রোতে প্রবাহিতা। দুই পার্শ্বস্থ পর্বিতের মধ্যে ব্যবধান অল্প। চলিতে আরম্ভ করিয়াই চড়াই পাওয়া গেল, তবে চড়াই বেশী কঠিন নয়। প্রায় তিন মাইল চড়াইয়ের পর রাস্তা নামিতে সুরু হইল। পাহাড়ের এই চড়াই উৎরাইয়ের কথা ভাবিলে এক এক সময় জীবন পথের কথা মনে হয়। দুই পথে অনেক সাদৃশ্য আছে। এক পথে যেমন চড়াই ও উৎরাই অপর পথে তেমনই দুঃখ ও সুখ। পাহাড়ে কিছুক্ষনের জন্য সমান ও ভাল পথ পাওয়া যায়, সেখানে চলিবার বিশেষ কষ্ট নাই, পায়ে ঠোক্কর লাগিবার ভয়ও কম। পাহাড়ের ভীষণ চড়াইও উৎরাইয়ের মধ্যে এই সব স্থান গুলিতে আসিলে কিছুক্ষণের জন্য অনায়াসে চলা যায়।

জীবন পথেও দুঃখও সুখের মধ্যে এক একটি সময় উপস্থিত হয় যখন জীবনটি "আপ্‌সে চলা যাতা হ্যায়" বলা যাইতে পারে। সে সময় দুঃখ কিম্বা সুখ কোনটিই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সেইগুলিই বোধ হয় জীবন পথের সমতল অংশ। গঙ্গোত্তরীর পথের উদ্দেশ্য এই স্রোতঃস্বতী পূতসলিলা, প্রাণ ও ধনধান্যদায়িনী সাগর বাহিনী নদীর স্নিগ্ধ ধবল তুষার মণ্ডিত উৎপত্তি স্থান দেখা। জীবন পথের উদ্দেশ্য ও কি তাহাই নয়? হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে গেলে জীবনের যেথা হইতে উৎপত্তি তাহাতে বিলীন। কেহ হয়ত বলিবে, "গঙ্গোত্তরীর পথের সন্ধ্যান পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায়, কেননা অনেকেই সে পথে গিয়াছে। জীবন পথের সন্ধ্যান কে বলিবে, এ পথে আগে যাহারা গিয়াছে তাহারা আর ফিরে নাই"। সে কথা সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস চেস্টা করিলে এ পথেরও কিছু কিছু সন্ধ্যান পাওয়া যাইতে পারে। যাহোক এখন জীবন পথের কথা ছাড়িয়া গঙ্গোত্তরীর পথের কথাই বলি। পথটি নামিতে সুরু হইল বলিয়াছি। প্রায় এক মাইলের কিছু বেশী যাইবার পর একেবারে নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। এখানে নদীর উপর লোহার মোটা তারে ঝুলান একটি সুন্দর পুল। পুলের চলিবার স্থানটি কাঠের তক্তায় প্রস্তুত, প্রায় ছয় সাত ফিট চওড়া ও দুই

ভাটোয়ারী ও গাঙ্‌নানীর মধ্যে লৌহ রজ্জুদ্বারা ঝুলান পুল।



এপথে এইরূপ চারিটি পুল আমরা দেখিয়াছিলাম। এই স্থানের দৃশ্যটি অতি মনোরম।

২১৮ পৃষ্ঠা]

পার্শ্বে রেলিং দেওয়া। পুলের মধ্যস্থলে গেলে যদিও সমস্ত পুলটি অল্প দুলিতে থাকে কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা বা ভয় হয় না। আমি এই পুলের একটি ছবি লইলাম। এই ছবিটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পুলের নিম্নস্থ সফেন নদী, অপর পারে দুই তিনটি পাথরের ঘর ও পর্ব্বত গাত্রে দেবদারু বৃক্ষের বন, এই সকলের অপূর্ব্ব সম্মিলনে এক মনোহর দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। পুল পার হইয়া নদীর পূর্ব্ব পারের রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর যাইবার পর একটি দেবদারু বৃক্ষে কতকগুলি বন্য পায়রা বসিয়া আছে দেখিতে পাইলাম, মনে হইল বন্দুকটি কাছে থাকিলে কিছু খাদ্যের জোগাড় হইত। গত কল্য বৃষ্টি হওয়ার জন্য আজ রাস্তা মাঝে মাঝে ভিজা রহিয়াছে। অনেক স্থলে ঝরণাগুলি উপরের পাহাড়ের গা হইতে আসিয়া রাস্তার উপর দিয়া নিচে নামিয়া গিয়াছে। এইরূপ ঝরণার জলের মধ্য দিয়া অনেক সময় যাইতে হইত। গঙ্গার পূর্ব্ব কূল দিয়া প্রায় দুই মাইল চলিবার পর একটি বড় ঝরণা দেখিয়া আহারের ব্যবস্থা করা গেল। স্নান ও আহারাদি করিয়া অল্প বিশ্রাম করিতে প্রায় ১।০ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আকাশেও মেঘ দেখা দিল। আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া গন্তব্য মুখে চলিলাম। প্রায় আধ মাইল চলিবার পর আর একটি পুল পাইলাম। এটিও

পূর্ব্বোক্ত পুলের মত, তবে লম্বায় কিছু বেশী। পুল পার হইয়া আমরা আবার গঙ্গার পশ্চিম কুলে আসিয়া দেখি রাস্তার উপর দুই হাত লম্বা এক মরা সাপ পড়িয়া আছে। এপথে এই প্রথম সাপ দেখিলাম। আমাদের অগ্রেকার কোন যাত্রী বা পাহাড়ী লোক প্রস্তরের আঘাতে সাপের মাথা থেঁতো করিয়া দিয়াছে। সাপের জাতি বিচারে আমি বিশেষ পারদর্শী না হইলেও ইহা যে আমাদের দেশের কেউটে কিম্বা গোখুরা সাপ নয় তাহা বুঝিতে পারিলাম। শিকারী ও কুলীরা বলিল যে উহা বিসাক্ত সর্প। রাস্তার উপর হইতে লাঠি দ্বারা নদীর পার্শ্বে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া সাপের মৃত দেহের আর কোনরূপ সংকার হইল না। গাঙ্গ্‌নানীর ধর্ম্মশালা এখান হইতে বড় অধিক দূর নয় শুনিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত আস্তে চলিলাম। এরূপ আস্তে চলিলে পথের কোথায় কি আছে দেখিবার সুবিধা হয়। কিন্তু যেদিন ১০।১১ মাইল দূরস্থিত ধর্ম্মশালায় যাওয়া হইত সেদিন কেবল পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জোরে চলা ছাড়া স্বভাবের শোভা দেখিবার অবকাশ বড় হইত না। গাঙ্গ্‌নানী ধর্ম্মশালার কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের গায়ে একটি ঝরণার মত দেখা গেল। যে স্থান দিয়া এ ঝরণার জল পড়িতেছে

তথাকার পর্ব্বত গাত্র হরিদ্রা রংয়ের বোধ হইল। দূর হইতে দেখিয়াই আমি ফণীকে বলিলাম "বোধ হয় উটি একটি গরম জলের ঝরণা, জলে গন্ধক থাকাতে পাহাড়ের গায়ে হলদে রং হইয়াছে"। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে আমি একজন বড় রাসায়নিক। তবে শুনিয়াছিলাম পর্ব্বতে উষ্ণ ঝরণা আছে। ঝরণার নিকট পর্ব্বত গাত্রের রং অত হরিদ্রা বর্ণের হওয়ায় আমি উক্তরূপ অনুমান করিয়াছিলাম। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে আমার মান রক্ষা করিল, বলিল "ওখানে একটি গরম জলের ঝরণা আছে, পাহাড়ী লোক বাত ও অন্যান্য অসুখের জন্য ঐ ঝরণার জল পান করিয়া উপকার পায়। টিহরী রাজ হইতে ঝরণায় যাইবার জন্য একটি কাঠের পুল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন কিন্তু তাহা বেমেরামত হওয়াতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা পুলটির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। জলের উপকারিতা শুনিয়া ইউরোপের জার্ম্মানি ও অন্যান্য স্থানের এইরূপ জলের উপকারিতার কথা মনে পড়িল। কত দেশ দেশান্তর হইতে লোক সেখানে সেই জল পান করিয়া রোগ বিমুক্ত হইতে যায়। আমাদের দেশে সবই আছে, কিন্তু আমরা ঘুমাইয়া আছি। নিজের দেশের বিষয় আমরা জানি না

জানিতে চেষ্টাও করি না। কালে হয়ত কোন বিদেশী এই জলই বোতলে ভরিয়া বিক্রয় করিয়া আমাদের নিকট হইতে পয়সা লইবে। আর কিছু দূর যাইতেই গাঙ্গ্নানীর দ্বিতল ধর্ম্মশালাটি দেখা গেল। ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইবার কিছু অগ্রে রাস্তার বাম দিকে একটি বড় ঝরণা পাইলাম। ঝরণার সমস্ত জল যেন লাফাইয়া ২৫।৩০ ফিট্ নিচে পাহাড়ের গায়ে পড়িতেছে এবং সেখান হইতে বৃষ্টির সহস্র ধারার ন্যায় জল পাহাড়ের পাদ দেশে পড়িতেছে। এইরূপ ভাবে জল পড়াতে পাহাড়ের তলদেশ অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিজিয়া যাইতেছে। গাঙ্গ্নানীতে দুইটি ধর্ম্মশালা আছে, একটি বড় ও একটি ছোট ও দ্বিতল। আমরা এই দ্বিতল ছোট ধর্ম্ম শালাটিতেই আশ্রয় লইলাম। বারাণ্ডাতেই শুইবার ব্যবস্থা হইল।

গাঙ্গ্‌নানী হইতে ঝালা।

প্রায় ১০½ মাইল।

২০শে অক্টোবর ১৯১৪ রবিবার।

আজিকার রাস্তায় এক বিষম চড়াই আছে শুনা গেল। কিন্তু চড়াই শুনিয়া এখন আর বেশী ভয় হয় না। তথাপি যখন শুনা গেল যে এক স্থানে দুই মাইল ক্রমাগত চড়াই তখন যত সকাল পারা যায় বাহির হওয়া স্থির হইল। এই শীতের দেশে ৭টার সময় প্রস্তুত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিতে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেও বিছানার আভরণের মধ্য হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা আদৌ থাকে না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত সেই বয় ও তাহার সহকারী আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইবার ঔষধ স্বরূপ গরম চা কিম্বা কফি বিছানার নিকট লইয়া গিয়া আমাদের ডাকিয়া দিত। যখন প্রথম ডাকিত তখন বয়ের উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ ভাব মনে উদয় হইত না। বরং যে সব সম্বোধনে তাহার কিম্বা তাহার ভগ্নীর সহিত নিকট সম্পর্ক বুঝায় তাহা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিবার প্রবল ইচ্ছা হইত। অবশেষে চা ঠাণ্ডা হইবার ভয়ে বিছানা ত্যাগ

করিতে হইত। বিছানা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অপর এক বিপদের কথা মনে করিয়া অশান্তি উপস্থিত হইত। ঠাণ্ডা বুটের মধ্যে পা প্রবেশ করাইবার জন্য মনকে অনেক শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইত ও অবশেষে একরূপ মরিয়া হইয়াই জুতা পরিতাম। যখন সেনাপতি যুদ্ধে সৈন্যদিগকে বেয়নেট্ লইয়া শত্রুকে আক্রমন করিতে আদেশ দেন তখন পদাতিকেরা বোধ হয় এই রূপ ভাবে মরিয়া হইয়া সেই আদেশ পালন করে। ঠাণ্ডা জুতা পরিবার পর ৫ মিনিটকাল যে কিরূপ বোধ হয় তাহা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস রোগীর যেরূপ অবস্থা হইলে ডাক্তারেরা তাহাকে মরফিয়া দিয়া ঘুম পাড়ান ইহা কতকটা সেইরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকালে উঠিয়া জিনিস পত্র বাঁধা ও গোছ গাছের জন্য এখন আর আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। কুলীরা আপন আপন মোট ও কোন মোটে কি কি মাল থাকে তাহা চিনিয়া লইয়াছিল। রোজ সকালে তাহারা আপন আপন মোট বাঁধিয়া লইত। আমরা সকালে উঠিয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইলে টাণ্ডেল কুলীদের দ্বারা জিনিস পত্র বাঁধাইয়া গোছাইয়া লইয়া আসিত। এখন যে যাহার কাজ বুঝিয়া লইয়াছিল। কুলীরাও আর পূর্ব্বের ন্যায় গোলমাল করিত না। আজ আমিই সর্ব্বাগ্রে

বাহির হইয়া অল্প পরেই গঙ্গার উপর তার দিয়া ঝোলান একটি পুল পার হইলাম। পথে এক দল ভার বাহি ভেড়া ও ছাগল দেখিলাম। এক একটি জানোয়ারের উপর চামড়ার দুইটি করিয়া থলি পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে ঝুলান আছে। থলি গুলি ছোট ছোট ও লবণ পূর্ণ। এক এক থলিতে আন্দাজ ২।২॥ সের লবণ ছিল। আমাদের অপরিচিত আকৃতি ও পোষাক দেখিয়া ছাগল ও ভেড়াগুলি প্রায় ভয় পাইয়া দৌড়িতে থাকিত ও তাহাদের স্বভাব অনুসারে একটি দৌড়াইলেই অপর গুলি তাহাকে ও পরস্পরকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত। কখন কখন দুই একটি অধিকতর ভীরু জন্তু পৃষ্ঠের বোঝা ফেলিয়া রাস্তা হইতে পাহাড়ের ধারে নামিয়া যাইত। প্রায় দুই মাইল চলিবার পর এক স্থানে দেখি যে রাস্তাটি প্রায় ৫০ গজ ধসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তার কোনও চিহ্ন মাত্রও নাই। এই সকল পাহাড়ী পথে এই এক বিপদ। বর্ষার পরে প্রায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ রাস্তা ধসিয়া যায়; তখন যে কোন উপায়ে পাহাড়ের গা বাহিয়া, আল্‌গা মাটির উপর দিয়া, পাহাড়ী লাঠি ও গাছের শিকড় ইত্যাদির সাহায্যে, পথিককে সেই স্থান পার হইতে হয়। আমাকেও এই স্থানে তাহাই করিতে হইল। এখানে দেখিলাম এক দল কাবুলী কুলী রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে। সঙ্গের শিকারী

ও অপর কুলীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এ দেশে কাবুলীরাই রাস্তা করে। এখানে রাস্তা করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে পাহাড় না কাটিয়া বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। এ দেশের পাহাড়ীরা বড় ভীতু। তাহারা বারুদ ব্যবহার করিতে সাহস পায় না। আর যে সকল কাবুলী কুলী দেখিলাম তাহারা এদেশের লোকেদের অপেক্ষা দ্বিগুন বলশালী বলিয়া বোধ হইল। তাহাদের বিশাল বক্ষঃ, সুদৃঢ় বাহু ও পদদ্বয় দেখিয়া মহাভারতের ক্ষত্রিয় বীরদের বর্ণনা যে একেবারে কবিব কল্পনা বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু এ সব মূর্ত্তি এ সব শরীর, আমাদের বাংলা দেশে জন্মায় না কেন? সেখানকার রুগ্ন, শুষ্ক, ক্ষীণ বক্ষঃ, অকাল বৃদ্ধ যুবকদের দেখিলে মনে হয় না যে আমাদের জাতি এইরূপ সবল জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় সমকক্ষ হইবে। দলের সকলেই একে একে সেই ভগ্ন স্থান পার হইল, তবে সত্যেন ও ফণীকে কুলীদের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তবে এই দুর্গম পথে সাহস করিয়া আসাতে আমি আমাদের অপেক্ষা তাহাদেরই অধিক বাহাদুরী মনে করি। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের শরীর এ পথের পরিশ্রমের পক্ষে অনুপযোগী। এ পথে চলিবার জন্য তাহাদের অনেক বিষয়ে অপরের উপর নির্ভর করিতে হইত। এ সকল অসুবিধা

সত্ত্বেও তাহারা সাহস করিয়া এত দূর আসিয়াছিল। যাহারা সাঁতার জানে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা সাঁতারে অনভিজ্ঞ তাহাদেরই ভেলার সাহায্য পাইলেও, নদী পার হওয়া অধিক সাহসের পরিচায়ক। এখান হইতে আরও এক মাইল পথ চলিয়া আমরা আর একটি ঝুলান পুলের উপর দিয়া আবার গঙ্গা পার হইলাম। এইটি লইয়া গত কল্য ও আজ, এই দুই দিনে, আমরা গঙ্গা চারিবার পার হইলাম। এ পুলটি পূর্ব্বোক্ত অপর তিনটি পুলের ন্যায়। এখানে স্বভাবের এক নূতন শোভা দেখিলাম. গঙ্গা পাহাড়ের বক্ষঃদেশ গভীরভাবে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পর্ব্বত দুহিতা আপনার ব্যবহারে যেন সঙ্কুচিতা হইয়া পাহাড়ের পদতলে পড়িয়া আছে, আর দুই দিকের পাহাড় যেন কন্যার ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চলভাবে পদ নিম্নস্থ জলস্রোতের দিকে দেখিতেছে। সোজা-সুজি হিমালয় বেড়ানর কাহিনী লিখিতে গিয়া অলঙ্কার ও উদাহরণের আড়ম্বর আসিয়া পড়িতেছে দেখিতেছি। যাহা হউক সে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়াই লিখিবার চেষ্টা করিব। দুই দিকের পাহাড় দুইটি সম রেখার ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৫০।৬০ ফিট্। দুই পাহাড়ের মধ্যে বহু নিম্নে নদী। আর দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া

বহুদূরে ও এক কি অদ্ভুৎ দৃশ্য দেখা যাইতেছে? একটি তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত শৃঙ্গ আর তাহার উপর নীলাকাশ। পাহাড়ের ও নদীর কত অঙ্কিত ছবি দেখিয়াছি। কিন্তু স্বভাবের দৃশ্যপটে আঁকা এ ছবির কাছে তার তুলনা হয় না। পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখিয়া বুঝা গেল আমরা অনেক উচ্চে উঠিয়াছি। এখান হইতে আরও দেড় মাইল পথ চলিবার পর একটা ক্ষুদ্র উপত্যকা ও কতকটা সমতল ভূমি দেখা গেল। এই স্থান মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী মনে করিয়া আমি একটি পাথরের উপর বসিয়া সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আজিকার হাওয়া অপর দিন অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা বোধ হইল ও পথের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর হইয়া শীঘ্রই শীত বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গীরা শীঘ্রই দেখা দিল। এখন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন মোটা আটার রুটি ও কুমড়ার তরকারীতে পরিণত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে জ্যাম অথবা জেলীর টিন এখন দুই একটা বাকি ছিল। ক্ষিধার ঝোঁকে রুটি ও কুমড়া খাইয়া শেষে এক চাম্‌চা জ্যাম কিম্বা জেলী দিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হইত। জ্যাম জেলী শেষ হইয়া গেলে এক কিম্বা দেড় চামচ চিনির দ্বারাই সেই কার্য্য শেষ করা যাইত। এখান হইতে পূর্ব্বোক্ত চড়াই আরম্ভ হইল। এখান হইতে সুকী গ্রাম

প্রায় দেড় মাইল, তাহা ছাড়াইয়া প্রায় আরও আধ মাইল চড়াই আছে। সুকী যাইবার দুই তিনটি পথ আছে। পাক ডাণ্ডি পথে না গিয়া সাধারণের যে পথ তাহা দিয়াই চলিলাম। শীঘ্রই চড়াই বেশ মালুম হইতে লাগিল। সেই পূর্ব্ব পরিচিত গড়ানে রাস্তা, একটি উঠিয়া বেঁক পার হইয়া আর একটি ও তারপর আর একটি। তবে আজ নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্য দিয়া না গিয়া, গ্রামের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, কখনও কখনও লোক জনের সহিত দেখা হইতে লাগিল। কোথাও বা পাহাড়ী স্ত্রী ও পুরুষ ছোট পর্ব্বত গাত্রস্থ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, আমাদের দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। এক স্থানে এক গাছের নিচে কতক-গুলি বালক বালিকা জমা হইয়াছে দেখা গেল। নিকটে আসিয়া দেখি সেটি একটি আখ্‌রোট্‌ গাছ। এক জন গাছে চড়িয়া গাছ নাড়া দিয়া আখ্‌রোট্‌ পাড়িতেছে ও অপর সকলে কুড়াইতেছে। আমরাও কিছু কুড়াইলাম। যে আখ্‌রোট্‌ গুলি পাকিয়াছে কেবল সেই গুলিই গাছ নাড়া দিলে পড়ে। আমাদের সঙ্গেকার কুলীরাও অনেক সংগ্রহ করিল। কিন্তু এ আখ্‌রোটের শাঁস কলিকাতায় আমরা যে আখ্‌রোট্‌ দেখি তাহার মত সহজে বাহির করা যায় না। প্রস্তর খণ্ডের বিষম আঘাতে ভাঙ্গিতে গিয়া অনেক সময়ে শাঁস ও খোল একত্রে চূর্ণ

হইয়া গেল, তাহা হইতে কিছুই পাওয়া গেল না। প্রথমে এই সুদূর পর্ব্বতে একটি পরিচিত ফল দেখিয়া যেরূপ আগ্রহ হইয়াছিল শীঘ্রই তাহা কমিয়া গেল। আখ্‌রোট্‌ গাছগুলি বেশ বড় বড় হয়। কোন কোনটি আমাদের দেশের বট ও অশ্বত্থ গাছের মত বড় হয়, ও এক একটি গাছে অজস্র ফল হয়। ফল গুলির কাঁচা অবস্থায় রং সবুজ, পাকিলে সাধারণতঃ আখ্‌রোট্‌ যে রকম দেখিতে সেই রং ও আকার ধারণ করে। আমাদের কুলীরা কিন্তু আমাদের মত অত শীঘ্র আখ্‌রোটের সখ মিটাইল না। সকলেই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া লইল, ও পথে যখনই বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইত তখনই আখ্‌রোট্‌ ভাঙ্গিয়া খাইতে ব্যস্ত হইত। শিকারী কষ্ট করিয়া কিছু আখ্‌রোট্‌ আমাদের জন্য ভাঙ্গিয়া আনিয়া দিল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা সুকী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাস্তাটি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিয়াছে। গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে নীচের রাস্তাটি ধরিয়া যাইতে হয়। আমরা উপরের রাস্তা দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে নিম্নে সমস্ত গ্রামটিকেই দেখিতে পাইলাম। গ্রামটি বড় ও বেশ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হইল। বাড়ী গুলি সব কাছাকাছি, বোধ হয় সমস্ত গ্রামটি সিকি বর্গ মাইলের বড় হইবে না। বাড়ীগুলি

সব কাষ্ঠের, অনেক গুলি দ্বিতল বা তাহা অপেক্ষা উচ্চ। বাড়ীর মাথা গুলি কতকটা বার্‌মিজ্‌ প্যাগোডার মত দেখিতে। গ্রামের এক দিকে একটা বড় চাতালের মত রহিয়াছে ও তাহাতে অনেক শস্য ঢালা রহিয়াছে। কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহার ঝাড়াই ভাঙ্গাই করিতেছে। গ্রাম ছাড়াইয়া প্রায় আরও সিকি মাইল উঠিবার পর আমি পর্ব্বতের শিখরদেশ পাইলাম। এই স্থান আন্দাজ ৭০০০।৭৫০০ কিম্বা তাহা অপেক্ষাও উচ্চ হইবে। গ্রামের মধ্য দিয়া আসিবার সময় আমরা গঙ্গার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম, কেননা পথটি গঙ্গার ধারে ধারে না গিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে আবার গঙ্গা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু এবার তাঁহার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন আর তিনি পাহাড়ের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া, বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকলকে আঘাত ও তাহাদের দ্বারা প্রত্যাহত না হইয়া, আমাদের দেশের গঙ্গার ন্যায় বিস্তৃত ও ধীর ও গম্ভীর ভাবে বহিতেছেন। আমরা পর্ব্বত চূড়ায় যে স্থল হইতে দেখিতে ছিলাম গঙ্গাবক্ষঃ তাহা হইতে বহু নিম্নে। এ স্থানে দাঁড়াইয়া আরও দেখিলাম চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত শৃঙ্গে তুষার পড়িয়া আছে। যে দিকেই দেখা যায় ধবল তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ সকল দেখা গেল। বোধ হইল এই শৃঙ্গগুলি আমাদের নিকট হইতে

বেশী দূর নয়। এই সময় অল্প অল্প বৃষ্টি পড়াতে তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গগুলিতে দেখিতে দেখিতে বরফ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত বরফ ছিল তাহা হইতে নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছাদিত হইতে দেখা গেল। এখান হইতে আমাদের যে রাস্তায় যাইতে হইবে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহা দেখা যাইতে লাগিল, পথটি ক্রমশঃ নামিয়া গিয়াছে। শিকারী এখান হইতে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঝালার বাংলা ঐ স্থানে," কিন্তু প্রায় দেড় মাইল উৎরাইয়ের পর ঝালার বাংলা পাওয়া গেল। বাংলাটি অতি ক্ষুদ্র একটি মাত্র ঘর। আমরা ৪ জনে কোন মতে সেই ঘরে আপনাদিগকে আঁটাইয়া লইলাম। এখানে আমরা পাঁচ টাকা দিয়া একটি ভেড়া খরিদ করিলাম। ভেড়াটির ঠ্যাং গুলি পাথেয় বা পথের খোরাক হিসাবে রাখিয়া, বাকি অংশ বয়কে রাঁধিবার হুকুম দিয়া, আমরা আজ মহা আনন্দে ও উৎসাহে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। বয় রন্ধনে ক্ষিপ্রহস্ত। কাঁচা হউক রাঁধা হউক শীঘ্রই খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিত। আজ কিন্তু তাহার রন্ধনে যথেষ্ট বিলম্ব হইতে লাগিল। হইতে পারে আমরাই কিছু অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম। একে পাহাড়ী রাস্তায় উঠা নামায় নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হইয়া যাইবার যোগাড় হয় তাহাতে অনেক দিন পরে কুমড়ার

তরকারির বদলে মেষ মাংস আস্বাদনের লোভে আমরা যে কিছু অস্থির হইব তাহা আর বিচিত্র কি। অবশেষে যখন বয় মেষ মাংস আনিয়া সম্মুখে ধরিল তখন চিড়িয়াখানার ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমরা তাহা আক্রমণ করিলাম, কিন্তু শীঘ্রই সেই বন্য জন্তুর তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় দন্তের অভাব বুঝিতে পারিলাম। আমাদের দুর্ব্বল মনুষ্য দন্ত অনেক চেষ্টার পর হাড় হইতে কিছু কিছু মাংস ছাড়াইতে সক্ষম হইল। ক্ষিধার ঝোঁক কিছু কমিয়া আসিবার পর মেষ পালকের উদ্দেশ্যে আমরা তত মিষ্ট ভাষা বলিলাম না। অনেক দুঃখে আমরা এই সিধ্যান্তে উপস্থিত হইলাম যে মেষ পালকটি তাহার একটি প্রাচীন ও অকর্ম্মণ্য ভেড়া দিয়া আমাদের উপর "বাণিজ্য" করিয়াছে। তবে কচি হউক বা বুড়াই হউক মেষ মাংস উপেক্ষা করিবার অবস্থা আমাদের ছিল না। সেই জন্য পথের জন্য মেষের চতুঃষ্পদ বয়কে সঙ্গে লইতে বলা হইল।

যমুনোত্তরী

ঝালা হইতে জাংলা।

প্রায় ৯ মাইল।

——০——

২১শে অক্টোবর ১৯১৪।

আজ বেলা ৮টার সময় চলিতে সুরু করিলাম। আজ পথে হরশিলের বাংলা পাওয়া যাইবে। এই হরশিলের কথা টিহরীর চৌকিদারের মুখে শুনা গিয়াছিল। আর এখানকার আপেল গাছের কথাও অনেকবার শুনিয়াছি। দিনের বেলা সূর্য্যের উত্তাপে পূর্ব্বোক্ত চৌকিদার কথিত শীতত অনুভব করা যাইবে না, অতএব হরশিলের আপেল দেখিবার আগ্রহ লইয়াই বাহির হওয়া গেল। আরও আধ মাইল উৎরাইয়ের পর আমরা একটি বড় নদীর গর্ভে নামিলাম। নদী গর্ভ বেশ প্রশস্ত, প্রায় ৩০০ হাতের ও উপর, কিন্তু শুষ্ক। নদীটি এখন অতি ক্ষীণ কলেবর লইয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। এই ক্ষীণ কলেবর নদী একটি কাঠের পুলের দ্বারা পার হইয়া আমরা অপর পারে উঠিলাম। রাস্তা শীঘ্রই ঘুরিয়া আবার গঙ্গার ধারে ধারে চলিল। কিছু দূর গিয়া আমরা এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানকার ভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত সমতল, ও তাহাতে চতুর্দ্দিকে বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষ

সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ। প্রান্তরের একদিকে পর্ব্বত মালা এবং অপর দিকে গঙ্গা, কিন্তু পথ হইতে নদী ঠিক দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। এই প্রান্তরে আসিয়া দেখি অনেক জিপ্‌সি আসিয়া তাম্বু ফেলিয়াছে। এত জিপ্‌সি তাম্বু আগে কখনও একত্রে দেখি নাই। ইহাদের তাম্বুর নিকট এক প্রকার বড় বড় কাল কুকুর দেখিলাম। এই কুকুরগুলি প্রায় সেণ্টবার্‌নার্ডস্ কিম্বা গ্রেটডেন জাতীয় কুকুরের ন্যায় বড়, কিন্তু দেখিতে অন্য রূপ। অনেক জিপ্‌সি স্ত্রীলোক পর্ব্বতের পার্শ্বে ঝরণায় কাপড় কাচিতে ছিল। পাহাড়ে কেহ কাপড় আছড়াইয়া কাচে না। কাপড় ভিজাইয়া একটি মোটা কাষ্ঠের দ্বারা তাহাকে পিটিতে থাকে। জিপ্‌সি-দের তাম্বু পার হইয়া, ঝালা হইতে প্রায় ৩ মাইল পথ আসিয়া, আমরা হরশিলের বাংলা পাইলাম। আমি কল্পণায় বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিলাম আসলটি তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল, মোটা কাঠের তক্তায় প্রস্তুত একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী। রাস্তার ধারে কতকগুলি ঘরে দোকান ও অপর লোকজন রহিয়াছে। একটি ঘরের সম্মুখে বসিয়া একটি জিপ্‌সি রমণী কম্বল বুনিতেছিল ও তাহার সম্মুখে বসিয়া সেই জাতীয় একটি ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে চরকাতে সেই কম্বলের সুতা জড়াইতে-

ছিল। মেয়েটি সুন্দরী, দেখিলেই চক্ষু আকৃষ্ট হয়। তাহার রং "দুধে আল্‌তায়" বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। নাক চোকও ভুটিয়া বা অন্য মোঙ্গোলিয়ান জাতীয় ন্যায় অত থ্যাঁদা বা টানা নয় ও তাহার কেশদাম প্রচুর ও আলুলায়িত থাকাতে পৃষ্ঠ দেশ ব্যাপিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা উপস্থিত হইতেই কিছু গোলমাল পড়িয়া গেল। সকলেই কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া আমাদেরই দেখিতে লাগিল। আমরাও এই স্থলেই আমাদের ভোজন ও বিশ্রামের স্থান স্থির করিলাম। শৈলেন সেই ভুটিয়া রমণীর নিকট একটি কম্বল কিনিবার প্রস্তাব করিল। আমরা ইতিমধ্যে একটি ছোট দরজার মধ্য দিয়া আঙ্গিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ভিতরে আসিয়া দেখি একটি প্রশস্ত উঠান ও তাহার চতুর্দ্দিকে চকমিলান বাংলা। উঠানের মধ্যস্থলে শস্য রাখিবার গোলার ন্যায় দুইটি গোলা রহিয়াছে, দুই একটি জাঁতাও বোধ হয় দেখিয়া থাকিব। আমরা আপেল বৃক্ষ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় উঠানের দক্ষিণ দিকের এক পথ দিয়া বাংলা রক্ষক আমাদিগকে বাগানের দিকে লইয়া গেল। এখানে আসিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। একটি ছোট বাগান ও তাহাতে প্রায় ১০।১২টি বড় আপেল গাছ ও ৮।৯টি বড় পেয়ারা গাছ রহিয়াছে। এই গাছগুলি কিন্তু

আপেল ও পেয়ারে পরিপূর্ণ। গাছের ডাল গুলি ফলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছে। আর সে ফলেরই বা কি শোভা, বড় ছোট মাঝারী নানান রকমের ফল। কতকগুলি অর্দ্ধ পক্ক, কতকগুলি প্রায় পক্ক, কিন্তু সকলগুলিতেই পক্ক আপেলের লাল আভা দেখা দিয়াছে। সেই লালেতে সাদাতে সবজিতে মিলিয়া যে এক সুন্দর রং ফলিয়াছে তাহা আমার বর্ণনা করা সাধ্য নয়। আমাদের এ দেশে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই গাছে এরূপ আপেল দেখা ঘটে, কেননা এক হিমালয় ছাড়া আর এরূপ ভাবে আপেল কোথাও হয় না। আমরা প্রথমতঃ বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। তারপর শুনিলাম যে রসনা তৃপ্তি করিবারও সুবিধা আছে। বাগানের মালী আমাদের নিকট আসিয়া বলিল আপেল ও পেয়ার বিক্রীর হুকুম আছে, আপেল ।০ আনা ও পেয়ার ৵০ আনা সের। আপেল ও পেয়ারের মূল্য যাহা আমরা দিব টিহরী সরকারে তাহা জমা করিতে হইবে। টাকা কোথাও জমা হয় কিনা সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া আমরা তাহাকে ৷৷০ আনার পেয়ার ও ১৲ টাকার আপেল নির্দ্দিষ্ট গাছ হইতে আনিতে বলিলাম। ইচ্ছা সমস্তই লইয়া যাই কিন্তু গঙ্গোত্তরীর পথে বেশী বোঝা বাড়াইয়া লাভ নাই, কুলীরা গণ্ডোগোল করিবে। মালী

শীঘ্রই ৪।৫টি আপেল অগ্রে আমাদের খাইবার জন্য আনিয়া দিল। ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত জিপ্‌সি তাহাদের একটি পুরুষকে সঙ্গে করিয়া, ৪।৫টি কম্বল লইয়া, উপস্থিত হইল। আমরা আপেল চর্ব্বণ করিতে করিতে কম্বলের দাম করিতে লাগিলাম। অনেক কসা মাজার পর ১১৲ টাকা দিয়া শৈলেন এক বৃহৎ কম্বল কিনিল। কম্বলটি দেখিতে সুন্দর নরম ও মোটা। বোধ হয় গায়ে দিলে উত্তর মেরুর শীতও ভাঙ্গে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদির পর আমরা অগ্রসর হইলাম। শীঘ্রই এক পুল পার হইয়া নদীর অপর পারের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। এ রাস্তা বেশ ভাল, অর্থাৎ বেশী চড়াই উৎরাই নাই, তা ছাড়া রাস্তায় নুড়ী ও ভাঙ্গা পাথর ও কম। হরশীল হইতে দুই বা আড়াই মাইল পরে ধরালী নামক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটি রাস্তা হইতে কিছু উচ্চে পাহাড়ের গায়ে আমরা গ্রামে না প্রবেশ করিয়া গঙ্গার দিকে গেলাম। গঙ্গার কিনারায় দুইটি ছোট ছোট পাথরের শিব মন্দির রহিয়াছে। পাথর গুলি একটির উপর আর একটি যেন বসাইয়া রাখা হইয়াছে কোন মসলা দিয়া গাঁথিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মন্দির দুইটি একটি ছোট আঙ্গিনার মধ্যে রহিয়াছে। আঙ্গিনার চারি দিকে প্রস্তরের প্রাচীর। মন্দিরের দ্বার গুলি এত ছোট

ও নীচু যে তাহার মধ্যে কি আছে কিছুই দেখা গেল না, তবে মন্দিরে ত্রিশূল দেখিয়া শিবের মন্দির জানা গেল। আঙ্গিনা হইতে গঙ্গার দিকে বাহির হইবার একটি ফটকের মত আছে ও তাহার মধ্য স্থলে একটি ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। আমরা আসিতেই একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল শিকারী সাহেবদের সঙ্গে সে আইবেকস্ বা বড় বড় ঘোরাল শিংওলা ছাগল শিকার করিতে যায়। এই সব ছাগল পাহাড়ের চুড়ায় বরফের উপর থাকে। আমরা তাহার সহিত কথা বলিতেছি এমন সময় গেরুয়াধারী, ক্ষীণকায়, আরক্ত চক্ষু, একটি সাধু আমাদের নিকট আসিল। চক্ষু দেখিয়া বোধ হয় সাধুটি গঞ্জিকা সেবনে ভক্ত। তাহার সহিত কথায় জানা গেল সে বাঙ্গালী। কলিকাতা কালীঘাটের হালদারদের বাড়ীর ছেলে। প্রায় ৩৫ বৎসর হইল দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে। এই ৩৫ বৎসর এই হিমালয়েই বাস করিতেছে, হরিদ্বারের নীচে নামে নাই। বাংলা কথা কিছু ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে, ঠিক বলিতে পারে না। হিন্দিতেই কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। কথায় বার্ত্তায় সাধুটি ঈশ্বর অপেক্ষা গঞ্জিকাতেই অধিক ভক্ত বলিয়া বোধ হইল। তবে অল্প সময় কথা বার্ত্তা শুনিয়া ভিতরের ভাব স্পষ্ট বোঝা

শক্ত। আমি মন্দির দুইটির একটি ছবি লইলাম। এখানেও নদীর গর্ভ বেশ প্রশস্ত ও তাহাতে কেবল ছোট ছোট নুড়ী পড়িয়া আছে। জল কিনারা হইতে কিছু দূরে। নদীর অপর পারে পর্ব্বতের উপর একটি বড় গ্রাম অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল। সেটি গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদের গ্রাম, নাম মুখুবা মঠ বা মুখুবা গ্রাম। যমুনোত্তরীতে পাণ্ডারা যেমন খরশালী নামক গ্রামে থাকে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডারাও সেই রূপ এই গ্রামে থাকে। শীতের সময় গঙ্গোত্তরীর মন্দিরের বিগ্রহ সকলকেও এই গ্রামে আনিয়া রাখা হয়, গঙ্গোত্তরীর মন্দির বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে দুই জন পাণ্ডা উত্তর-কাশী হইতে আমাদের সঙ্গে আসিতে ছিল উহাদের ও বাড়ী ঐ গ্রামে। ইহাদের আমরা ঠিক পাণ্ডা নিযুক্ত করি নাই, তবে তীর্থ স্থানে পাণ্ডারা প্রায়ই আপনিই আসিয়া নিযুক্ত হয়, নিযুক্ত করিতে হয় না। তবে এই পাণ্ডা দুটি বড় নিরীহ ও কাশী বা অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডাদের ন্যায় টাকার জন্য ব্যস্ত করে নাই ও পরে গো মুখের পথে উহাদের দ্বারা অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়া ছিল। উহারা এখানে আমাদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী গেল, বলিল গোমুখ যাইবার জন্য বাড়ী হইতে মোটা কাপড় লইয়া আবার কাল আমাদের সহিত মিলিবে। গঙ্গা-

ঝালা হইতে জাংলার মধ্যে দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত গঙ্গার সঙ্কুচিত মূর্ত্তি।



দুইদিকের উচ্চ পর্ব্বত ভেদ করিয়া ভাগীরথী ভীষণ বেগে প্রবাহিতা। এই পথে গঙ্গার এইরূপ মূর্ত্তি অনেক সময় দেখিয়াছিলাম।

২৪১ পৃষ্ঠা]

স্নানের পর মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া কিছু বিশ্রামের পর আমরা আবার চলিবার উদ্‌যোগ করিলাম। যাইবার আগে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি আবার আসিল। আমরা বোধ হয় তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা স্বরূপ দিয়া ছিলাম। এখান হইতে আমরা অতি উত্তম রাস্তা পাইলাম। ইহাতে চড়াই উৎরাই নাই বলিলেই হয় ও ভগ্ন প্রস্তর না থাকাতে একেবারে দেশের রাস্তার মত প্লেন। এরূপ রাস্তা পাইলে আমাদের তখনকার মত অবস্থায় ও সেইরূপ শীত ও নির্ম্মল হাওয়ায় দেশে রোজ ২০।২২ মাইল চলিতেও বিশেষ কষ্ট হইত না। বাল্যকালে পড়িবার সময় কোন পুস্তকের কঠিন অংশ মুখস্থ ও আয়ত্ত করিবার পর অতি সরল অংশ পাইলে যেরূপ আনন্দ হয় এই দুর্গম পথের দুরুহ রাস্তার পর আজ ভাল রাস্তা পাইয়া সেইরূপ কতকটা বোধ হইল। প্রায় ৩ মাইল চলিবার পর নদীর দুই দিকের পাহাড় আবার সরিয়া নদীর নিকট আসিল তাহাতে নদী গর্ভও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অপ্রশস্ত হইল। গঙ্গার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ও মুর্ত্তীই এ পথের একটি দেখিবার জিনিস। আরও আধ মাইল পথ চলিবার পর আমরা জাংলার বাংলার নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার গঙ্গা পার হইলাম। গঙ্গার পুলটি এখানে বেশী বড় নয় বোধ হয় ৩৫।৪০ ফিটের

বেশী হইবে না। গঙ্গা এখানে বহু নিম্নে যেন দুইটি সম অন্তরাল প্রস্তরের প্রাচীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। পুল পার হইয়াই রাস্তাটি যেন একেবারে সোজা ভাবে উঠিয়া বাংলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। যাহা হোক অভিষ্ট বস্তু যখন এত নিকট তখন এ শেষ চড়াই টুকু উঠিতে আর বিশেষ কষ্ট হইল না। উপরে উঠিয়া একটি সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাংলা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত হইলাম। এটি হরশীলের বাংলার মতন প্রস্তুত কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাতে দুইটি বড় বড় ঘর ও একটি ছোট ঘর আছে। ঘর গুলির দেওয়াল ও মেঝে সমস্তই কাঠের এ অঞ্চলের ধর্ম্মশালার ন্যায় গোবর মাটি লেপা নয়। বড় ঘর দুটিতে এক একটি বড় আগুণ জালিবার জায়গা রহিয়াছে। ঘর দুইটি বেশ উচ্চ ও পরিষ্কার। এ স্থানে এরূপ বাংলা পাইয়া দুই এক দিন থাকিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমাদের সময় অতি সংক্ষেপ কাজেই থাকা হইল না। বাংলার পশ্চাতে কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি গুহার মত আছে। সেখানে মানুষ থাকিতে পারে। আমাদের কুলীরা সেই সব গুহা অধিকার করিল। কুলীদের মধ্যে একজন একটি তুষারাবৃত পর্ব্বতের চূড়া দেখাইয়া বলিল যে "ঐ গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের চুড়া উহারই তলদেশ হইতে গঙ্গা বাহির হইয়াছে"।

তখন অবাক হইয়া কতক্ষণ সেই পর্ব্বতের চুড়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু পরে গঙ্গোত্তরীর যে চুড়া দেখিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হয় কুলীটি আমাদিগকে একটি ভুল পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখাইয়া ছিল।

যমুনোত্তরী

জাংলা হইতে গঙ্গোত্তরী।

প্রায় ৮ মাইল।

—o—

২২শে অক্টোবর ১৯১৪।

আজ আমাদের যাত্রার শেষ পালা, আজ অভিষ্ট বস্তু লাভ হইবে। যে গঙ্গোত্তরী দেখিবার জন্য এত চেষ্টা সাজ সরঞ্জাম ও কষ্ট স্বীকার আজ তাহা সফল হইবে। আজ সকলেরই মুখে আনন্দ ও আগ্রহের চিহ্ন। কেবলমাত্র ৮ মাইল পথ বলিয়া আজ আর পথে বিশ্রাম না করিয়া একেবারে গঙ্গোত্তরীতে গিয়াই বিশ্রাম করা স্থির হইল। কুলীদের মুখেও আজ আনন্দের চিহ্ন। তাহারা সকলেই হিন্দু। তাহাদের মধ্যে দুই চার জন গঙ্গোত্তরী আসিয়াছে, অপর সকলে কখনও আইসে নাই। কেবল তীর্থ করিবার জন্য বিনা রোজগারে এতদূর আসা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ দেখিবার স্থবিধা হওয়াতে তাহারাও আজ মহা উৎফুল্ল। আজ আমরা বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর আসিয়া দুইটি পথ দেখা গেল। যেটি নীচের দিকে গিয়াছে সেই গঙ্গোত্তরীর পথ অপরটি নীলং

হইয়া তিব্ব্যতে গিয়াছে। নীলং এই স্থান হইতে প্রায় কুড়ি মাইল। পাহাড়ীরা এই পথেই তিব্ব্যৎ বাসীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়। আজিকার পথে আমাদিগকে ভৈরব ঘাটির বিষম চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই চড়াইয়ের কথা অমরা প্রথম হইতেই শুনিতেছি। পাহাড়ীরা কোন শক্ত চড়াইয়ের কথা বলিতে হইলেই "ভৈরোঁ ঘাটির" উপমা দেয়। আমরাও ক্রমাগত ভৈরব ঘাটির চড়াইয়ের কথা শুনিয়া মনে মনে তাহাকে একটা বিষম দুরারুহ জিনিস বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছি। প্রায় ২॥০ মাইল পথ আসিবার পর আমরা একটি বড় নদী পাইলাম। এই নদী গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছে। শুনিলাম সেই নদী নীলংয়ের দিক হইতে আসিতেছে। সেই নদী একটি কাঠের পুলের দ্বারা পার হইলাম। অনেক উচ্চে এই নদীর উপর লোহার তারে ঝুলান একটি পুল ছিল। তাহার চিহ্ন স্বরূপ, বহু উচ্চে, এক পর্ব্বত হইতে অপর পর্ব্বত পর্য্যন্ত লম্ববান, লৌহ রজ্জু দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু পুলটি এখন বে মেরামত ও ব্যবহারের অযোগ্য। উপরের ঐ পুলটির নামই ভৈরব ঝুলা। লছমন্ ঝুলার ন্যায় এই পুল সম্বন্ধেও গল্প প্রচলিত আছে যে অনেক যাত্রী এই ঝোলা পার হইবার সময় পড়িয়া মরিয়াছে। উপরের রাস্তা দিয়া গেলে এই

পুলের উপর দিয়া যাইতে হইত। নীচের রাস্তা অপেক্ষা উপরের রাস্তা দিয়া গেলে কিছু কম হাঁটিতে হয়। এখন কিন্তু গঙ্গোত্তরী যাইবার একই রাস্তা। পূর্ব্বোক্ত কাঠের পুল পার হইয়া কিছু দূর যাইবার পরই ভৈরব ঘাটির চড়াই সুরু হইল। এ পথের সকল চড়াই যেমন এও সেইরূপ তবে রাস্তা গুলি অপর চড়াই অপেক্ষা অনেক খাড়াভাবে উঠিয়াছে, তাহার কারণ অল্প স্থানের মধ্যে একটি পাহাড়ের গা বহিয়া রাস্তা অনেক নিম্ন হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। চড়াই অনুমান ২০০০।২৫০০০ ফিট, পথ প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল। রাস্তা গুলি এত গড়ানে যে উঠিবার সময় সম্মুখদিকে বেশ ঝুকিয়া উঠিতে হয়। এক স্থানে রাস্তার পাশ দিয়া একটি ছোট ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। যেখান দিয়া ঝরণার জল যাইতেছে সেখানকার মাটির গেরুয়া রং। জল কিছু মুখে দিয়া বোদা লাগিল। উহাতে গন্ধক কিম্বা অন্য কোন ক্ষণিজ পদার্থ আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আজও আমি সর্ব্বাগ্রে একেলাই চলিয়াছি, চড়াইয়ের একটি দুইটি বেঁক উঠিয়া কিছু দম লইয়া আবার চলিয়াছি। ভৈরব ঘাটিকে জয় করিবার উদ্দেশেই যেন বদ্ধ পরিকর হইয়া চলিয়াছি। মনে বল ও সাহসের অভাব নাই, পদদ্বয় যেন লঘু বোধ হইতেছে, শরীরও সবল ও পটু।

জানিনা জীবন পথের ভৈরব ঘাটি পার হইবার সময় শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এরূপ থাকিবে কিনা। কিছুক্ষণ উঠিবার পর দুই একটি ঘরের ছাদ দেখিতে পাইয়া বুঝিলাম ভৈরব ঘাটিতে আসিয়াছি। শীঘ্রই চড়াই শেষ করিয়া পর্ব্বতের শিখর দেশে এক বিস্তৃত সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিলাম। এক পার্শ্বে একটি ছোট প্রস্তরের মন্দির। তাহারই নিকট কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের একতলা ঘর। এই গুলিই ধর্ম্মশালা ও দোকান রূপে ব্যবহৃত হয়। স্থানটি একেবারে নির্জ্জন। আমি আসিয়া ভৈরবের মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। স্থানটি মনোরম, একটি কুঞ্জবনের মত, চারিদিক বৃক্ষাচ্ছাদিত। আমাদের দেশে লোকে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মনোরম দেবালয় ও মন্দির প্রস্তুত করে। হিমালয়ে চতুর্দ্দিকেই এত স্বাভাবিক মনোরম স্থান আছে যে সেখানকার লোকেরা দেউল নির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিতে চাহে না, কেননা স্বভাবের শিল্প সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যের শিল্পের তুলনাই হইতে পারে না। আমি এখানে, সেই রাক্ষসের মায়ার রাজ্যের একেলা মানুষের ন্যায়, বসিয়া রহিলাম। মন্দির ধর্ম্মশালা দোকান সব রহিয়াছে কিন্তু মানুষ নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠিয়া ভৈরবের

মন্দিরের দ্বার কিছু ফাঁক করিয়া ভিতরে দেখিলাম এক লিঙ্গ মূর্ত্তি। একবার মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম। অল্প আয়াসেই তাঁহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম। প্রবাদ আছে যে হিমালয় যোগী ঋষিদের সাধন ভজনের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। একথা সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু সেদিন ভৈরব ঘাটির মন্দিরের সম্মুখে, হিমালয়ের শিখর দেশে, স্বভাবের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া যখন ঈশ্বরের কথা ভাবিলাম, তখন হঠাৎ ভাই বন্ধু পরিজন পার্থিব সুখ দুঃখ ও সম্পদ সকল কথাই অল্পক্ষনের জন্য ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল যেন আমার অন্তর ও বাহির একেবারে উম্মুক্ত অবস্থায় লইয়া আমার স্রষ্টার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। যেন পোষাকের দ্বারা শরীরের কোন অংশ বা অঙ্গ গ্লানি তাঁহার নিকট হইতে ঢাকিতে পারিতেছি না। যেন মনের কোন ভাব, ভাল অথবা মন্দ, তাঁহার নিকট হইতে লুকাইতে পারিতেছি না। যেন আমার জীবনের ইতিহাস তাঁহার নিকট খুলিয়া ধরিয়াছি। আরও মনে হইল তিনি যেন এক মূহুর্ত্তের মধ্যে আমার অন্তর বাহির সব দেখিয়া লইলেন। তখন তাঁহাকে একবার প্রাণের সহিত ডাকিয়া বলিলাম "জীবনের পথ দেখাইয়া দাও ও মনে ও দেহে সেই পথ অনুসরণ করিবার বল দাও"।

ফোটোগ্রাফ তুলিবার জন্য কোডাকটি প্রায় আমার সঙ্গেই থাকিত, ভৈরবের মন্দিরের একটি ছবি লইলাম। আমি এখানে প্রায় ১৫ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবার পরও সঙ্গীরা আসিল না, অতএব অগ্রসর হওয়াই স্থির করিলাম কেননা আজ রাস্তায় থামিবার কথা নাই। ভৈরবঘাটি পার হইয়া এখন মনের আনন্দে চলিলাম ভাবিলাম বাকি ৪।৫ মাইল সহজ। কিন্তু দেখিলাম সেটি আমার ভুল, কেননা এই শেষোক্ত ৪।৫ মাইল রাস্তার অধিকাংশই চড়াই। আমার নিকট ভৈরব ঘাটির খাড়া চড়াই অপেক্ষা এই রাস্তার ক্রমিক কিন্তু লম্বা চড়াই বেশী কষ্টকর মনে হইল। পথে একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে একটি ঝরণাতে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিল। সে গঙ্গোত্তরী দেখিয়া ফিরিতেছে, বয়স ৩৩।৩৪ বৎসর বলিয়া বোধ হইল। আমার ইংরাজি পোষাক দেখিয়া কথা কহিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু আমি কথা সুরু করিতে বেশ নিঃশঙ্কোচে কথা বলিল। সহাস্য বদন দেখিলে বোধ হয় মনে শান্তি আছে। গোমুখ দেখিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, গঙ্গোত্তরী হইতে ২ মাইল অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেখানে পথ নাই, কোন মতে নদীর ধার দিয়া দুই মাইল গিয়াছিল, কিন্তু আর অগ্রসর

হইতে না পারিয়া ফিরিয়াছে। বিশেষতঃ সেখানে খাইবার ও থাকিবার কোনরূপই ব্যবস্থা নাই, রাত্রে আশ্রয় না পাইলে শীতে জমিয়া যাইবে। আমি বলিলাম যে আমরা গোমুখ যাইব ও সঙ্গে তাম্বু ও অপর ব্যবস্থা আছে সে ইচ্ছা করিলে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে। কিন্তু সে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট এক ক্ষত দেখাইয়া বলিল সে পথে দুই মাইল গিয়াই তাহার পদ ক্ষত হইয়াছে ১২ মাইল যাওয়া আসা করিলে তাহার পদের আর কিছু থাকিবে না। সাধুকে সেখানে ছাড়িয়া অগ্রসর হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম তবে কি গোমুখ যাইতে পারিব না। একবার যাইবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িব না তাহা মনে মনে ঠিক করিলাম। এখন প্রায় বরফের দেশে আসিয়া পড়া গিয়াছে। যদিও আমি যে পথে চলিতেছি তাহাতে বরফ ছিল না, নদীর অপর পারে পর্ব্বত গাত্রে বরফ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। ইহারাও গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিতেছে। কাল সন্ধ্যার সময় ইহাদের জাংলাতে দেখিয়াছিলাম। তাহারা জাংলাতে না থামিয়া রাত্রেই গঙ্গোত্তরী গিয়াছিল, বোধ হয় শীত পড়িতেছে বলিয়া যত শীঘ্র পারে ফিরিতেছে। এই কয়জন ছাড়া ও দুই এক জন সাধু ছাড়া এ পথে আর যাত্রী

গঙ্গোত্তরীর তিনটি মন্দির।



ইহার মধ্যে গঙ্গার মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। ছবির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ধর্ম্মশালার ছাদ দেখা যাইতেছে।

দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আরও আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে গঙ্গোত্তরীতে উপস্থিত হইলাম। ঢুকিবার মুখেই একটি পাথরে অঙ্কিত আছে "টিহরী হইতে ৯৭ মাইল"। টিহরীতে কিন্তু ঐরূপ একটি পাথরে লেখা দেখিয়া ছিলাম "গঙ্গোত্তরী ১০০ মাইল"। ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। সকাল ৭.৩০ সময় ডাংলা হইতে ছাড়িয়া এখানে ১২।১৫ সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরের দ্বারে আসিবার যে পথ তাহার দুই পার্শ্বে কতকগুলি ঘর। সেগুলি সবই কাঠের ও সকল গুলিই বন্ধ। মন্দিরের দ্বারে আসিয়া আমি বুট খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণে তিনটি মন্দির রহিয়াছে। দুইটি পাশা পাশি ও অপর ও ছোট মন্দিরটি এই দুইটি মন্দিরের সম্মুখে কিছু দূরে ও কিছু উচ্চে অবস্থিত। বড় মন্দিরে গঙ্গা, যমুনা, ভগীরথ ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, অপর মন্দির গুলিতে মহাদেব অন্নপূর্ণা ইত্যাদির মূর্ত্তি। পাণ্ডারা বলিল গঙ্গার মন্দির শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। আরও বলিল এই স্থান হইতে কিছু দূরে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড আছে যেথায় বসিয়া ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গা দেবীকে ভূতলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। খুলা পায়ে মূর্ত্তি গুলি একবার দেখিয়া আসিয়া

মন্দিরের আঙ্গিনা হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত যে ঘাট গঙ্গা গর্ভে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গীদের এখনও দেখা নাই। পাণ্ডা ও পূজারীরা শীঘ্রই আসিয়া সসম্ভ্রমে আমার সহিত কথা কহিতে লাগিল। আমাদের অগ্রগামী যাত্রীদের নিকট আমাদের কথা শুনিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল কোন সাহেবের দল শীকার করিতে আসিতেছে। তাহারা বলিল কখনও কখনও সাহেবের দল শীকার করিতে গঙ্গোত্তরী উপস্থিত হয়। আমরা বাঙ্গালী শুনিয়া তাহারা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এখন প্রায় বেলা ১টা, যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। কিছু খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল কিস্‌মিস্ পাওয়া যাইবে। উচ্চ দরের অতিথি ভাবিয়া বোধহয় তাহারা নিজেরা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খাবার মনে করিল তাহারই নাম করিল। ইহাও হইতে পারে অপর খাদ্য দ্রব্য যাহা তাহাদের কাছে ছিল তাহা সবই কাঁচা, যথা, আটা, ময়দা ইত্যাদি, সে সব পাক না করিলে খাওয়া যায় না। যাহা হউক কিস্‌মিস্ মন্দ হইবে না মনে করিয়া এক পোয়া আনিতে বলিলাম। পাণ্ডারাই একটি দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল, সেইখান হইতেই লইয়া আসিল। এ সময় যাত্রীরা প্রায়ই আইসে না বলিয়া দোকানদারেরা দোকান

পসার সবই বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমি আসিবার অল্প পরেই গৌরী শিকারী আসিয়া পৌঁছিল। পাণ্ডারা কিস্‌মিস্ লইয়া আসিলে দেখা গেল সেগুলি খাওয়া অসম্ভব। তাহার সহিত এত ধুলা ও ময়লা মিশ্রিত যে তাহা খাইলে কিস্‌মিস্ অপেক্ষা ধুলাই বেশী খাইতে হইবে। তখন এত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল যে কিস্‌মিসের উপরোক্ত অবস্থা দেখিয়াও ফিরাইয়া দিলাম না। সেগুলি ভাল করিয়া গঙ্গা জল দিয়া ধুইয়া আনিবার জন্য শিকারীকে বলিলাম। আমি আসিবার প্রায় ৪৫ মিনিট পরে সত্যেন ও ফণী তাহাদের ডাণ্ডিতে করিয়া উপস্থিত হইল। আমরা তখন সকলে মিলিয়া ধর্ম্মশালা গুলি দেখিতে গেলাম। ধর্ম্মশালার ঘর গুলি নীচু, অন্ধকার, অপরিষ্কার ও সেঁৎসেঁতে। বাবা কম্বলীওয়ালার নির্ম্মিত দ্বিতল ধর্ম্মশালার ঘরগুলি উহারই মধ্যে বাসযোগ্য বিবেচনায় তথায় রাত্রি যাপন স্থির হইল। ধর্ম্মশালার সম্মুখ ভাগ দ্বিতল। ভারায় উঠিবার মইয়ের ন্যায় একটি কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। কিন্তু এখন আর এরূপ সিঁড়িতে উঠিতে আমাদের কোনরূপ কষ্ট হইলনা। বাসস্থান ঠিক করিবার অল্প পরেই শৈলেন ও পাণ্ডারা আসিল ও কুলীরা একে একে দেখা দিতে লাগিল। পাণ্ডারা

আসিলে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে হিন্দু যাত্রীরা এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধ করে। আমি ও ফণী শ্রাদ্ধ করিব স্থির করিয়া পাণ্ডাদিগকে তাহার জোগাড় করিতে বলিলাম। তীর্থস্থানে ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিলে তাহাতে কোন ফল হয় কিনা জানি না। হিমালয়ে হিন্দুদের এই মহাতীর্থে আসিয়া ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিবার ইচ্ছা স্বঃতই মনে হইল। কি জানি কেন ঐরূপ মনে হইল। হয়ত পুরুষানুক্রমের হিন্দু রক্ত শিরায় থাকাতেই ঐরূপ হইল। হিন্দুত্বের সঙ্গে পিণ্ডদানের যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে ইহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অপরে মানুক বা নাই মানুক মনে মনে আপনাকে হিন্দু বলিয়া খুব বিশ্বাস আছে, ও সময়ে সময়ে হয়ত তা বলিয়া গর্ব্বিও করিয়া থাকি। হইতে পারে আমার হিন্দুত্বের সঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "রিফরমড্ হিন্দুদের" হিন্দুত্বের কিছু সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে যাহাই হউক শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উপকার করা হয় আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে। লোকের পিতা মাতা প্রায়ই ভাল হয়। আমার স্বর্গগত পিতা মাতা আমার নিকট দেবতার ন্যায়। তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের অসীম স্নেহের কোন প্রতিদান করিবার ভাগ্য

আমার ঘটে নাই। হিন্দুর এই মহাতীর্থে, তাঁহাদের পিণ্ড দান করিয়া তাঁহাদের ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইবার ইচ্ছাও বোধহয় কতকটা মনে মনে হইয়াছিল। পাণ্ডারা নদীর ধারে পূজার আয়োজন করিল। মন্দির হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, রূপার ঘটি, কোশা, কুশি, পঞ্চ প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া আসিল। এখানে কোনরূপ ফুল নাই, কিন্তু গ্যাঁদা ফুলের গাছের মত পাতা ওয়ালা এক রকম ছোট ছোট গাছ এখানে অনেক হয় ও সেই গাছের পাতায় অতি মধুর গন্ধ আছে। ফুলের বদলে পাণ্ডারা এই গাছের পাতা লইয়া আসিল। নৈবেদ্য কিছু আঠা ও মিছরীর হইল। উপকরণ যোগাড় করিয়া পাণ্ডারা নদী তীরে একটি বেশ বড় আগুণ জালিল, কেননা আগুণ না থাকিলে গঙ্গাতীরে অধিকক্ষণ বসা অসম্ভব, হাত পা জমিয়া যাইবার জোগাড় হয়। শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা স্নান করিলাম। আজ স্নান করিতে কিছু কষ্ট হইল, মনেরও যথেষ্ট সাহসের আবশ্যক হইল। এস্থান প্রায় সমুদ্র হইতে ১০,০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চে। আজ অক্টোবর মাসের ২২শে। এ দেশে শীতও বেশ পড়িয়াছে। নদী গর্ভ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে পর্ব্বত গাত্রে সর্ব্বত্র শিশির জমিয়া গিয়াছে। যেখানে রৌদ্র আসিয়াছে সেখানকার বরফ অল্প

অল্প গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উপরে আবার নদীর ধারে বিষম ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় গঙ্গার সেই তুষার শীতল জলে স্নান করিতে যথেষ্ট সাহসের দরকার হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক স্বর্গগত পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া আমরা স্নান করিলাম। স্নান করিয়া গরম কাপড় পরিয়া আগুণের ধারে বসিয়া শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলাম। একজন পাণ্ডা আমাদের মন্ত্র বলাইল, কতকবা নিজেই বলিতে লাগিল। অপরটি একখানি পুঁথি দেখিয়া তাহাকে মন্ত্র বলিয়া দিতে লাগিল। গোত্র ও পূর্ব্ব পুরুষের নাম গুলি আমরা নিজেরাই আবৃত্তি করিলাম। আর সমস্ত ক্ষণ পিতা মাতার কথা ভাবিলাম। দেশে চাল, ফল ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত হয়। এখানে কেবল আঠার দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষের তুষ্টি সাধন করিতে হইল। তবে যমুনোত্তরীর বালির পিণ্ড অপেক্ষা ইহা ভাল। শ্রাদ্ধ শেষ করিতে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগিল। আজ খাইতে প্রায় বেলা ৩টা বাজিল। তারপরই আমাদের জিনিস পত্রের পার্টিসান বা ভাগ আরম্ভ হইল। কাল সকালে ফণী ও সত্যেন এখান হইতে মুসুরী অভিমুখে ফিরিবে আর আমি ও শৈলেন গোমুখের দিকে অগ্রসর হইব। আমরা ১০ জন কুলী ও শিকারীকে সঙ্গে

লওয়া স্থির করিলাম। তাম্বু দুইটি আমাদেরই সঙ্গে যাইবে স্থির হইল কেননা এপথে কোনরূপ আশ্রয় না থাকাতে কুলীদেরও তাম্বুতে থাকিতে হইবে। টাকা কড়ি আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী রাখিলাম কেননা আমাদের ফিরিতে বেশী দিন লাগিবে। আর আবশ্যক হইলে অপর দল ফিরিবার সময় আমাদের পূর্ব্ব বন্ধু উত্তরকাশীর সেই অমায়িক ডেপুটির নিকট ধার পাইতে পারিবে। পাণ্ডা দুইজন আমাদের সঙ্গে যাইবে স্থির করিল। তাহাদেরও সচরাচর গোমুখ যাওয়া হয় না। ফণী বলিল যে ডেরাডুনে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। সত্যেন কিন্তু একেবারে দেশে ফেরাই স্থির করিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আজ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল। ধর্ম্মশালার ভিতর কিন্তু আমাদের বিশেষ কষ্ট হইল না। সঙ্গে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকাতে রাত্রি একরকম আরামেই কাটিল।

গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখের পথে।

প্রায় ৪ মাইল।

——o——

২৩শে অক্টোবর ১৯১৪।

আজ প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গে গঙ্গা দেবীর মন্দিরের মাঙ্গলিক শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পাহাড়ের চতুর্দ্দিকের গভীর নিস্তব্দতার মধ্যে রাত দিন গঙ্গার কল কল নিনাদেই আমরা অভ্যস্ত। এখন তাহার সহিত যখন শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ মিশ্রিত হইল। বোধহইল যেন কোন সাধা গলা পুরুষের সঙ্গে যেন কোন মধুর কণ্ঠ গায়িকা গলা মিশাইল। আমরা কিন্তু অধিকক্ষণ গরম এবং আরাম দায়ক বিছানার আবরণের মধ্য হইতে সেই শ্রুতি মধুর শব্দ শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। আজ আমাদের অনেক কাজ কাজেই শীঘ্র উঠিয়া পড়িতে হইল। উঠিয়া দুই দলের জিনিস পত্র আলাদা করিয়া গোছান হইল। ফণী ও সত্যেন ১৯ জন কুলী ও টাণ্ডেলকে ও আমাদের পূর্ব্বোক্ত বয়টিকে সঙ্গে লইয়া যাইবার স্থির করিল। টিহরী ষ্টেটের চৌকিদারেরও তাহাদের সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল। আমরা ৯ জন কুলী ও বয়ের সঙ্গেকার ছোকরা

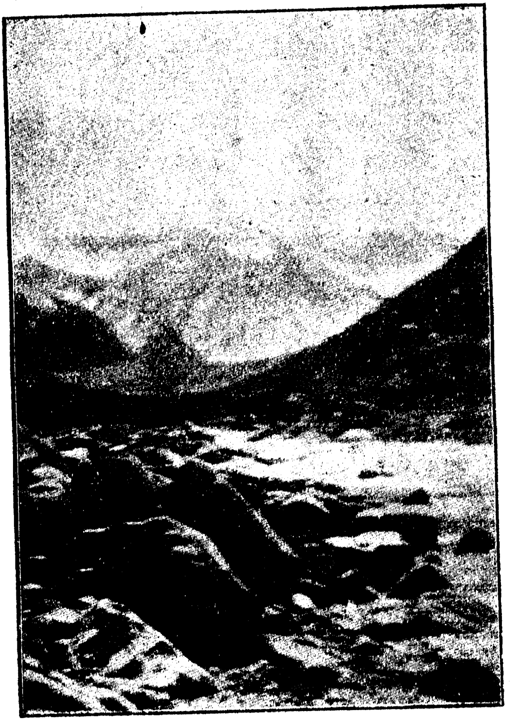
ও শিকারীকে সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিলাম। যত উর্দ্ধে আমরা উঠিতে ছিলাম বয়টি শীতে তত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছিল। সে আর অধিক ঠাণ্ডার দেশে যাইতে রাজি হইল না। আমাদের যতগুলি লোক ছিল তাহার মধ্যে শিকারী সর্ব্বাপেক্ষা নির্বিবাদি ও কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, কাজেই আমরা এ শক্ত পথে তাহাকে প্রধান সহায় করিলাম, আর তাহার পরামর্শ অনুসারেই বাছিয়া, অল্প বয়স্ক ও শিকারীরই গাঁয়ের ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানের, ৯টি কুলী লইলাম। শিকারীই এই কুলীদের বাছিয়া বলিয়া কহিয়া ঠিক করিল। সে বলিল এই সকল লোকের উপর তাহার পুরা এক্তিয়ার আছে, তাহার কথা উহারা মানিবে। গোমুখ তাহাদের মধ্যে কেহ যায় নাই শিকারীও না। আমাদের দলের মধ্যে কেবল মাত্র গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডা দুইজন গোমুখ গিয়াছিল। আমরা তাহাদের দুইজনকেও সঙ্গে লওয়া স্থির করিলাম। কুলীদিগকে তাহাদের মজুরীর উপর এক এক টাকা করিয়া বেশী দিব বলাতে তাহারা কতক উৎসাহিত হইল। তাহারা সকলেই ছোকরা ১৮ হইতে ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যে সকলেরই বয়স। ক্রমে গোমুখ দেখিবার জন্য একটা উৎসাহ ও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে কেবল একজন

বিশেষ ভয় পাইয়াছিল। তাহার শরীর তত সবল ছিলনা তাহাতে খালি পায়ে ও একটি ছেঁড়া কুর্ত্তার ভরসায় সে বরফের পথে যাইতে বড়ই কাতর হইল। বার বার টাণ্ডেলকে বলিতে লাগিল "তুমি আমাকে বদলাইয়া অপর একজন কুলীকে দাও। আমি বরফের পথে চলিতে পারিব না মরিয়া যাইব"। কিন্তু টাণ্ডেল তাহার দলের কুলী পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল সে কোন মতেই তাহাদের একজনকে দিতে চাহিল না। আমরা বলাতে বলিল কেহই যাইতে রাজি নহে। আসল কথা বুঝা গেল যে অপটু ছোকরা শিকারীর দলের লোক, অপর কুলী যাহারা নীচে যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে কেহই শিকারীর বশে নহে, কঠিন পথ শুনিয়া যাইতে অরাজি। যাহা হোক অনেক বলা কওয়ার পর পূর্ব্বোক্ত ছোকরাই যাইতে রাজি হইল। সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বেলা ৯ টার সময় আমরা প্রস্তুত হইলাম। ফণী ও সত্যেন আমাদের নিকট বিদায় লইয়া মুসুরী অভিমুখে যাত্রা করিল। হাসিতে হাসিতেই তাহাদের বলা গেল "যদি বাঁচিয়া ফিরি ত আবার দেখা হইবে"। আমরা যে পথে গিয়াছিলাম তাহাতে না ফিরিবারও সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। উহারা চলিয়া যাইবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে

আমি ও শৈলেন শিকারী, গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডা দুইজন ও বাকি কুলীদের লইয়া গোমুখের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রথমেই দেখা গেল যে গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত যেরূপ রাস্তায় আমরা আসিয়াছিলাম সেরূপ কোন রাস্তা নাই। সে রাস্তা গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন পাকদাণ্ডির মত একটি সরু রাস্তা দিয়াই আমরা চলিলাম। প্রথমে আমরা বাম দিকের পাহাড়ের উপর দিয়াই চলিলাম, গঙ্গা আমাদের ডান দিকে কিছুদুর নিম্নে। নদীর দুই দিককার পাহাড়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। আমরা বাম দিকের পাহাড়ের এক নিম্ন স্তর দিয়া চলিয়াছি। পথের কঠিন্য গোড়া হইতেই দেখিতে পাইলাম। পথ কোথাও নীচে নামিতেছে কোথাও উপরে উঠিতেছে কোথাও গাছের ডাল সরাইয়া কোথাও বা নীচু হইয়া ডালের নীচে দিয়া যাইতে হইতেছে। কোথাও বা সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। লতা, গুল্ম, তৃণে পথ আচ্ছাদিত। সে সকলের উপর দিয়া বা পাহাড়ী লাঠির দ্বারা সে সকল কতক সরাইয়া চলিয়াছি। কিছুদূর আসিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। গুহার মুখে দুইটি ছোট ছোট

কাঠের দরজা বসান রহিয়াছে। পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এস্থানে সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকে। এখন তাহাতে কেহই ছিল না। এ পথে জোরে চলা অসম্ভব। প্রত্যেক পদই দেখিয়া ফেলিতে হইতেছে। কখন বা পথের পত্র রাশির উপর পা দিতেই পা হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যাইতেছে, নীচু ও উঁচু জমী পাতা পড়িয়া সমান হইয়া যাওয়াতে ওরূপ ঘটিতেছিল। কতক দূর পাহাড়ের গা দিয়া চলিয়া আবার নদীর ধারে নামিতে হইল। সেখানেও পথ সহজ নয়। কোথাও বা বালির উপর দিয়া কোথাও বা জলের মধ্যস্থিত এক পাথরের উপর হইতে লাফাইয়া অন্য পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছি। তারপর হয়ত নদীর পার্শ্বস্থ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের উপর উঠিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে উঠিব কি করিয়া, বেগবতী নদীর সংঘর্ষণে সে পাথর এত মসৃণ হইয়াছে যে ধনী লোকের মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যস্থলও তত মসৃণ নয়। দলস্থ এক ব্যক্তি বহু কষ্টে তাহার উপর উঠিয়া একে একে দলস্থ অপর লোককে হস্ত বা লাঠির দ্বারা উপরে উঠিতে সাহায্য করিল। অপর সকল বাধা অপেক্ষা এইরূপ একটি পাথরের কাছে আসিলেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভয় হইত। এরূপ স্থলে আমাদের মোটা ও লৌহ যুক্ত বুটে

গোমুখের দুরূহ পথ।



গোমুখের পথে নদী পার্শ্বে মসৃণ পর্ব্বত খণ্ড সকল। এই সকল পর্ব্বত খণ্ডের উপর উঠিতে ও তাহার উপর দিয়া যাইতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইত।

২৬২ পৃষ্ঠা]

আরও বিপদ হইল। বুট পরিয়া সেইরূপ প্রস্তরের উপর কোন মতেই পা রাখা গেল না ক্রমাগত হড়কাইয়া যাইতে লাগিল। পাণ্ডারা আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে এপথে বুট চলিবেনা সেইজন্য আমরা উত্তরকাশী হইতে এক এক জোড়া ক্যাম্বিসের রোপসোল্ বা দড়ীর তলা যুক্ত জুতা কিনিয়া লইয়া ছিলাম, এখন সেই জুতা বাহির করিলাম। কিন্তু জুতাটি আমাব পা অপেক্ষা কিছু বড় হওয়াতে মাঝে মাঝে পা মুচ্‌ড়াইয়া যাইবার উপক্রম হইল ও ক্রমে জুতাও পা হইতে খুলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিলাম। আমার সঙ্গে চামড়ার যে ফুল স্লিপার ছিল সেইটি পায়ে দিয়া তাহার উপর দড়ীর জুতা পরিলাম। তাহাতে জুতা আর খুলিল না। শৈলেন উত্তর কাশীতে তাহার মাপের দড়ীর জুতা পায় নাই অতএব তাহাকে বুটেতেই চলাইতে হইল। দড়ীর জুতায় কিন্তু শীঘ্রই আর এক বিপদ হইল। পথের লতা পাতা গুলি সবই শিশিরের জলে ভিজা থাকাতে কাম্বিস ও দড়ী শীঘ্রই ভিজিয়া জুতাটি বেশ ভারি হইল। কিন্তু তখন সে জুতা ছাড়া পা বাঁচাইবার অপর কোন উপায় না থাকাতে সেই গুরুভার ও সিক্ত জুতা পরিয়াই চলিলাম। প্রায় ২॥০ মাইল আসিবার পর পাণ্ডারা

বলিল নদীর অপর পারের রাস্তা এখন ভাল হইবে। আমরা যে পারে যাইতেছিলাম সে পারে আর রাস্তা নাই বলিলেই হয়। পাহাড়ের নিম্ন স্তর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এক অনেক উচ্চে পাহাড়ের উপর দিয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেখানেও রাস্তা পাওয়া যাইবে কিনা তাহারা ঠিক জানিত না। তাহারা বলিল অপর পারের রাস্তা তাহারা জানে। তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা অপর পারে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু প্রস্তুত হওয়া যত সহজ পার হওয়া তত সহজ হইল না। গঙ্গার বক্ষে অনেক বড় বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। আমরা প্রথমে মনে করিলাম এই সকল প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া লাফাইয়া নদী পার হওয়া যাইবে কিন্তু তাহা সম্ভব হইলনা। কেননা প্রস্তরখণ্ড গুলির মধ্যে ব্যবধান কোথাও ১০।১২ ফিটের কম নয়। গঙ্গাও কোন স্থলে ৩৫।৪০ ফিটের কম চওড়া নয়। এরূপ অবস্থায় লাফাইয়া গঙ্গা পার হইবার আশা ছাড়িয়া দেওয়া গেল, এ কলিকালে তাহা সম্ভব হইলনা। তারপর পাণ্ডারা বলিল যে কুলীরা হাঁটিয়া নদী পার হইবে ও তাহারা আমাদের কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিবে। কুলীরা পশ্চাতে ছিল, আমরা ইত্যবসরে যেখানে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায় এরূপ একটি স্থান খুঁজিতে লাগিলাম।

অবশেষে একটি স্থান দেখাইয়া পাণ্ডারা বলিল "এখানে পার হওয়া যাইবে"। আমরা সেখানে কুলীদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কুলীরা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে দুই একজন জলে নামিয়া পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নদীর এক চতুর্থাংশ পার হইবার আগেই তাহাদের প্রায় বুক জল হইল। সেখানে জলের এত টান যে আর অধিক অগ্রসর হইলে স্রোতে ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা তাহাদের চলিয়া আসিতে বলিলাম। কিন্তু আমাদের পাণ্ডারা কিছুতেই ভগ্ন মনোরথ হইবার লোক নয়। আমরা যখন হতাশ হইবার উপক্রম হইলাম তখন তাহারা বলিল "পুল বাঁধিতে হইবে"। ক্রমে তাহাদের কথায় আমাদেরও সায় দিতে হইল। তাহা ছাড়া আর কোনরূপ উপায় ছিলনা। নদীর ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁজিয়া একটি স্থান পাওয়া গেল যেখানে কিনারা হইতে নদীর মধ্যস্থ এক প্রস্তর খণ্ড প্রায় ১০।১২ ফিট্ দূর। এই স্থানই আমাদের পুল প্রস্তুতের উপযোগী বলিয়া স্থির হইল। এখন সমস্যা পুল কিসের দ্বারা প্রস্তুত হইবে। নিকটে অনেক দেবদারু বৃক্ষ ছিল কিন্তু সঙ্গে কুঠার বা কাঠ কাটিবার কোনরূপ যন্ত্র ছিল না। গঙ্গোত্তরী মন্দির হইতে কুঠার সঙ্গে না আনাতে

পাণ্ডারা আপনাদের বুদ্ধিকে দোষ দিতে লাগিল। অবশেষে বলিল একজন কুলীকে মন্দিরে পাঠাইয়া কুঠার আনাইয়া লইবে। কিন্তু বেলা প্রায় ১টা বাজিয়া ছিল, আমরা ভাবিলাম গঙ্গোত্তরী হইতে কুঠার আনাইতে গেলে আজ আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, অথচ আমরা যে স্থানে ছিলাম সেখানে তাম্বু ফেলিবারও সুবিধা নাই। ভয় হইল তবে বুঝি আবার গঙ্গোত্তরী ফিরিতে হয়। আর গঙ্গোত্তরী একবার ফিরিলে আবার এপথে আসা শক্ত। প্রথমতঃ আমাদের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে মুসূরী ফিরিতে হইবে। বৃথায় একদিন নষ্ট করা আমাদের পক্ষে শক্ত। তারপর আমাদের সঙ্গে যে টাকা ছিল তাহাতে পথে এক দুই দিন বেশী লাগিলে কুলীদের ও আপনাদের খাই খরচ সঙ্কুলান হওয়া শক্ত। যাহা হউক শীঘ্রই আমাদের বিপদের এক উপায় হইল। একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে খবর দিল যে সে একটি শুষ্ক দেবদারু বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিয়াছে। কুলীদের সাহায্যে বৃক্ষটিকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে আনা হইল। গুঁড়ি হইতে অপরাপর যে সকল ছোট-ডাল পালা বাহির হইয়াছিল সেগুলি প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া গুড়িটিকে পরিষ্কার করা হইল। গুড়িটি লম্বায় প্রায় ১৭।১৮ ফিট হইবে। গোড়ার দিকের

পরিধি প্রায় ২।২৷৷০ ফিট ও আগার দিকের প্রায় ১০।১১ ইঞ্চ। নদীর কিনারায় কতকগুলি পাথর ফেলিয়া গাছের গুঁড়িটা রাখিবার একটা স্থান করা হইল। গাছটিকে সকলে মিলিয়া ধরিয়া সেই স্থানে দাঁড় করাণ হইল। তারপর নদী মধ্যস্থ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরটীর দিকে হেলাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পরক্ষণেই শুষ্ক ও কীট দ্রষ্ট বৃক্ষ কাণ্ড অপর দিকের শক্ত পাথরের উপর সজোরে পড়িয়া দুই তিন টুকরা হইয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সকল আশা ভরসা ভাসিয়া গেল। কিন্তু "যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে"। কিছু অনুসন্ধানের পর আমরা আরও দুই তিনটি দেবদারু বৃক্ষের শুষ্ক গুঁড়ি জোগাড় করিলাম। এগুলি পূর্ব্বোক্ত গুঁড়ি হইতে সরু ও তেমন সরল নয়, তবে এগুলিতে বিশেষ পোকা না লাগাতে অনেক শক্ত বলিয়া বোধ হইল। মনুষ্য শরীরের সঙ্গে গাছের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য। প্রায় এইরূপ দেখা যায় যে মোটা ঘুন ধরা শরীর অপেক্ষা রোগা সবল মাংস পেশী যুক্ত শরীর অধিক কার্য্যপোযোগী হয় ও ক্ষণ ভঙ্গুর হয় না। এবার ঠেকিয়া শেখা গিয়াছে। কাজেই যে সকল গুঁড়ি সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাদেরই একটির অগ্রভাগে দড়ী বাঁধিয়া আস্তে আস্তে তাহা অপর

দিকের প্রস্তরের উপর নামান হইল। এই গুঁড়িটি কিন্তু অত্যন্ত সরু, তাহার পরিধি ১০।১২ ইঞ্চের বেশী হইবে না। ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইলে কিছু ব্যালেন্‌সিং জানা দরকার। তাহা না হইলে পদস্খলন্ হওয়া সম্ভব। তাহাতে গাছের অপর দিকটি সমতল স্থানে না পড়ায় পা দিলেই তাহা নড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় তাহার উপর যাইবার চেষ্টা করা দুঃসাহসের কাজ। একটি ছোকরা কুলী কিন্তু অপর পারে যাইয়া গাছটি ঠিক করিয়া বসাইয়া দিতে রাজি হইল। এইটিই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কুলী যে গোমুখ যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। জীবনেও এইরূপ কত দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে যাহারা পূর্ব্বাহ্লে হাঁক ডাক করে কাজের সময় তাহাদের উৎসাহ কমিয়া যায় ও যাহাদিগকে নিরীহ ও কার্য্যে অপটু বলিয়া বোধহয় সময়ে তাহারাই অদ্ভুত সাহস ও উৎসাহের পরিচয় দেয়। আমি কিন্তু তাহার বাক্যে নির্ভয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলাম না। তাহার কোমরে শক্ত করিয়া একটি দড়ী বাঁধিয়া সেই দড়ীর অগ্রভাগ নিজেই ধরিয়া রহিলাম, যদি পড়িয়া যায় তাহা হইলে এই দড়ীর সাহায্যে তাহাকে টানিয়া তোলা যাইতে পারিবে এই বিশ্বাসে। সেই কুলীটি ঐরূপ রজ্জুবদ্ধ হইয়া, ঘোড়ার উপর যে ভাবে বসে

গোমুখের পথে আমাদিগের প্রস্তুত প্রথম পুল।



এই পুলটি তিনটি সরু দেবদার বৃক্ষ কাণ্ডে প্রস্তুত। এই পুল প্রস্তুত করিতে আমাদের প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। পুলের অল্প নীচেই গঙ্গার ভীষণ স্রোত। ছবির বামদিকে আমাদের একজন পাণ্ডা দাঁড়াইয়া আছেন। সে স্থান হইতে আরও দুইটি ছোট পুল প্রস্তুত করিয়া তবে আমরা গঙ্গার অপর পারে যাইতে পারিয়াছিলাম।

২৬৮, ২৬৯ পৃষ্ঠা]

সেই ভাবে সেই গাছের উপর বসিয়া হস্তের সাহায্যে অল্পে অল্পে অপর পার্শ্বের শিলা খণ্ডে উপস্থিত হইল। আমাদের পুলের উপর দিয়া এই প্রথম যাত্রী পার হওয়াতে সকলেই আনন্দ সূচক ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে সেই বৃক্ষটির অগ্রভাগ দুইটি প্রস্তরের খাঁজের মধ্যে ভাল করিয়া বসাইয়া দিল। ইহাতে কাঠটির উপর উঠিলে তাহা আর বেশী নড়িল না। পূর্ব্বোক্ত গাছের পাশে আর একটি গাছ ফেলা হইলে, আমি তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় আমার ভারে গাছ অল্প বেঁকিয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল আমা অপেক্ষা ভারি লোক গেলে এই পুল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। মোট লইয়া কুলীদের ইহার উপর দিয়া যাইতে দিতে সাহস হইল না। অপর যে গাছ আনা হইয়াছিল এখন সেইটিও পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল গাছের পাশে রাখা হইল, কিন্তু গাছ গুলি সব সোজা না হওয়াতে একটি অদ্ভুত পুল প্রস্তুত হইল। তাহার উপর দিয়া চলিবার সময় কখন বা একটি পা অপেক্ষা অপর পাটি ৮।১০ ইঞ্চ নীচে ফেলিতে হইল, কখন বা এক পায়ের নীচের গাছটি বেঁকিয়া গেল অপর গাছটি বেশী বেঁকিল না, ইহাতেও শরীরের ব্যালান্স ঠিক রাখা দুরূহ হইল। কিন্তু এই খানেই আমাদের কষ্টের শেষ হইল না। অপর দিকের

প্রস্তরের উপর গিয়া দেখি যে আমি নদীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া আছি, নদীর আরও দুইটি শাখা পার হইলে তবে পরপারে যাওয়া যাইবে। তবে এই শাখাগুলির এক একটি ৪॥০।৫ ফিট্ চওড়া হইবে লাফাইয়া পার হওয়া যায়, কিন্তু পৃষ্ঠে মোট লইয়া কুলীরা কিরূপে লাফাইবে, কাজেই সে গুলির উপরও ছোট ছোট দুইটি পুল করিতে হইল। নদী এইরূপে বন্ধন হইলে দলস্থ লোক সকলে একে একে পার হইল। কুলীরা অতি সন্তর্পনে ও পাণ্ডাদের সাহায্যে পার হইল। এই পাণ্ডারাই এই পুলের এঞ্জিনিয়ার। তাহাদের অদ্ভুত উদ্যম ও উৎসাহ ব্যতীত আমাদের সে পুল ও প্রস্তুত হইত না নদী ও পার হওয়া হইত না। ইহারা এই পাহাড়ী দেশে থাকিয়া নানা উপায়ে তাহাদের কঠিন পথ অতিক্রম করিতে শেখে। সাধারণ কুলী ও পাহাড়ী অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি বিদ্যা অনেক বেশী। শৈলেন দলের সকলের শেষে আসিতেছিল। নদীর শেষ শাখাটি লাফাইয়া পার হইবার সময় তাহার পশ্চাৎ পদটি জলে পড়িল, যাহা হউক কোনরূপে সামলাইয়া নদী পার হইল। অপর পারে গিয়া কিন্তু কিছুই সুবিধা হইল না। পথ "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" বরং এ পারের রাস্তা আরও খারাপ বলিয়া বোধ হইল। প্রথমতঃ কতকগুলি মসৃণ প্রস্তর খণ্ডের উপর

দিয়া যাইতে হইল, তার পর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে পাহাড়ের গায়ে এক ভুজ পত্রের বনের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। ভুজ বৃক্ষ আমরা এই প্রথম দেখিলাম। পূর্ব্বে আমাদের বিশ্বাস ছিল ভুজ বৃক্ষের পাতা হইতে ভুঁজ পত্র হয়, কিন্তু এখন দেখা গেল ভুজ পত্র ভুজ বৃক্ষের ছাল। ভুজ বৃক্ষের গুঁড়িতে ছুরি দিয়া কতকটা স্থান দাগ দিয়া লইলে সেই স্থানটার ছাল বেশ ছাড়াইয়া লওয়া যায়, ও ছাড়াইয়া লইলে দেখা যায় সেই ছালটির অনেকগুলি পরদা আছে, অর্থাৎ অনেকগুলি পাতলা ছাল মিলিয়া পুরু ছালটি হইয়াছে। অতি অল্পায়াসেই সেই পরদা গুলি বেশ খুলিয়া আলাদা করা যায়। সেই পাতলা ছাল গুলিই ভুজ পত্র। সেগুলি পাতলা কাগজের ন্যায় বেশ আস্তে আস্তে খুলিয়া আসে ও তাহা শুখাইয়া লইলে কাগজ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরা পথের কথা ভুলিয়া গিয়া ছুরি বাহির করিয়া ভুজ পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, কিন্তু পরে মনে পড়িল এখন বোঝা বাড়াইয়া কি হইবে ফিরিবার সময় লওয়া যাইবে। এই ভুজ বনের মধ্যে পথ কোনরূপে করিয়া লইতে হইল। কোথাও বৃক্ষের ডাল ভাঁঙ্গিয়া কোথাও তাহার নীচে দিয়া কোথাও শুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডের উপর দিয়া চলিলাম। এখন যেখান দিয়া চলিয়াছি তাহার অনেক স্থানে বরফ পড়িয়া

আছে, সেই বরফের উপর দিয়াই যাইতে হইতেছে। জুতা ও মোজা ভিজিয়া বেশ ভারি হইয়াছে, পায়েও বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে। অবশেষে ভুজ বন পার হইলাম। কিন্তু সম্মুখে দেখি আর এক বিপদ, প্রায় ১৫০ বা ২০০ গজ লম্বা স্থান একবারে ধসিয়া গিয়াছে অর্থাৎ সেখানে কেবল নরম ও ঝরা মাটি। এ পথে এইরূপ স্থান পার হওয়া আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া বোধ হইত। এখানকার মাটি চোরা বালির ন্যায়, পা দিলেই পা একেবারে বসিয়া যায়, কোথাও বা সেই সঙ্গে পাহাড়ের গা আরও ধসিয়া নীচের দিকে নামিয়া যায়। অনেক স্থলে যেখানে প্রথম পা দেওয়া গেল সেখান হইতে প্রায় ১০ হস্ত নিম্নে গিয়া লাঠি ও হস্তের সাহায্যে কোন গতিকে গতি রোধ হইল। অনেক স্থলে পা দিতেই পা বসিয়া পাহাড়ের গাত্রে বসিয়া বা শুইয়া পড়িলাম ও সেই অবস্থায় কিছু দূর নিম্নে গড়াইয়া গেলাম। এই ঝরা মাটির উপর অনেক স্থানে বরফ থাকাতে সর্ব্বাঙ্গে জল ও কাদা লাগিতে লাগিল। পাণ্ডারা আগে আগে যাইতে লাগিল। আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সেই ভগ্নাংশ অতিক্রম করিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। আমরা এইবার নদী হইতে অনেক উচ্চ একটি সমতল ভূমি

পাইলাম। এখানে অনেক দেবদারু বৃক্ষ আছে। এখন প্রায় বেলা ৫টা। আমরা আজ চিরবাসা বলিয়া এক স্থানে তাম্বু গাড়িব স্থির করিয়াছিলাম। চিরবাসা গঙ্গোত্তরীর মন্দির হইতে প্রায় ৮ মাইল। আমরা কেবলমাত্র ৪৷৷০।৫ মাইল পথ আসিয়াছি। পুল প্রস্তুত করিয়া গঙ্গা পার হইতেই প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। পাণ্ডারা বলিল চির বাসা যাইতে হইলে গঙ্গা আর একবার পার হইতে হইবে। এ সময় আর একটি পুল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা অসম্ভব। অতএব আমরা আজ এই স্থানেই রাত্রি যাপন স্থির করিয়া তাম্বু গাড়িবার হুকুম দিলাম। তাম্বু টাঙ্গান শেষ হইতে না হইতেই সূর্য্য দেব পাহাড়ের পাশে লুকাইল অমনি সহসা আন্দাজ ১০।১৫ ডিগ্রি ঠাণ্ডা বাড়িয়া গেল। আমাদের তাম্বু হইতে কিছু দূরে অপর তাম্বু টাঙ্গান হইল, তাহাতে আমাদের সঙ্গের অপর লোকজন সকলে থাকিবে। কুলীরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তিন চারিটা বড় বড় আগুন জ্বালিল। একটি আগুন ঠিক আমাদের তাম্বুর সামনে জ্বালা হইল, তাহাতে আমাদের তাম্বুর মধ্যে কিছু গরম হইল কিন্তু তাম্বুটি ধোঁয়ায় ভরিয়া গেল। চতুর্দ্দিকের ভুমি শীঘ্রই একটি শাদা বরফের আবরণে আবৃত হইল। আমাদের জন্য পাণ্ডারাই আজ শীঘ্র রুটি প্রস্তুত করিয়া

দিল, তাহা খাইয়া শীঘ্রই তাম্বুর দ্বার বন্ধ করিয়া আমরা শয্যার আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাত্রের প্রথমাংশে আমার কিছু ঘুম হইয়াছিল কিন্তু প্রায় দুই তিন ঘণ্টার পর শীতে ঘুম ভাঁঙ্গিয়া গেল। বিছানার চতুর্দ্দিক বঁরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, হাত পা প্রসারণ করিলেই বোধ হইল যেন বরফে লাগিল ও তখনই আবার সঙ্কুচিত করিতে হইল। রাত্রির শেষার্দ্ধ প্রায় জাগিয়াই কাটিল। কিন্তু সকল কষ্টেরই অবসান আছে, কোন মতে আমাদেরও এই ঠাণ্ডা রাত্রির অবসান হইল।

গঙ্গোত্তরীর পথে গত দিনের আড্ডা হইতে চিরবাসা।

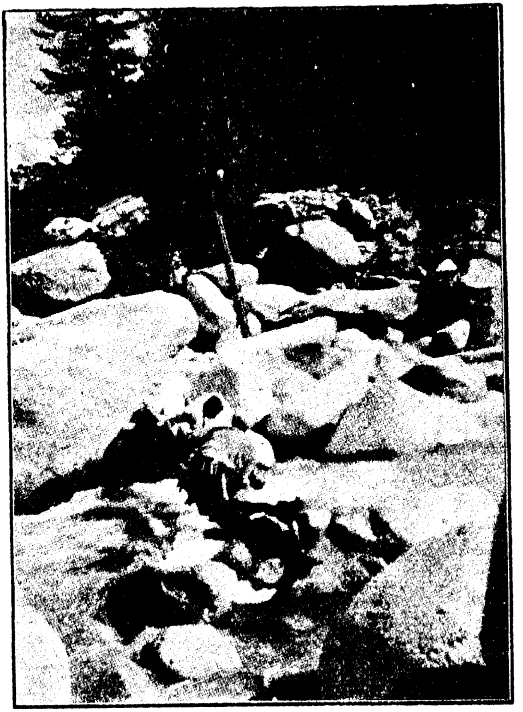
প্রায় ৪ মাইল।

২৪শে অক্টোবর ১৯১৪।

প্রাতঃকাল ত হইল কিন্তু এত শীত যে বিছানার বাহির হইতে সহজে ইচ্ছা হইল না। সঙ্গেকার ছোকরা সকালে চা করিবার জন্য বাল্‌তিতে জল রাখিয়াছিল জল লইতে গিয়া দেখে তাহা জমিয়া বরফ হইয়া আছে। যাহা হউক আজ আবার আর এক পুল প্রস্তুত করিতে হইবে অতএব বেশীক্ষণ দেরী করা হইল না। প্রায় ৯টার সময় আমরা ডেরা ডাণ্ডা উঠাইলাম। রাত্রের শিশির ও বরফে তাম্বুগুলি ভিজিয়া বিশেষ ভারি হইয়াছিল, যে কুলীরা তাম্বু লইয়া যাইতেছিল তাহাদের বোঝা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু আজ আর জিনিস পত্র উঠাইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম না। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে শুষ্ক দেবদারু বৃক্ষের গুঁড়ির অন্বেষন আরম্ভ করিলাম। কিছু অনুসন্ধানের পর আমি একটি গুঁড়ি দেখিতে পাইলাম, তাহার পরিধি প্রায় ২ ফিট্ হইবে। এই গুঁড়িটি

আমার পছন্দ হইল কেননা এরূপ একটি বৃক্ষ হইলেই নদীটি অনায়াসে পার হওয়া যাইবে। আর বৃক্ষটি লম্বায় খুব বেশী না হওয়াতে সকলে মিলিয়া তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে ভাবিলাম। গুঁড়িটির এক মুখ ধরিয়া কিছু টানাটানি করিতেই কিন্তু মড়মড় শব্দ হইয়া উঠিল, তখন বোঝা গেল দেখিতে মোটা হইলে কি হইবে ইহাতেও ঘুণ লাগিয়াছে! পাণ্ডারা আজও পুল নির্ম্মাণে বিশেষ সাহায্য করিল। আমরা যতক্ষণ গাছ খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলাম তাহারা ততক্ষণ নদীর একটি সরু জায়গা বাছিয়া তাহাতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া ছিল। এ পুলটি তাহারা একটি নূতন উপায়ে করিল। নদীর যেস্থানে পুল করা স্থির হইয়াছিল সেই স্থানে নদী প্রায় ১৪।১৫ ফিট চওড়া হইবে। এরূপ স্থলে পুল বাঁধিতে হইলে প্রায় ২০।২২ ফিট লম্বা গাছ না হইলে হইবে না। সেরূপ গাছ পাওয়া গেল না। হয় অনেক বড় গাছ পাওয়া গেল যাহা উঠাইয়া আনা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে অথবা সরু সরু ছোট গাছ পাওয়া গেল যাহা দ্বারা পুল হওয়া অসম্ভব। অবশেষে পাণ্ডারা প্রথমে নদীর কতক অংশ নিম্ন লিখিত উপায়ে বাঁধিয়া ফেলিল। নদীর ধারে ক্রমাগত প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া একটা জমী করিয়া লইল, পরে তাহার উপর প্রায় পাঁচ ফিট লম্বা তিন চারিটি কাঠ রাখিয়া তাহার গোড়ার দিকে

গোমুখের পথে আমাদের প্রস্তুত দ্বিতীয় পুল।



আমাদের দুইজন পাণ্ডা পুল প্রস্তুত করিতেছে। তাহারাই এই পুলের ইঞ্জিনিয়ার।

২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা]

বড় বড় পাথর চাপাইয়া দিল, পরে সেই কাঠ গুলির উপর চওড়া বা এড়ো দিকে কতক গুলি কাঠ রাখিল। এইরূপ যে একটা কাঠের বনিয়াদ প্রস্তুত হইল তাহার এক দিক জলের উপর ঝুলিতে লাগিল ও অপর দিকে পাথর চাপান রহিল। আমরা ইহা দেখিয়া প্রথমে ভাবিলাম ইহাতে কোন কাজই হইবে না, ইহার উপর লম্বা গুঁড়ি ফেলিলেই বা তাহার উপর দিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেই গোড়ার এই কাঠের বনিয়াদ উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু সেই বনিয়াদ প্রস্তুত করিবার পর পাণ্ডারা তাহার অগ্রভাগে, জলের দিকে, দাঁড়াইয়া দেখাইল গোড়ার পাথরের চাপে কাঠগুলি কিরূপ দৃঢ় ভাবে বসিয়া আছে। এইরূপ ভিত্তি করাতে নদীর পরিসর প্রায় ৪।৪॥০ ফিট কমিয়া গেল। তারপর দুই তিনটি ছোট ছোট গাছ যোগাড় করিয়া এইরূপ ভিত্তি হইতে অপর দিকের পাথরের উপর রাখিয়া একরূপ পুল প্রস্তুত হইল। এই পুল প্রস্তুত করিতেও আমাদের প্রায় ২॥০ ঘন্টা লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় সদলে আমরা এই পুল পার হইলাম। পুল পার হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় রাস্তায় চলিলাম। প্রায় ১৷৹ ঘণ্টা চলিবার পর একস্থানে বসিয়া, আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। কুলীরা এক মস্ত আগুণ জ্বালিয়া বিশ্রাম করিল। এখানে

এত ঠাণ্ডা যে রৌদ্র থাকিলেও চুপ করিয়া কোন এক স্থানে বসিয়া থাকিলে শীতে হাত পা জমিয়া যাইবার উপক্রম হয়। শিকারী বলিল এইরূপ স্থানে বড় শিং ওয়ালা ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। তাহা শুনিয়া শৈলেনের শিকারের স্পৃহা বলবতী হইল। শিকারী আমাদের বাম দিকের উচ্চ পর্ব্বতের শিখা দেখাইয়া বলিল উহার উপর উঠিলে পূর্ব্বোক্ত শিকার নিশ্চয় পাওয়া যাইবে কেননা উহারা প্রায় পর্ব্বত শিখরে বরফের উপর থাকে। শিকারের আশায় শৈলেন তাহার উপরই উঠিতে প্রস্তুত, আমি কিন্তু তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলাম। একেত এই ভীষণ রাস্তায় কোনরূপে গন্তব্য স্থান অভিমুখে যাওয়া যাইতেছে ও এইরূপ রাস্তায় চলিতেই যথেষ্ট পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ও সময়ের আবশ্যক হইতেছে। ১ ঘণ্টায় অর্দ্ধ মাইল চলা হইতেছে কিনা সন্দেহ, তাহাতে পথ ছাড়িয়া শিকারের পশ্চাতে ছুটিলে আজিকার আড্ডায় উপস্থিত হওয়া বিশেষ সন্দেহের বিষয়। রাস্তায় যাইতে শিকার মেলে তাহাতে আমার তত আপত্তি ছিলনা, কিন্তু শিকারের চেষ্টায় আমি বৃথা পরিশ্রম করিতে ও সময় নষ্ট করিতে রাজি ছিলাম না। শৈলেন বোধ হয় আমার সহিত একমত হইলনা, বলিল "বন্দুকগুলা মিছা বহিয়া আনা

হইয়াছে”, কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত নিজের মত বজায় রাখিয়া অগ্রসর হওয়াতে সেও অগত্যা, আপাততঃ পর্ব্বত শৃঙ্গারোহণের অভিলাষ ছাড়িয়া দিয়া, আমার সঙ্গেই চলিল। আমি শিকারীকে কিছু উচ্চে যাইতে বলিলাম। আর বলিলাম যদি সে কিছু দেখিতে পায় তাহা হইলে বরং আমরা পাহাড়ে উঠিবার চেস্টা করিব। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর শিকারী আমাদের নিকট আসিয়া উর্দ্ধদিকে পর্ব্বত গাত্রে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল উপরে একটি মৃগ আছে। আমরা উপর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে, প্রায় ১৫০ গজ উর্দ্ধে পর্ব্বত গাত্রে, একটি জন্তু লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতেছে দেখিতে পাইলাম, এক একবার দেখা যাইতে লাগিল ও এক একবার পাহাড়ের গায়ে গাছ গাছড়ার ভিতর মিলাইয়া যাইতে লাগিল। শৈলেন শীঘ্রই বন্দুক উঠাইয়া একটি, দুইটি, তিনটি গুলি চালাইল কিন্তু তাহার ফলে জন্তুটি কেবল দ্রুততর পর্ব্বত গাত্রে উঠিতে লাগিল ও শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। জানোয়ারটিকে একটি ছোট মৃগের ন্যায় দেখিতে, পৃষ্ঠের লোম কাল বলিয়া বোধ হইল। শিকারী ও পাণ্ডারা বলিল এই মৃগের নাভি হইতেই মৃগনাভি হয়। শিকারে ভগ্ন মনোরথ হইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম ও বেলা প্রায় ৩ টার সময় চিরবাসা বলিয়া একস্থানে

উপস্থিত হইলাম। চিরবাসায় বাসার কিছু দেখিলাম না, তবে অনেক ভুজ গাছ আছে। গঙ্গোত্তরীর মন্দির ছাড়িবার পর আপন দলের লোক ছাড়া আর আমাদের জন প্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর হইবারও আশা অতি অল্প। এ অঞ্চল মনুষ্যের বসতির পক্ষে অত্যন্ত অধিক ঠাণ্ডা, আর এপথে যাত্রী কচিৎ আসে তাহাও এ সময় নহে। সেই ভুজ বৃক্ষ রাজির মধ্যে এক স্থানে একটি বৃহৎ চতুস্কোণ প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে, সেটি নিকটস্থ অসমান প্রস্তর খণ্ড হইতে একেবারে স্বতন্ত্র, যেন মনুষ্য হস্তের দ্বারা প্রস্তুত, কেহ যেন একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের বেদী এখানে করিয়া রাখিয়াছে। সেই বেদীরই পাশে কতকটা সমতল ভূমিতে আমরা তাম্বু গাড়িলাম। তাহার নিকট ছাই ও কিছু পোড়া কাঠের চিহ্ন দেখা গেল। পাণ্ডারা বলিল এই স্থান একটা পড়াওয়ের যায়গা। পূর্ব্বে কেহ এখানে আসিয়াছিল তাহাতে আগুণ জ্বালার চিহ্ন রহিয়াছে। শৈলেনের শিকারের সাধ মেটে নাই, তাই সে শিকারীকে সঙ্গে লইয়া শিকারের সন্ধানে গেল। আজ প্রায় দুই ঘণ্টা বেলা এখনও ছিল তাই তাম্বু টাঙ্গান ও বিছানা ও অপর সকল বন্দোবস্ত হইবার পরও বেশ আলো রহিল। আমাদের তাম্বুর সামনেই একটি বড় আগুণ জ্বালিয়া আমাদের

ছোকরা সেইখানেই আমাদের যে অন্ন রন্ধন কার্য্য তাহা করিতে লাগিল। এই ছোকরাটি আমাদের বড়ই কাজে লাগিয়াছিল। সে অত শীত অগ্রাহ্য করিয়া যথা সময়ে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আমাদের চা ও দুইসন্ধ্যা রুটি ও তরকারি প্রস্তুত করিয়া দিত ও খাদ্যদ্রব্য সমস্ত আমাদের বিছানার নিকট আনিয়া দিত। আমরা তাম্বুর ভিতর আমাদের ক্যাম্প খাটের উপর লেপ ও কম্বলে আবৃত হইয়া বসিয়া খাবার খাইতাম। সে আবার খাবার বাসনগুলি পরিষ্কার করিয়া যথা স্থানে রাখিয়া দিত। আমি তাম্বুতে বসিয়া ইহারই কার্য্য দেখিতে লাগিলাম ও আমাদের সঙ্গে যে সিগারেট ছিল তাহারই একটি তাহাকে দিলাম। এদেশের লোককে একটি সিগারেট দিলে যত খুসী হয় একটি টাকা দিলে তত হয় কিনা সন্দেহ। আমি তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। সে বলিল আমাদের চাকরীতে সে খুব সন্তুষ্ট আছে। মুসূরীতে গিয়া সে অপর চাকরীর চেষ্টা করিবে, না পাইলে দেশে যাইবে ইত্যাদি। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে শৈলেন ও শিকারী ফিরিয়া আসিল। শিকার কিছু মিলে নাই। যাহা হোক পর্ব্বতে কিছুদূর উঠিয়া শৈলেনের শিকারের আকাঙ্খা অনেকটা মিটিয়াছিল। এখন তাহার ভাব অনেকটা নরম, বলিল শিকার যত না

হউক তাহার শরীরটা আজ ম্যাজ্‌ম্যাজে বোধ হওয়াতে সে পাহাড়ে চড়িয়া একটু ঘাম বাহির করিতে চাহিয়াছিল তাহা হইয়াছে। আমি একথার প্রতিবাদ না করাতে আর কোন গোলযোগ হয় নাই। পাণ্ডারা বলিল। এস্থান হইতে গোমুখ প্রায় ৪ মাইল, কাল গোমুখ দেখিয়া ফিরিয়া এইখানেই থাকিতে হইবে। আমরা গোমুখের দৃশ্য কল্পনা চক্ষে দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইলাম।

চিরবাসা হইতে গোমুখ।

প্রায় ৪ মাইল।

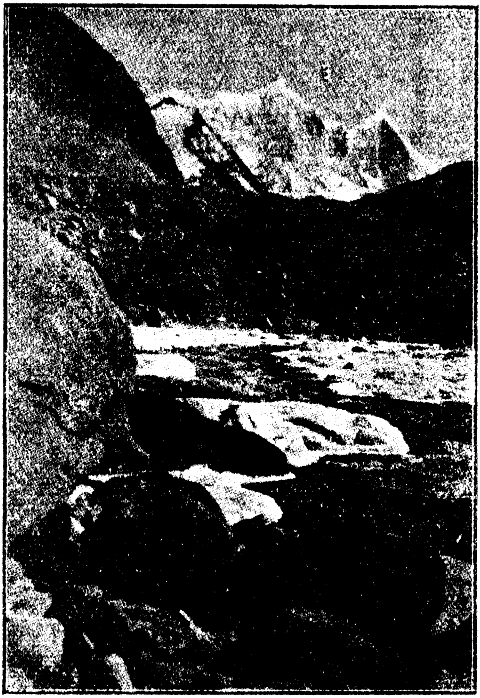
——o——

২৫শে অক্টোবর ১৯১৪ শুক্রবার।

আজ সকালেও অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইল। কল্যকার ন্যায় আজও বাল্‌তিতে জল জমিয়া বরফ হইয়াছিল। আমরা ৮-৩০ মধ্যেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলীরা ও জিনিস পত্র চিরবাসায় থাকিবে ঠিক হইল। আমি, শৈলেন, শিকারী, দুইজন পাণ্ডা ও একজন কুলী গোমুখ অভিমুখে চলিলাম। আজই আমাদের যাত্রার শেষ আজই গোমুখের কল্পনা চিত্র সত্য কিনা দেখিতে পাইব। পাণ্ডারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিল "আপনারা শক্ত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এখন পথ অপেক্ষাকৃত সরল"। চলিতে আরম্ভ করিয়া সরলতার ত কিছু দেখিতে পাইলাম না, পূর্ব্বেরই ন্যায় সেই ভুজবন, সেই মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, সেই ধসা পর্ব্বত গাত্রের আলগা মাটি তাহা ছাড়া আবার কোথাও রাশিকৃত অসমান প্রস্তর খণ্ড। এই প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে, প্রতিপদে দেখিয়া পা না ফেলিলে গর্ত্তের মধ্যে পা পড়িয়া

বিশেষ জখম হইবার সম্ভাবনা। আবার কোথাও প্রস্তর খণ্ডটি এরূপ ভাবে বসান আছে যে তাহার এক পার্শ্বে পা পড়িতেই সেটি একেবারে উলটাইয়া যাইবার জোগাড় হইল। প্রায় ২ ঘণ্টা চলিবার পর আমরা এক বিস্তৃত উপত্যকায় আসিলাম। ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। শিকারী বলিল এইরূপ স্থলে বরার বা বড় শিংওয়ালা পাহাড়ী ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। রাইফ্যাল্‌টি আমাদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু শৈলেনের আজ আর তত আগ্রহ দেখা গেল না। বোধহয় কাল বিকালে বিনা রাস্তায় পর্ব্বতের গা বাহিয়া উপরে উঠার যে কি পরিশ্রম তাহার কতক আভাস পাইয়াছিল। তাই সে আজ আপনা হইতেই শিকারীকে "বরারের" সন্ধানে যাইতে ও পাইলে মারিতে আদেশ দিল। শিকারীও বন্দুক স্কন্ধে পর্বত গাত্র বাহিয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইল। এই লোকটি বাস্তবিকই শিকার ভালবাসে। রাইফ্যাইল্‌টিকে যেন ছেলের মত সযত্নে লইয়া যাইত। সে আমাকে বলিয়াছিল যে তাহার দেশ শ্রীনগর বৃটিশ ঘরওয়ালে। তাহার একটি মুখ দিয়া ঠাসা বন্দুক ছিল তাহার দ্বারাই সে শীকার করিত। এইরূপ বন্দুক অনেক পুরাতন ধরণের, ইহাতে গুলি ঠাসিতে অনেক সময় লাগে ও তারপর একটির

গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের তুষারাবৃত চূড়াদ্বয়।



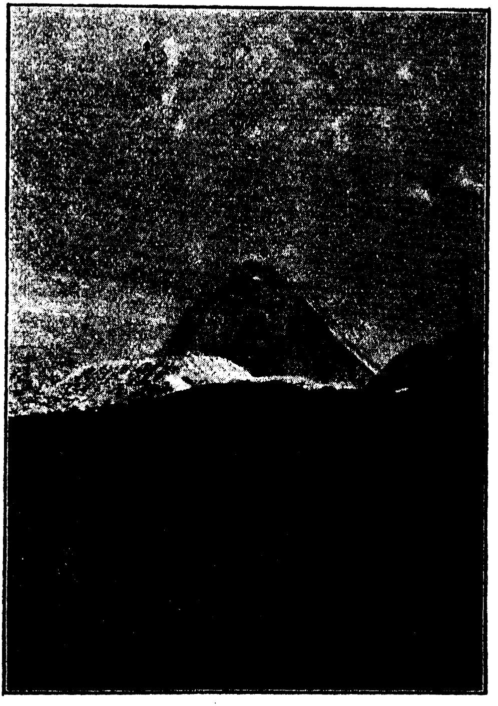
গোমুখ হইতে ২।১ মাইল দূরে এই ছবি লওয়া হইয়াছিল। সম্মুখে প্রাচীরের মত যে একটি পাহাড় নদীতে মিশিয়াছে, এইরূপ কয়েকটি প্রাচীর পার হইয়া আমরা গোমুখ যাইতে পারিয়া ছিলাম। এস্থলে নদীর কিনারায় জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে।

২৮৫, ২৮৬ পৃষ্ঠা]

বেশী আওয়াজ হয় না, সেটি ফস্‌কাইলে শিকারও ফস্‌কায়। কিন্তু তাহার দুঃখ যে তাহার পাস বদলাইবার সময় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে আর পাশ দেয় নাই কাজেই বন্দুক সে আর ব্যবহার করিতে পারে না। সেটি তাহাকে হস্তান্তরিত করিতে হইয়াছে। তাহার ভারি ইচ্ছা এবার পাস হইলে সে আমাদের মত একটি ম্যাগাজিন্ রাইফ্যাল্ কেনে। এই বন্য দেশে হিমালয়ের উপর যেখানে ভল্লুক বা অন্য বন্য জন্তু রাত্রিকালে আপনার রাজত্ব স্থাপন করে এখানেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রাদির সম্বন্ধে এই কড়া হুকুমে আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। আমরা ত বহুকাল হাতিয়ার ছাড়া। এখন একটি বাঁশের লাঠি হাতে লইলে আমাদের হাতে ব্যথা লাগে ও ভদ্র সমাজে যাইতে লজ্জা পাই। ইংরাজ আমাদিগকে পুরুষানুক্রমে নিরস্ত্র করিয়া, আপনাদের শিক্ষিত ও সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা আমাদের ঘেরিয়া রাখিয়া, রোজ আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া গালাগালি দেয়। কিন্তু এই পাহাড়ীদের উপর এত জুলুম কেন বুঝিতে পারিলাম না। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা সম্মুখে কিছু দূরে দুইটি তুষারাবৃত পর্ব্বতের চূড়া দেখিতে পাইলাম। সেই চূড়া দ্বয়ের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া প্রাণ মন যেন আনন্দ ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। উহাই গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের চূড়া। পাণ্ডারা

বলিল ঐ পর্ব্বতের তলদেশ হইতেই জাহ্নবী বাহির হইতেছে। আমাদের দক্ষিণ দিকে আরও একটি তুষার ধবল পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিলাম। পাণ্ডারা সে পর্ব্বতের একটি নাম বলিয়াছিল তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। পাণ্ডারা বলিল এ স্থান হইতে যাহাকে তাহারা গোমুখ বলে তাহা ১ মাইলের কিছু উপর হইবে। আমাদের আন্দাজে তাহা প্রায় দেড় মাইল। এই দেড় মাইল পথেও আমাদের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইল। এখানেও নদীর দুই পার্শ্বস্থ পর্ব্বত নদী হইতে কতক দূরে সরিয়া গিয়াছে। নদীর কিনারা কতক সমতল ও তাহাতে যথেষ্ট বালি আছে। এই বালির উপর কতক দূর চলিয়া এক পর্ব্বতের প্রাচীর আমাদের গতিরোধ করিল। প্রাচীরটি প্রায় ১৫০।২০০ শত ফিট উচ্চ। রাস্তা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রস্তরের খোয়া ভাঙ্গিয়া রাস্তার ধারে এক লাইন করিয়া জমা করিয়া রাখিলে যেরূপ হয় এ প্রাচীরও কতকটা সেইরূপ। এখানে কেবল খোয়ার বদলে সেই আকারের অসমান বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল স্তূপাকারে যেন কেহ সাজাইয়া রাখিয়াছে। খোয়ার গাদার উপর দিয়া যাইতে হইলে যেমন পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা এখানেও অনেকটা তদ্রূপ। প্রস্তর গুলি সেইরূপই অল্‌গা ভাবে বসান আছে পা দিলে সরিয়া

গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের দক্ষিণে একটি তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়া।



এই পর্ব্বতটি গঙ্গোত্তরী শৃঙ্গদ্বয়ের দক্ষিণে ও সম্পূর্ণ ভাবে তুষারাবৃত।

২৮৩ পৃষ্ঠা]

যাইবার সম্ভাবনা। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ী লাঠির দ্বারা আগে পরীক্ষা করিয়া তবে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ স্থানে পর্ব্বতের নিম্নস্তর হইতে নদীর কিনারা পর্য্যন্ত এরূপ পাহাড়ের • প্রাচীর কে প্রস্তুত করিল। সমস্ত প্রচীরটিই ভাঙ্গা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত। এই প্রস্তর খণ্ডের প্রাচীর পার হইয়া আবার কতকটা বালুকাময় সৈকত ভূমি পাইলাম তাহার পর আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় আর একটি প্রাচীর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রায় ৫।৬টি প্রাচীর পার হইয়া আবার নদী কিনারায় কতক সমান জমী পাইলাম। এখানে নদীর কিনারায় জল জমিয়া বরফ হইয়াছে, বরফের পর আবার জলের স্রোত। বরফ দেখিয়া মনে হইল আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে হয়ত দেখিতে পাইব যে সমস্ত নদীটি জমিয়া বরফ হইয়াছে। এখান হইতে আরও দুইটি প্রস্তরের প্রাচীর পার হইয়া আমরা গোমুখে পৌঁছিলাম। এ যেন পূর্ব্বকালের রাজবাড়ীর একটির পর একটি করিয়া সাতটি দেউড়ি পার হইয়া অবশেষে রাজ সমীপে উপস্থিত হইলাম। সে এক অদ্ভুৎ স্থান। এতক্ষণ নদীর দুই পার্শ্বে পাহাড় ছিল এখন যেন নদীটি বাম পার্শ্বে অল্প ঘুরিয়া গিয়া একটি পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর আর নদী দেখা যায় না।

যমুনোত্তরী

যেখানে পাহাড়ের নীচে দিয়া নদী বাহির হইতেছে আমরা সেই পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে নদী বক্ষে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া এই পবিত্র সলিলা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া ধন্য হইলাম। দেখিলাম আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বরফের পাহাড়। এই বরফ তুষারের ন্যায় নরম ও ধবল নয়, ইহা জমাট বাঁধা নীল আভা যুক্ত বৃহৎ বরফের চাঁই দিয়া প্রস্তুত। নদী বক্ষ হইতে যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দ্দিকেই খালি বরফের পাহাড়। আমরা যথায় নদী বক্ষে প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছি তাহার ১০।১২ ফিট পরেই নদী সেই বরফের পাহাড়ের নিম্নে অদৃশ্য হইয়াছে। নদী এখানেও ৩৫।৪০ ফিট চওড়া, ও অতি বেগে প্রবাহিতা, দেখিয়া মনে হয় পর্ব্বতের নিম্নে অনেক দূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের আর অগ্রসর হওয়া সাধ্য নয়, ১০।১২ ফিটের মধ্যেই সেই বরফের পর্ব্বত, সে পর্ব্বতের অভ্যন্তরে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে। সম্মুখের সেই বরফের পর্ব্বতের নিম্ন স্তরটি প্রায় ৪০।৪৫ ফিট উচ্চ। আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহার বাম দিক দিয়া বরফের পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। একবার ইচ্ছা হইল যে এই বরফের পর্ব্বতে কতকদূর উঠিয়া দেখা যাক নদীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা। আর এইরূপ ইচ্ছা হইবার

গোমুখ।



সম্মুখে বরফের পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে গঙ্গা বেগে প্রবাহিতা। গঙ্গা বক্ষে প্রস্তর খণ্ড সকল পড়িয়া আছে। ছবির বামদিকে একটি বৃহৎ বরফের গুহা দেখা যাইতেছে।

২৮৮ পৃষ্ঠা।

একটি কারণও ছিল। সম্মুখের বরফের পাহাড়ের নিম্ন স্তরের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি বৃহৎ গুহার মত দেখিলাম। গুহাটিও বরফের, যতদূর দৃষ্টি যায় গুহার অভ্যন্তরে ক্রমশঃ গাঢ় নীল রঙের বরফ। একবার ইচ্ছা হইল যে বরফের উপর উঠিয়া গুহার নিকট যাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু পাণ্ডারা বারণ করিল। তাহারা বলিল এই বরফের পাহাড়ে তাহারা কাহাকেও চড়িতে দেখে নাই, কোন রাস্তায় উপরে যাইতে হয় তাহাও তাহারা জানে না। পাণ্ডারা আরও দেখাইল সম্মুখেই যে বরফের প্রাচীরের মত পাহাড় তাহার উপর ছোট বড় অনেক প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে, তাহার কতকগুলি একেবারে ধারে রহিয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপে চারি দিকেরই বরফ অল্প অল্প গলিতেছে ও তাহাতে এই সকল প্রস্তর খণ্ড মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়া ভীষণ বেগে নদী গর্ভে পড়িতেছে। তাহা ছাড়া এরূপ বরফের পাহাড়ের উপর উঠিবার আয়োজনও আমাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না। বরফের উপর উঠা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হওয়াতে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। পাণ্ডারা গোমুখের এক নূতন অর্থ বলিল। তাহারা বলিল "গো" অর্থে "পৃথিবী"। গঙ্গা এই স্থানে পৃথিবী হইতে নির্গত হইতেছে বলিয়া এই স্থানকে গোমুখ বলে। বাল্যকালের

কল্পনার গরুর মুখের কিছুই এখানে দেখিতে পাইলাম না। এই বরফের পর্ব্বতের অভ্যন্তরে গঙ্গার উৎপত্তি কিরূপ ভাবে হইতেছে তাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষের তিনটি মহানদী গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের উত্তরে তিব্বৎ দেশে প্রায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নদীর গতি অনুসরণ করিয়া যত দূর যাওয়া যায় আমরা তত দূর গিয়াছিলাম তারপর গঙ্গার অস্তিত্ব চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর। তবে কেহ যদি সেই বরফের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারেন তাহা হইলে তিনি আবার গঙ্গাকে দেখিতে পাইবেন কিনা জানি না। যমুনোত্তরীতে যেমন উচ্চ তুষারাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে তিনটি ধারা পড়িয়া নদী গর্ভে জমাট বরফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে এবং প্রায় ১ মাইল চক্ষুর অগোচরে সেই বরফের অভ্যন্তর দিয়া আসিয়া বরফের পাদমূলে বেগবতী স্রোতঃস্বতী যমুনা নদীরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এখানেও বোধ হয় সেইরূপ তুষার মণ্ডিত গঙ্গোত্তরী শৃঙ্গের তুষার রাশি দ্রবীভূত হইয়া, ক্রমিক বর্দ্ধিত কলেবরে, পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া, অবশেষে পর্ব্বতের পাদ দেশে বা নিম্নস্তরে অবস্থিত বরফ রাশির

গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদ্বয়।



গোমুখের পথে ইহারাই আমাদের প্রধান সহায় ছিল।

[২৯১ পৃষ্ঠা]

অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোমুখে বরফ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমরা এখানে ১ ঘণ্টাকাল থাকিয়া সেই বরফের পাহাড়, নদী ও কিরূপে নদী পাহাড়ের নীচে দিয়া ভীষণ বেগে বাহির হইতেছে তাহা দেখিতে লাগিলাম। যেখান হইতে নদী বাহির হইতেছে সেখানে নদীর জল ও বরফের মধ্যে কিছুই ব্যবধান নাই, বোধ হইতেছে যেন বরফ গলিয়াই জল আসিতেছে। কিন্তু অতস্রোত থাকাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে জলস্রোত অনেক দূর হইতে আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানেও গঙ্গার জল কিছু ঘোলা। কিন্তু যমুনোত্তরীতে যমুনার জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার। আমরা এই গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের অনেক গুলি ছবি লইলাম। চারি দিকেই বরফের পাহাড় কিন্তু রৌদ্র থাকাতে শীতে কোন কষ্ট হয় নাই। পাণ্ডারা এখানে গঙ্গার তুষার শীতল জলে স্নান করিল। নদীর ধারে বা নদী মধ্যস্থ প্রস্তর খণ্ডের পার্শ্বে যেখানে জলের বেগ তত নাই তথাকার জলের উপরিভাগ জমিয়া বরফ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বলিল "এমন পুণ্য স্থানে কচিৎ আসা হয় অতএব এখানে আসিয়া স্নান না করিয়া তাহারা যাইবে না"। আমরা দুইজন ও শিকারী ও আমাদের সঙ্গেকার কুলীরা সকলে জল স্পর্শ করিয়া লইলাম। আমরা যে একটি কুলীকে সঙ্গে আনিয়া

ছিলাম তাহা ছাড়া আর চারটি কুলী আমাদের পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা মাল রাখিয়া স্থধু হাতেই আসিয়াছিল। এতদূর আসিয়া গোমুখ দেখিবার বাসনা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে তাহারা আসিয়াছিল। কুলীরা প্রত্যেকে পাণ্ডাদের দুই চারিটি পয়সা দিয়া কিছু মন্ত্র বলাইয়া লইল। আমাদের অভীষ্ট এত দিনে সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহার পর কতকটা যেন উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া পড়িলাম। মনটা যেন কতক খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। পরীক্ষার্থিরা যখন কোন কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় একাগ্র চিত্তে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দুরূহ পুস্তক সকল আয়ত্ব করিতে থাকে, তখন তাহাদিগের অন্য কোন বিষয় ভাবিবার অবকাশ বা ইচ্ছা থাকে না। আমরাও সেইরূপ যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ রূপ পরীক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া প্রায় মাসাবধি একাগ্র চিত্তে হিমালয়ের দুরূহপথ অতিক্রম করিতে নিযুক্ত ছিলাম, অন্য কোন বিষয় ভাবিবার ইচ্ছা বা অবকাশ ছিল না। তার-পর পরীক্ষা শেষ হইলে পরীক্ষার্থিরা যেমন কিছু দিনের জন্য উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া পড়ে ও তাহাদের মন খালি খালি বলিয়া বোধ হয় আমাদের ও কতকটা সেইরূপ ভাব হইল। কিন্তু অধিকক্ষণ সেভাব রহিল না। যখনই মনে হইল যে ১১।১২

দিনের মধ্যে এই দুরূহ পথে প্রায় ১৪৫।১৫০ মাইল চলিয়া মুসূরী পৌঁছিতে হইবে তখন আবার এক নূতন উদ্দেশ্য আসিয়া পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিল ও পূর্ব্ব উদ্দেশ্য অপেক্ষা ইহা যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিল। মনে হইল এতকষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে সকল অদ্ভুৎ দৃশ্য এই মাসাবধি দেখিয়াছি তাহার গল্প দেশে গিয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের নিকট করিতে না পারিলে যেন সে সমস্ত ব্যর্থ হইল। এই দুর্গম পথে আসিবার সাহস বল ও সামর্থ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর উত্তরকাশী হইতে গোমুখের জল লইয়া যাইবার জন্য আমরা পিতলের লম্বা গলাযুক্ত যে সকল পাত্রি আনিয়া ছিলাম তাহাতে একেবারে নদী যেখানে বরফের নীচে হইতে বাহির হইতেছে সেই স্থানের জল ভরিয়া লইলাম। তাহা ছাড়া আমার কাছে একটি বড় কাঁচের শিশি ছিল তাহাতেও এক শিশি জল লইলাম। অতঃপর গোমুখের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফিরিলাম। মনে হইল এ জীবনে হয়ত এতদূর আর আসিব না, ভবিষ্যত কে বলিতে পারে! কিন্তু হিমালয় মধ্যে মধ্যে এমন আকর্ষণ করেন যে আবার ও পথে যাওয়া অসম্ভব মনে করি না। কিয়ৎ দূর আসিয়া নদী তীরে বালির উপর বসিয়া আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। রৌদ্র

বেশ ছিল তাহাতে ঠাণ্ডার জন্য কিছুই কষ্ট বোধ হইল না। নদীর কিনারা হইতে কিছু বরফ আনিয়া এক গ্লাসে রাখিলাম, ইচ্ছা রৌদ্রে বরফ গলিয়া জল হইলে পান করিব। কিন্তু সে বরফ গলিল না। চিরবাসায় আমাদের তাম্বুর নিকট ফিরিতে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লাগিল। যাইবার সময় এই পথেই প্রায় ৩ ঘণ্টার উপর লাগিয়াছিল। এখন রৌদ্র গিয়া আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা শীঘ্রই আমাদের রাত্রের খাবার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া হাত মুখ ধুইয়া রাত্রের জন্য কাপড় বদলাইয়া তাম্বুর মধ্যে বসিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রথমে বজ্‌রী অর্থাৎ বৃষ্টি জমিয়া ছোট ছোট দানার মত বরফ পড়িতে লাগিল, তার অল্প পরেই তুষার পাত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে তুষার পাত হিমালয়ে ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না তাহাও শীতকালে। অত শীত সত্বেও আমরা একবার তাম্বুর বাহিরে আসিয়া তুষার পাত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম চতুর্দ্দিকে পেঁজা তুলার মত সাদা সাদা বরফ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে পড়িতেছে। তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে শীত কিন্তু অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেল। রাত্রের ভোজন সমাপন করিয়া, তাম্বুর দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া, আমরা বিছানার

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের ছোকরা বলিল খুব জোরে তুষার পড়িতেছে। আজ কিন্তু অন্য দিনের অপেক্ষা কম শীত বোধ হইল। তাম্বুর উপর বরফ পড়ার শব্দ শুনিতে শুনিতে আমরা নিদ্রিত হইলাম।

যমুনোত্তরী

চিরবাসা হইতে গঙ্গোত্তরী

প্রায় ৮ মাইল।

২৬শে অক্টোবর ১৯১৪।

প্রাতঃকালে উঠিয়া তাম্বুর দরজা খুলিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। গত রাত্রের তুষার পতনে চতুর্দ্দিক একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনও অন্ধকার, আরও তুষার পাত আশঙ্কা করিয়া আমরা তখনই গঙ্গোত্তরী অভিমুখে যাত্রা স্থির করিলাম। কেননা বেশী বরফ পড়িলে রাস্তায় কোথায় গর্ত্ত কোথায় আল্‌গা পাথর এ সকল কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না কাজেই বরফ আবার গলিবার পূর্ব্বে যাত্রা এক প্রকার অসম্ভব হইবে। তাম্বুর উপর প্রায় ২।২॥০ ইঞ্চি তুষার জমিয়া ছিল লাঠির দ্বারা ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া অনেক ফেলিয়া দেওয়া হইল। গুঁড়া লবণের ন্যায় সেগুলি তাম্বুর চতুর্দ্দিকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ঝাড়িয়া সব নিঃশেষ করা গেল না কতক তাম্বুতে লাগিয়া রহিল। তাম্বু দুইটি ভিজিয়া অত্যন্ত ভারি হইয়া ছিল, তাহাতে তাম্বুর কুলীদের বিশেষ কষ্ট হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাম্বুর জন্য দুইটি শক্ত কুলী

ছিল ও তাহারা নির্ব্বিবাদে সে ভিজা তাম্বু জড়াইয়া পৃষ্ঠে লইয়া চলিল। এখন সকলেই ফিরিবার জন্য ব্যস্ত সেইজন্য একটু অসুবিধা ভোগ করিয়া অগ্রসর হইতে কেহই অরাজি নয়। আমরা যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম তখন অল্প অল্প তুষার পড়িতেছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা থামিয়া গেল ও পশ্চিমে নীল আকাশও অল্প দেখা গেল। পাণ্ডারা তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বলিল "এইবার মেঘ কাটিয়া গেল আর বরফ পড়িবেনা"। শিকারী আজ আমাদের অগ্রেই বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুলটির নিকট আসিয়া দেখিলাম সে একটি চিতার ন্যায় প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া আছে। আগুন পাইয়া সকলেই সেই আগুনের নিকট গিয়া বসা গেল। আজ চলিবার সময়ও বিশেষ শীত বোধ হইয়াছিল হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। দিনের খাওয়া এখানে শীঘ্র সারিয়া লইয়া আবার অগ্রসর হইলাম, উদ্দেশ্য যত শীঘ্র পারা যায় গঙ্গোত্তরী পৌঁছান। আমরা পুলটি পার হইয়া একবার তাহাকে শেষ দেখিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। মনে হইল উহা অপর কাহারও কাজে লাগিবে কিনা কে জানে। যদি আমাদেরই মত অপর কোন যাত্রী এপথে আসিয়া এই পুল দেখিতে পায় তাহারা অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইবে এবং পুল

নির্ম্মাতাকে অর্থাৎ আমাদের ধন্যবাদ দিবে। অপর পার দিয়া কিছুক্ষণ চলিবার পরই আকাশ আবার তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। আমরা যত শীঘ্র পারি চলিতে লাগিলাম কিন্তু এপথে মনে করিলেই ত দ্রুত চলা যায় না। পাহাড়ের পূর্ব্বোক্ত ধসা স্থানটিতে আসিয়া শৈলেন হঠাৎ গড়াইয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল। সে যতই পা তুলিয়া উপর দিকে উঠিতে চেষ্টা করিল মাটি ততই ধসিয়া সে নীচের দিকে নামিতে লাগিল। আমি তখনও পাহাড়ের শক্ত জায়গায় ছিলাম সেখান হইতে পাহাড়ী লাঠিটি বাড়াইয়া দিতে সে তাহা ধরিল। একজন পাণ্ডা গিয়াও পশ্চাৎভাগ হইতে তাহাকে কতক সাহায্য করাতে কোন মতে আস্তে আস্তে অপেক্ষাকৃত শক্ত স্থানে উঠিল। আমরা প্রথম পুলটির নিকট আসিবার কিছু আগে হইতে আবার তুষার পড়িতে লাগিল। যখন পুলের নিকট আসিলাম তখন তুষার অত্যন্ত ঘন ভাবে পড়িতে লাগিল। আমাদের টুপি ও জামা শীঘ্রই সাদা হইয়া গেল। পুলের কাঠগুলির উপরও তুষার পড়িয়াছিল তাহাতে আর এক বিপদ হইল, সেগুলি পিচ্ছিল হইল। কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখানে কোনরূপ আচ্ছাদন না থাকাতে নদী পারে যাওয়াই স্থির হইল। শৈলেন সকলের শেষে

পার হইতেছিল পুলের প্রথম অংশটি পার হইবার সময় বরফে তাহার পা হড়্কাইয়া দুইটি কাঠের মধ্যে একটি পড়িয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেল। অবশিষ্ট কাঠটির উপর বসিয়া বসিয়া অতি কষ্টে সে কোনরূপে পার হইল। অপর পারে আসিয়া দেখিলাম পাহাড়ের পার্শ্বে একটি গুহার মত স্থানে শিকারী একটি আগুন জ্বালিয়াছে ও কুলীরা সকলেই মোট ফেলিয়া সেই আগুণের পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। তাহাদেরই বা অপরাধ কি, তাহারা পাহাড়ী শীতে কতক অভ্যস্ত কিন্তু তথাপি নগ্ন হস্ত পদে তুষার পাতের মধ্য দিয়া কতক্ষণ চলিতে পারিবে। এই আশ্রয়হীন বরফ রাশির মধ্যে আশ্রয় ও উত্তাপ পাইয়া তাহারা ছুটিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এখান হইতে গঙ্গোত্তরী প্রায় ২॥০।৩ মাইল হইবে। আমরা বসিলে কুলীরা আর উঠিতে চাহিবে না, ও বরফ যত অধিক পড়িবে রাস্তা তত অদৃশ্য হইবে এই ভাবিয়া আমরা আর দাঁড়াইলাম না। দুইজন পাণ্ডা ও আমরা দুইজন সেই তুষার পাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। এখন আর বেশী ঠাণ্ডা বোধ হইল না। কেবল হাত দুটি খোলা থাকাতে বরফ ও বরফের জল লাগিয়া প্রায় নীল বর্ণ হইল। মাঝে মাঝে একটি হাত পেণ্ট্যালুনের পকেটে পুরিয়া একটু গরম করিয়া লওয়া

গেল। কিন্তু হাত না হইলেও আজ চলা অসম্ভব। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমানে হাত ব্যবহার করিতে হইল। বরফে প্রায়ই পদস্খলন হইতে লাগিল। কখনও বা সমান রাস্তা বলিয়া বরফের উপর পা দিতে পা প্রায় ১।১॥০ ফুট, বসিয়া গিয়া পড়িয়া গেলাম, কখনও বা বড় পাথরে উঠিতে হইল, এই সকল সময়েই হাত ব্যবহার করিতে হইল, ইহা ছাড়া লাঠিটিত হাতে ছিলই। আজ চলিতে চলিতে পদস্খলন হইয়া যে কতবার পড়িয়াছিলাম তাহার সংখ্যা নাই। আমি একবার পড়িতেছি দেখিয়া শৈলেন হাসিতেছে আবার পরক্ষণেই তাহারও সেই অবস্থা কাজেই পড়ার জন্য হাসি আমাদের শীঘ্রই বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু এত অসুবিধার মধ্যেও চতুর্দ্দিক তুষারাবৃত হওয়াতে যে এক অদ্ভুত শোভা হইয়াছিল তাহা মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। গাছ পালা পাহাড় সব সাদা ওড়ানায় ঢাকা। সূর্য্যের রশ্মি নাই কিন্তু চতুর্দ্দিকার শুভ্র বরফ হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া এক সুন্দর শ্বেত আভা নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিককার দৃশ্য যেন এক স্বর্গীয় আলোকে বিভাসিত করিয়াছে। এ আলোকে স্নিগ্ধতা আছে তেজ নাই। আরও ১ ঘণ্টা চলিবার পর তুষার পাত থামিল এবং গঙ্গোত্তরীর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম তুষার গলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

গঙ্গোত্তরী ও

অবশেষে গঙ্গোত্তরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া গেল। আনন্দে আমাদের শরীর ও হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। গোমুখের দুরুহ পথ শেষ করিয়া ফিরিয়াছি বুঝিতে পারিলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। মন্দিরের পাণ্ডারা আমাদিগকে এই বরফের মধ্য দিয়া ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। তাহারা শীঘ্রই আমাদের জন্য একটি আগুন প্রস্তুত করিয়া দিল। আগুনের ধারে বসিয়া আমাদের ভিজা জুতা ও মোজা খুলিয়া হস্ত পদ গরম করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমাদের কুলীরা একে একে দেখা দিল। আমরা আমাদের পূর্ব্বেকার ধর্ম্মশালাটিতে আশ্রয় লইলাম। গোমুখের পথে আমাদের সঙ্গেকার পাণ্ডাদ্বয় আমাদের প্রধান সহায় হইয়াছিল। পথ দেখান, পুল প্রস্তুত করা, হাত ধরিয়া পিচ্ছিল পাথরের উপর উঠিতে সাহায্য করা, অবশেষে অল্প যে পথের চিহ্ন ছিল তাহা যখন বরফে ঢাকিয়া গেল তখন অগ্রে অগ্রে চলিয়া পথ নির্দ্দেশ করা, এ সকল এ পাণ্ডারা ছাড়া অপর কেহ করিতে পারিত বলিয়া আমার বোধ হয় না। কুলীরা ও শিকারী এ পথের কিছুই জানিত না। গোমুখ যাইবার সময় যে সকল পাণ্ডা সেখানে পূর্ব্বে গিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুই একটিকে সঙ্গে লওয়া নিশ্চয় উচিৎ।

যমুনোত্তরী

প্রত্যাবর্ত্তণ।

২৭শে অক্টোবর ১৯১৪, রবিবার। গঙ্গোত্তরী হইতে হরশিল্, প্রায় ১৪ মাইল। আমার বক্তব্য ফুরাইয়াছে। গঙ্গোত্তরীর পথে আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমার ক্ষমতা মত যতদূর সম্ভব বর্ণনা করিয়াছি। এইখানেই এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিলেই হইত। কিন্তু ফিরিবার পথের দুই চারিটি কথা পাঠকের ভাল লাগিতে পারে এই বিশ্বাসে সংক্ষেপে ফিরিবার পথের কথা বলিব। এখন সকলেই ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা ৮দিনে যাহাতে মুসূরী ফেরা যায় সেইরূপ হিসাবে চলিব ঠিক করিলাম। এইজন্য আমাদের দিন প্রায় ১৪ মাইল পথ চলিতে হইবে। ধরাসুর নিকট হইতে যে পাকদাণ্ডির পথ লালুরী হইয়া মুসূরী হইতে ৬ মাইল দূরে মুসূরীর রাস্তায় মিলিয়াছে সেই পাকদাণ্ডির পথে যাওয়াই স্থির হইল। এখন আর আমাদের পাকদাণ্ডির পথ শক্ত বোধ হয় না। যাইবার পূর্ব্বে গঙ্গোত্তরীর মন্দির গুলির দুই তিন খানি ছবি লইলাম, তারপর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া কিছু প্রণামী দিয়া ফিরিলাম। গঙ্গোত্তরী হইতে জাংলা পর্য্যন্ত পথ কিছু শক্ত, তাহাতে অনেক

চড়াই ও উৎরাই আছে। আজ ভৈরবঘাটি আর তত ভীষণ নয় কেননা আজ উৎরাই। জাংলা হইতে হরশিল্ পর্য্যন্ত রাস্তা অতি সুন্দর ও সহজ, কাজেই আজ ১৪ মাইল চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। ধরালীর নিকট প্রায় হরিষে বিষাদ হইবার জোগাড় হইয়াছিল। শৈলেন আমার আগে আগে যাইতে ছিল। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে কোন জানোয়ার দেখিয়া সে দাঁড়াইল ও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া দ্রুত শিকারীর উদ্দেশ্যে চলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলে কেবলমাত্র বলিল "ভাল্লুক" ও দূরে শিকারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে শীঘ্র আসিতে ইঙ্গিত করিল কেননা রাইফ্যাল্টি শিকারীর নিকট ছিল। শিকারী আসিতে যতক্ষণ বিলম্ব হইল আমি সেই অবসরে অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভাল্লুক কোথায় আছে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। উপরে পাহাড়ের গায়ে চাহিয়া দেখি বড়বড় ঘন কাল লোমযুক্ত একটি জানোয়ার প্রায় স্থির হইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলেই প্রথমে ভাল্লুক বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক নিবিড় জঙ্গলময় স্থানে যদিও ভাল্লুকের ময়লা, পায়ের দাগ ও অপর চিহ্ন দেখিয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাত্রে বা সন্ধ্যাকালে বা দিনের বেলায় কখনও ভাল্লুক দেখি নাই। সেই জন্য ধরালী গ্রামের এত

নিকটে দিন দুপুর বেলায় একটি ভাল্লুক দেখা গেল, ও সে স্থির ভাবে প্রায় একই যায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিয়া আমার কিছু সন্দেহ হইল। আমি আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করাতে দেখিতে পাইলাম যে উপরিউক্ত জানোয়ারটি একটি কাল পাহাড়ী গরু, পাহাড়ের গায়ে চরিতেছে। এই সকল গরু চমরী গরুর ন্যায় লোমযুক্ত ও তাহাদের ন্যায় ইহাদেরও মোটা লোমের ল্যাজ্ আছে। আকারে দিশি গরু অপেক্ষা কিছু ছোট। জানোয়ারটির জাতি নির্ণয় করিয়া আমার অত্যন্ত হাঁসি পাইল, কিন্তু একেলা থাকাতে এমন একটা জ্যান্ত কমিডি (Comedy) উপভোগ করা গেল না। এই শীকার কাহিনী উত্তরকাশী গিয়া সতীশের নিকট ও পরে ফণী ও অপর বন্ধুদের নিকট বিস্তৃতভাবে বলিব স্থির করিয়া শৈলেনকে চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। সে বোধ হয় শীকার চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া কিছু বিরক্তির সহিত অগ্রসর হইল। নিকটে আসিলে আমি বলিলাম "আর শিকারে প্রয়োজন নাই"। সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন"। তাহাতে আমি উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলাম ও বলিলাম "ও জানোয়ারকে মারিলে গ্রাম বাসিরা আমাদের সহজে ছাড়িবে না"! ততক্ষণ সে গরুটিকে দেখিতে পাইয়াছিল কাজেই আর কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইল।

গঙ্গোত্তরী ও

আমার বোধ হয় যে মুহূর্ত্তে সে যাত্রা করিয়াছিল তাহা শিকারের পক্ষে অতি অশুভ, কেননা এ যাত্রায় তাহার শিকারের কিছুই সুবিধা হয় নাই। হর্‌শিলের বাংলায় ৫টার সময় পৌঁছিলাম। গিয়া শুনিলাম ফণী ও সুত্যেনদের সঙ্গেকার দুইটি কুলী আপেল চুরী করিয়া ধরা পড়াতে উত্তরকাশী চালান হইয়াছে। হর্‌শিলের বাংলার দ্বিতলের একটি ঘরে আমরা আশ্রয় লইলাম। ঘরটিতে আগুণ জ্বালিবার যায়গা রহিয়াছে ও চারিদিকে সারসি আছে, সেই জন্য বাহিরে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইলেও ঘরের মধ্যে আমরা তত শীত অনুভব করিলাম না। ঘরটি দেখিয়া বিলাতের বাড়ী ঘরের কথা মনে পড়ে।

২৮শে অক্টোবর ১৯১৪, সোমবার। হর্‌শিল হইতে গাঙ্গ্‌নানী, প্রায় ১৪ মাইল। আজিকার ১৪ মাইল চলিতে কিছু কষ্ট বোধ হইল। মধ্যে সুকীর চড়াইটি অতি সুদীর্ঘ ও উচ্চ। গাঙ্গ্‌নানীতে পণ্ডিত হরিদত্ত শাস্ত্রী নামক গঙ্গোত্তরী মন্দিরের সুপারিণ্টেণ্ডেটের সহিত আলাপ হইল। তিনি ও উত্তরকাশী যাইতে ছিলেন, সঙ্গে দাণ্ডি ছিল। তিনি আমাদের অনেক আপ্যায়িত করিলেন, সংস্কৃত শ্লোক অনেক আওড়াইলেন, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লাগিল তাঁহার ডালের বড়া, বড়ি ও তরকারী। অনেক দিন হইতে খালি কুমড়া ও রুটি কেবল ক্ষুধার চোটে খাইতে

হইয়াছিল, আজ এই সব জিনিষ পাইয়া অতি তৃপ্তির সহিত খাওয়া গেল। পণ্ডিতজী যাহা পাঠাইয়া ছিলেন তাহা আনিবামাত্রেই নিঃশেষ হইল, কিন্তু লজ্জার খাতিরে আর চাওয়া গেল না, অবশিষ্ট ক্ষুধা আমাদের কুমড়া ও রুটি দিয়াই মিটান হইল।

২৯ শে অক্টোবর সোমবার। গাঙ্গনানী হইতে সাইচি, প্রায় ১২ মাইল। আজ ও পথ চলিতে আর ভাল লাগিল না কেননা সেই পুরাতন পথ। ভাটোয়ারীর বাংলায় পণ্ডিতজির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। পণ্ডিতজী তাঁহার লিখিত খস্ড়া হইতে আমাদের অনেক শ্লোক শুনাইলেন। বলিলেন, তিনি টিহরীর একটি ভূগোল লিখিয়াছেন; ও সেখানি যদি আমরা কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া দি তাহা হইলে তাঁহার বড় উপকার হয়, টিহরীতে ছাপাইবার তেমন সুবিধা নাই। পুস্তকটি দেবনাগরীতে লেখা। আমি তখনও পূর্ব্ব রাত্রের বড়ার কথা ভুলিতে পারি নাই কাজেই পুস্তক ছাপাইবার ভার লইলাম। পণ্ডিতজীও নিশ্চিন্তভাবে খস্ড়াটি আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন ভাবি নাই ভারটি কত গুরু হইবে। কিন্তু এক বৎসর পরে পণ্ডিত প্রবর যখন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পুস্তকের ৫০০ কপি ছাপাইয়া লইয়া গেলেন ও পরে ছাপাখানার বিলটি সম্পূর্ণ আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল,

তখন ভার নিতান্ত লঘু মনে হয় নাই। যাহা হউক সেই গাঙ্গ্‌নানীর বড়ার কথা ভাবিয়া তাহা বহন করিয়া ছিলাম, আর না করিয়াই বা করি কি, পণ্ডিতজীকে ধরিতে হইলে ত আবার গাঙ্গ্‌নানী যাইতে হইত। ভাটোয়ারী হইতে আরও তিন মাইল আসিয়া সাইচি নামক গ্রামের নিকট এক ক্ষেতের উপর তাম্বু গাড়া গেল। সঙ্গে তাম্বু থাকাতে আমরা পড়াও ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়া ছিলাম।

৩০শে অক্টোবর ১৯১৪, মঙ্গলবার। সাইচি হইতে উত্তর-কাশী, প্রায় ১৪ মাইল। আজও পুরাতন পথ। বেলা আন্দাজ ৪॥০টার সময় আমরা উত্তরকাশীতে পৌঁছিলাম। কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় গিয়া সতীশকে পাইলাম। সে আমাদের দেখিয়া বলিল "তোরা সত্য সত্যই বাঁচিয়া ফিরিয়াছিস যে দেখিতেছি আমিত এখানে শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যবস্থা করিতেছিলাম"। তাহার নিকট শুনিলাম যে ফণী ও সত্যেনও গঙ্গোত্তরী হইতে ৪ দিনে উত্তর কাশী আসিয়াছিল। তাহারা আর ৫ দিনে মুসূরী যাইবার স্থির করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সতীশ বলিল যে পূর্ব্বোক্ত ডেপুটির সঙ্গে তার খুব আলাপ হইয়াছে ও সে তাহার সহিত অত্যন্ত ভদ্রতা করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ডেপুটি ও পণ্ডিত হরিদত্ত আসিয়া

আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত বলিয়া শীঘ্রই চলিয়া গেলেন। আমরা ধর্ম্মশালার চওড়া বারাণ্ডায় আমাদের ক্যাম্প খাট বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। যদিও বারাণ্ডায় পরদা বা কোনরূপ আবরণ ছিল না তথাপি আমরা ঘরের মধ্যে শুইতে রাজি হইলাম না। সতীশ একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সে তথায়ই রহিল। সে বলিল, "তোমরা গোমুখের ফেরৎ উত্তর মেরুতেও যেতে পার, তোমাদের কোনরূপ ছাদের নীচেই শোয়া উচিৎ নয়, কিন্তু আমাদের রক্ত মাংসের শরীর কাজেই কোনরূপ আশ্রয়ের মধ্যে না থাকিলে নিমোনিয়া হইয়া মরিব"।

৩১শে অক্টোবর ১৯১৪, বুধবার। উত্তরকাশী হইতে রেণাপাণি, প্রায় ১০ মাইল। পর দিন প্রাতঃকালে আর আমাদের যাওয়া হইল না। ডেপুটি বাবু আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি করিয়া এক দিনের জন্য আমাদের থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আমরা কোন মতেই রাজি না হওয়াতে বলিলেন যে, অন্ততঃ তাঁহার বাড়ীতে প্রাতঃকালের ভোজন করিয়া যাইতে হইবে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতে বলিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার অমায়িকতায় বাধ্য হইয়া তাঁহার উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। এখানে

পূর্ব্বকাশীর ন্যায় মণিকর্ণিকার ঘাট আছে। আমাদের ছোকরা পাণ্ডা বলিল যে এখানেও শ্রাদ্ধ করা উচিত। আমি তাহাতে রাজি হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে শ্রাদ্ধ করিলাম। আমাদের পাণ্ডা অল্প বয়স্ক হওয়াতে এখানকার স্কুলের মাষ্টার তাহার হইয়া আমাকে মন্ত্র বলাইল। শ্রাদ্ধ হইয়া যাইবার পর শুনিলাম যে এখানে রামস্বামী নামে একজন সাধু থাকেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমাদের পাণ্ডা আমাকে তথায় লইয়া গেল। তাঁহার আশ্রমে গেলে তাঁহার শিষ্যেরা আমাকে বসাইল, অল্প পরেই তিনি আসিলেন। লোকটির বয়স প্রায় ৬০।৬২ হইবে, পক্ক কেশ ও শশ্রু, প্রসান্ত সহাস্য বদন দেখিলেই মনে একটা স্নিগ্ধতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি অভিবাদন করাতে অল্প হাঁসিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শুনিলাম আপনি গোমুখ ও গঙ্গোত্তরী দেখিয়া আসিয়াছেন, কি দেখিলেন"? কথা হিন্দিতে হইতেছিল। তিনি "কেয়া দেখা" জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ ভাবে আমার দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন যে তাঁহার কথার জবাব আমি তখনই দিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল চলিতে চলিতে চর্ম্ম চক্ষু দিয়া যাহা দেখিয়াছি সে সকল পার্থিব পদার্থের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, আমার অন্তর আত্মা কিছু দেখিয়াছে

বা অনুভব করিয়াছে কিনা যেন সেই কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলাম "পাহাড়, নদী, ঝরণা, বরফ, ইত্যাদি অনেক জিনিস দেখিয়াছি কিন্তু আপনি যে জিনিসের কথা বলিতেছেন্ তাহা দেখি নাই"। তিনি শুনিয়া ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন "সে কি বস্তু" ? আমি বলিলাম যে "আমি শুনিয়াছি যে হিমালয়ে মহাত্মারা বাস করেন। আমার আশা ছিল যে এই পথে কোন মহাত্মার দেখা পাইব যিনি আমাকে এই জীবনের যে কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি জীবন স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, সে স্রোত কোথায় কোন সমুদ্রে গিয়া মিশাইবে, বা কি করিতে এই জীবন শ্রোতে ভাসিতেছি তাহার কিছুই জানিনা। এক কথায় জীবন এক প্রকার উদ্দেশ্য বিহীন। এ পর্য্যন্ত জীবনে যাহা ঘটিয়াছে বা করিয়াছি তাহা করিবার জন্যই যে এ জীবন এরূপ বলিয়া বোধ হয় না"। আমার কথা তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন তারপর বলিলেন যে "তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করিয়াছ। আমার বিদ্যা অতি অল্প। শাস্ত্রাদি আমি বিশেষ পড়ি নাই। তবে অনেক দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া, যাহা শিখিয়াছি তাহাতে আমি বলি,

যে মনকে এরূপ ভাবে গঠন করিতে হইবে যখন আর কোনরূপ আকাঙ্খা থাকিবে না, এবং সেইরূপ ভাবে মনকে গঠন করাই জীবনের উদ্দেশ্য"। এই সকল কথা বলিতে বলিতে লোকটির প্রশান্ত মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়া কিছু দৃঢ়তা ও তেজের আবির্ভাব হইল। লোকটি যে ভাবুক ও জ্ঞান পিপাসু তাহা বুঝিতে পারিলাম, তবে শাস্ত্রাদি কিম্বা পুস্তকাদি বিশেষ পড়া শুনা নাই। আমি বলিলাম "যাহা হউক উদ্দেশ্য ত আপনি একরূপ সহজেই বলিলেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে কি করিতে হইবে তাহা বলুন"। তিনি বলিলেন "সে উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে কঠিন সাধনার আবশ্যক" এবং জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথা কতক কতক বলিলেন। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় পাইয়া ফিরিলাম। মনে বেশ তৃপ্তি পাইলাম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সফলের কোন সহজ উপায় কিছু পাইলাম না। বোধহয় সহজ উপায় কিছু নাই। ফিরিয়া আসিয়া আমি, শৈলেন ও সতীশ ডেপুটির বাড়ী খাইতে গেলাম। বাড়ীটি ছোট, এখানে সকল বাড়ীই ছোট, শীতের প্রকোপে কেহ বিস্তৃত ঘর দালান করে না। একটি অত্যন্ত উচ্চ ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ির উপরে একটি ক্ষুদ্র দরজার মধ্য দিয়া মাথা নিচু করিয়া

আমরা একটি ক্ষুদ্র কামরায় প্রবেশ করিলাম, সেখানে আমাদের জন্য প্রস্তুত ঢালা বিছানা রহিয়াছে দেখিলাম। বিছানাটি তত পরিষ্কার নয়, তবে এ পাহাড়ী দেশে পরিচ্ছন্নতার দিকে কাহারও তত নজর নাই। ডেপুটি আমাদের জন্য নানাবিধ ভোজন সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পোলাও ও দুই চারটি তরকারি, যাহা বাংলা দেশে হয়, তাহাও ছিল। ইহা দেখিয়া বোধহয় যে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে আচার ও খাওয়া পরায় অনেক সৌসাদৃশ্য আছে ও আবশ্যক হইলে তাহাদের লইয়া একটি সম্মিলীত হিন্দু জাতি প্রস্তুত করা একেবারে অসম্ভব নয়। ডেপুটির যত্নে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। এত অল্প দিনের আলাপে বিদেশীর সহিত প্রাণ খুলিয়া এরূপ আত্মীয়তা আমি আর কোথাও দেখি নাই। সৌভাগ্যক্রমে উত্তরকাশীতে আসিয়া মুসূরী হইতে আমাদের জন্য যে টাকা পাঠান হইয়াছিল তাহা পাইয়াছিলাম ও তাহার সাহায্যে ডেপুটির পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলাম। এই দুই দিনের বন্ধু ডেপুটির নিকট বিদায় লইতে মনে যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিলাম, তারপর অপরাপর সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমি শৈলেন ও সতীশ বেলা ১১ টার সময় উত্তরকাশী হইতে ফিরিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের

একটি বাঙ্গালী ছোকরা, পূর্ব্বোক্ত দুইজনের মধ্যে একজন, প্রায় দুই মাইল আমাদের সঙ্গে আসিয়া তারপর বিদায় লইলেন। তাঁহারও মুখ দেখিয়া বোধহইল যেন এই দূর পর্ব্বতে স্বজাতি পাইয়া তিনি আমাদের উপর অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন ও আমরা চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার উদাস মনও কিছু চঞ্চল হইয়াছে। প্রায় ৬ মাইল পথ আসিবার পর আমরা যে রাস্তা দিয়া যমুনোত্তরী হইতে উত্তরকাশীর দিকে আসিয়াছিলাম তাহা পাইলাম। তাহা ছাড়িয়া আরও ৭ মাইল আসিয়া রেনাপানি নামক একস্থানে আমরা তাম্বুতে রাত্রি কাটাইলাম। রাত্রে ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের বিছানা কিছু কিছু ভিজিয়াছিল কিন্তু তাহাতে ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নাই।

১লা নভেম্বর ১৯১৪, বৃহস্পতিবার। রেণাপাণি হইতে লালুরী, প্রায় ১৩ মাইল। প্রাতে উঠিয়া যখন আমাদের চা আনিয়া দিল তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলাম, কেননা এখন একটি দিনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় আর আমাদের নাই, আর বৃষ্টিতে পথ চলাও বড় মুস্কিল। কিন্তু শীঘ্রই এক পার্শ্বে একটু নীলাকাশ দেখা গেল ও তাহার অল্প পরেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া প্রস্তুত হইয়া

চলিতে আরম্ভ করিলাম। ধরাসু পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা পাইলাম। আজিকার রাস্তা পাহাড়ের যে অংশ দিয়া গিয়াছে তাহা ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত। পথের ধারে অনেক আমলকী গাছ দেখিতে পাইলাম ও তাহা হইতে অনেক বড় বড় আমলকী সংগ্রহ করিলাম। ধরাসুর উচ্চ বাংলায় আর না উঠিয়া নীচের রাস্তা দিয়াই কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই পূর্ব্বোক্ত ৫টি আম গাছ পার হইয়া একটি ঝরণার নিকট মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য থামিলাম। এখান হইতে অল্প অগ্রসর হইয়াই আমরা ধরাসু হইতে লালুরী হইয়া যে পাকডাণ্ডি মুসূরীর নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা পাইলাম। আমরা এই পাক দাণ্ডি পথেই যাইবার স্থির করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা সংক্ষেপে হইল। যদিও এ রাস্তায় কতকগুলি বিষম চড়াই আছে তথাপি রাস্তা কম বলিয়া ইহাই আমাদের পসন্দ হইল। এ রাস্তায় যাইলে নগুন ভরলানা ইত্যাদি স্থান সকল আর আমাদের দেখিতে হইবে না। আমরা এই রাস্তায় প্রথম একটি গ্রাম ও কতকটা চসা ও সমতল ময়দান পাইলাম। সে সকল অতিক্রম করিয়া পথ নিবীড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। প্রায় ২।২॥০ মাইল উঠিবার পর আমরা একটি পাহাড়ের শিখর দেশে আসিলাম। সেখান

হইতে আমরা গঙ্গা এবং ধরাসু ও নগুনের বাংলা ও ধর্ম্মশালা দেখিতে পাইলাম। হিমালয়ে গঙ্গার সহিত এই শেষ দেখা বলিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। প্রায় ১ মাস কাল ক্রমাগত গঙ্গাকে ধরিয়া চলিয়া অবশেষে তাহার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া যেন গঙ্গার সহিত একটা আত্মীয়তা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গঙ্গার এই পর্ব্বত বাহিনী মুর্ত্তি দেখিতে হইলে এতদূর না আসিলে হইবে না। আবার এপথে আসিব কিনা এই সকল কথা মনে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভাবিবার সময় বিশেষ পাইলাম না। এখান হইতে লালুরী অনেক দূর এই কথা মনে পড়াতে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। শীঘ্রই উৎরাই আরম্ভ হইল। উৎরাইয়ের রস্তাটি বড়ই গড়ানে কেননা অতি উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে রাস্তাটি অনেকটা সোজা সুজি ভাবে পাহাড়ের গা বাহিয়া একেবারে পাহাড়ের তলস্থ এক নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। নামিতে নামিতে আজ পা ঠিক রাখা শক্ত বোধ হইতে লাগিল। অতি কষ্টে পাহাড়ী লাঠির সাহায্যে এইরূপ প্রায় ১ মাইল নামিবার পর পথ একেবারে এক নদীর ধারে আসিয়া মিশিল। নদী পাথরের উপর দিয়া পার হইবার উপায় নাই দেখিয়া আমি জুতা খুলিয়া নদী পার হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখানে এক হাঁটুর অধিক জল ছিলনা।

যমুনোত্তরী

অপর পারে গিয়া আবার চড়াই আরম্ভ হইল। উৎরাই যেমন সোজাসুজি ভাবে হইয়াছিল চড়াইও প্রায় তাহাই হইল। ৪-৩০ মিনিটের সময়ে আমরা লালুরীতে পৌঁছিলাম। একটি ছোট অপরিষ্কার গ্রাম ও কতকগুলি চসা ক্ষেত ও একটি ময়লা টিনের আটচালা ছাড়া লালুরীতে আর বিশেষ কিছু দেখিলাম না। এক ধানের ক্ষেতে তাম্বু গাড়িয়া আমরা রাত্রি যাপন করিলাম।

২রা নভেম্বর ১৯১৪, শুক্রবার। লালুরী হইতে ভবন, প্রায় ১৪ মাইল। আজ সকালে উঠিয়াই চড়াইয়ের কথা। সতীশ বলিল "প্রাণ যায় কিম্বা প্রাণ থাকে আজকের চড়াই উঠিতে পারিলেইত মুসূরী পৌঁছিলাম"। আজ চলিতে সুরু করিয়াই চড়াই পাইলাম। কিন্তু সকলেই আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উঠিতেছি, ও দম লইতেছি ও আবার উঠিতেছি। সঙ্গে লেমন ড্রপস্‌ ও আমলকী ছিল তাহা দিয়া মধ্যে মধ্যে গলা ভিজান হইতেছে। একটি পাহাড়ের উপরে আসিয়া শিকারী তামাকু সেবনের জন্য বসিল। সে বলিল যে তাহার বয়স হইয়াছে এত চড়াইয়েতে তাহার হাঁফ লাগিয়াছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আর একটি পাহাড় চড়িতে লাগিলাম ও প্রায় ১ ঘণ্টা চলিবার পর এই পাহাড়টির শিখরদেশে পৌঁছিলাম। এই পাহাড়ের

উপর প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল সমতল ভূমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। একস্থানে একটা ডোবার মত রহিয়াছে ও তাহাতে জল আছে, বোধহয় গরু বাছুরের জন্য পাহাড়ীরা এখানে জল সংগ্রহ করিয়াছে। এই সমতল ভূমি পার হইয়া আর একটি পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ হইল। এই পাহাড়টি চড়িতে পারিলেই চড়াই শেষ হয়। কিন্তু এ পাহাড়ে উঠিতে কিছু কষ্ট হইল। পাহাড়টি অত্যন্ত সোজাভাবে উঠিয়াছে তাহাতে আবার পাকদাণ্ডির উপর দেবদারু বৃক্ষের সরু সরু পাতা পড়িয়া বড় পিচ্ছিল হইয়াছে, মাঝে মাঝে পদস্খলন হইতে লাগিল। এই চড়াইয়েতে একটিও ঝরণা পাওয়া গেল না। ক্রমাগত চড়াই করিয়া আমাদের অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, সঙ্গের বোতলের জল অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছিল। জলের জন্য আমার ও আমা অপেক্ষা শিকারীরই অধিক কষ্ট হইতে লাগিল। আমার সঙ্গে লেমন ড্রপ্‌স্‌ ও আমলকী থাকার জন্য মধ্যে মধ্যে গলা ভিজাইয়া লইতে ছিলাম। শৈলেন, সতীশ ও কুলীরা অনেক পিছাইয়া ছিল। আমি ও শিকারী একত্রে অগ্রে চলিতে ছিলাম। একবার দেবদারু পাতায় পা ২।৩ হাত হড়কাইয়া যাওয়াতে পড়িয়া গেলাম ও পাহাড়ের গা বাহিয়া নিম্ন দিকে নামিতে লাগিলাম, পশ্চাতে শিকারী থাকাতে কোনমতে আট্‌কাইয়া

দিল। এখন আমরা যে স্থানে উঠিয়াছি তথা হইতে চতুর্দ্দিকের বরফের পাহাড় দেখিতে পাইলাম, ইহাদের মধ্যে কতকগুলির সহিত আমাদের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। অবশেষে আমরা এই তৃতীয় পর্ব্বতের শিখরদেশে আসিলাম। তথায় কতকটা সমতল ভূমি দেখিয়া শিকারী চিনিল যে সেটা শিকারী সাহেবদের পড়াওয়ের জায়গা। এইবার আমাদের উৎরাই সুরু হইল। কিছুদূর গিয়া পথের ধারে একটি ছোট ডোবা দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার জল ঘোলা। শিকারীর এত তৃষ্ণা পাইয়া ছিল যে জল দেখিতে পাইয়া অঞ্জলি করিয়া সেই জল পান করিতে লাগিল। ময়লা জল পান করিতে নিষেধ করাতে সে বলিল যে উহাতে খালি মাটি আছে পাহাড়ে এরূপ জল তাহাদের অনেক সময় পান করিতে হয়। যাহা হউক আরও কিছু পরে একটি পরিষ্কার জলের ঝরণা দেখা গেল। সেই জলে আমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় ২০ মিনিট পরে তাহারা উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা ক্রমাগত নামিতে লাগিলাম, সকালের সেই ভীষণ চড়াই অপেক্ষা যেন এই উৎরাই ভীষণতর বোধ হইল। ক্রমাগত নামিতে নামিতে পায়ের হাঁটু ব্যথা হইল কিন্তু উৎরাইয়ের আর শেষ নাই।

প্রায় ১।৷০ ঘণ্টার পর আমরা একটি ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া নামিতে লাগিলাম। গ্রামটি অত্যন্ত অপরিষ্কার ও গোময় পূর্ণ। গ্রামটির নীচে আমরা একটি নদী পাইলাম ও তাহার কিনারা দিয়া প্রায় ২ মাইল চলিবার পর একস্থানে আসিলাম যেখানে নদীটি দুই দিকের উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে নদীর এক কিনারে সকল সময় রাস্তা না পাওয়াতে নদীটি আমাদের ৫।৬ বার পারাপার করিতে হইল। অবশেষে নদীর পারে আবার রাস্তা পাইলাম। হঠাৎ পাহাড়ের উপর হইতে চিৎকার শুনিয়া চাহিয়া দেখি যে আমাদের কুলীরা বহু উচ্চে পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নদীর ধারে একটি প্রস্তরের মন্দির দেখিতে পাইলাম, মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকাতে ভিতরে কি আছে দেখিতে পাইলাম না। এই স্থানের নাম ভবন, আজ আমাদের এই স্থানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। কিছুদূরে পর্ব্বত গাত্রে কতকগুলি ঘর দেখিতে পাইলাম, শুনিলাম উহারই একটি ধর্ম্মশালা। কিন্তু আমরা একটি সমতল ক্ষেত দেখিয়া সেই স্থানেই তাম্বু গাড়িলাম।

৩রা নভেম্বর ১৯১৪, শনিবার। ভবন হইতে মুসূরী প্রায় ১৪ মাইল। আজ আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে প্রাতঃকালেই প্রস্তুত হইয়া চলিতে লাগিলাম। আজই আমাদের চলার শেষ। প্রায় ১ মাস

৫ দিন পরে আজ আবার বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখিব, আজ মুসূরী ফিরিব। প্রথমে নদীর ধারে ধারে ধান-ক্ষেতের উপর দিয়া প্রায় ২ মাইল চলিবার পর একটি চড়াই পাইলাম। এই চড়াইও প্রায় ১।১॥০ মাইল হইবে। তার পর পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া কতক সমতল রাস্তা পাইলাম। এইরূপ রাস্তায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল চলিবার পর রাস্তা আবার নামিয়া একটি নদীগর্ভে গিয়া মিশিল। নদী পার হইয়া আবার চড়াই আরম্ভ হইল। আজ আমি একাই অগ্রে চলিয়াছি আর সকলেই পশ্চাতে। চড়াই আরম্ভ হইয়া এক এক স্থানে অতি খারাপ রাস্তা পাইলাম। এক স্থানে রাস্তা অতি সোজা ভাবে উঠিয়াছে, তথায় এঁটেল মাটিতে জল পড়িয়া পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছে, উপরে উঠিবার সময় পা ক্রমাগত পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। এখন আমি পাহাড়ের এক নিম্নস্তর দিয়া যাইতেছিলাম। সম্মুখে একটি উচ্চ পাহাড়। আমি যে পাহাড়ে চলিতেছিলাম ও অপর পাহাড়ের মধ্যে এক বিস্তৃত উপত্যকা। আমি যত উচ্চে উঠিতে লাগিলাম অপর দিকের পাহাড় তত নিকটে বোধ হইতে লাগিল। বহুদূরে ও নিম্নে উপত্যকায় কতকগুলি সাদা তাম্বু দেখিয়া বুঝিলাম মুসূরীর নিকট আসিয়াছি, বোধহইল কোন সাহেব শিকারে আসিয়া নীচে তাম্বু গাড়িয়া আড্ডা করিয়াছে।

আজিকেও চতুর্দ্দিককার পাহাড়ের দৃশ্য, অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু আজ পাহাড়ের শোভাতে মন তত আকৃষ্ট নহে। এই পাকডাণ্ডি গিয়া কোথায় মুসূরীর রাস্তার সহিত মিলিয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যস্ত। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলাম আমি যে পথে চলিয়াছি সেই পথই একটি পাহাড়ের স্কন্ধ দেশ দিয়া সম্মুখের পাহাড়ে উঠিয়াছে ও ক্রমিক উচ্চে উঠিয়া পাহাড়ের একটি ফাঁক দিয়া কোথায় গিয়াছে ঠিক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ঐ পাহাড়ের ফাঁকটি দেখিয়াই আমার বোধহইল যে ঐখানেই এই পাকদাণ্ডিটি গিয়া মুসূরীর রাস্তায় মিশিয়াছে। আমি তাই আরও জোরে চলিতে লাগিলাম। যদিও এখন বেলা প্রায় ১।১॥০ বাজিয়াছিল তথাপি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অপেক্ষা করিলাম না, ইচ্ছা পাকদাণ্ডির রাস্তা শেষ করিয়া একেবারে মুসূরীর রাস্তায় উঠিয়া সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিব। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক হইল। পাকদাণ্ডি ঘুরিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের ফাঁকটির নিকট মুসূরীর রাস্তায় আসিয়া মিশিল। এই রাস্তা পাইয়া মনে হইল এখন মুসূরী পৌঁছান নিশ্চিৎ। পাক-দাণ্ডিটি একটি মুদীর দোকানের পাশ দিয়া উঠিয়াছে। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখান হইতে যে পথে আসিলাম সে

পথ ও উপত্যকা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। রাস্তায় বসিবার কোন স্থান দেখিতে না পাইয়া দোকানদার মুদীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহার দোকানে চাল ডাল ইত্যাদি তৈজস্ ছাড়া কতকগুলি প্রাচীন ক্ষীরের পেড়া ছিল। বেলা প্রায় ২টা বাজিয়াছিল কাজেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। একটি পেঁড়া কিনিয়া খাইব মনে করিলাম কিন্তু তাহা খাইতে পারিলাম না। তাহাতে প্রায় ইংরাজী চীজ্ বা পনীরের ন্যায় গন্ধ হইয়াছিল। প্রায় হতাশ হইয়া দোকানের এক অংশে বসিলাম। দোকানদার একটি বেনিয়া ছোকরা, সে বোধহয় আমার কষ্ট কতকটা বুঝিতে পারিল। বলিল যে তাহার নিকট এক উত্তম খাবার জিনিস আছে এবং তার দোকানের এক স্থান হইতে একটি শুষ্ক নারিকেল বাহির করিল। নারিকেলটি আস্ত ছিল, উপরের খোলা ছাড়ান। আমি চারি আনা দিয়া নারিকেল কিনিলাম ও ছোট ছুরী দ্বারা নারিকেলটি কাটিয়া খাইতে লাগিলাম। নারিকেলটি পাকিয়া শুখাইয়া অত্যন্ত মিষ্ট হইয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া প্রায় নারিকেলের অধিকাংশ শেষ করিলাম, কিন্তু সঙ্গীদের এখনও দেখা নাই। আমি এখানে আসিবার পর প্রায় ১ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে তথাপি

তাহারা উপস্থিত হইলনা দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলাম। কিছু দূর নামিয়া গিয়া তাহারা আসিতেছে কিনা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে মনে একটু চিন্তিত ও বিরক্ত হইলাম। চিন্তিত বিপদ আশঙ্কা করিয়া, আর বিরক্ত যদি তাহারা অকারণে দেরী করিয়া থাকে। বিরক্ত হইবার আর একটি কারণ মুসূরীর এত কাছে আসিয়া মিছামিছি এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে মুসূরী এখান হইতে ৬ মাইল। আমি যতক্ষণ এই দোকানে অপেক্ষা করিতেছিলাম ততক্ষণ মুসূরী পৌঁছিয়া যাইতাম। একবার ভাবিলাম মুসূরী চলিয়া যাই, হয়ত সেখানে ফণী ও সত্যেনের সহিত দেখা হইবে, কিন্তু শেষ পথটুকু সকলে একত্র যাইব ঠিক করিয়াই বসিয়া রহিলাম। বেলা প্রায় ৩॥০ বাজিলে আবার নীচে গিয়া পাহাড়ের এক উচ্চ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার নিকট দুইটি পাহাড়ী লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা আমার মত কোন্ পথিককে দেখিয়াছে কিনা। তখন তাহারা বহু নিম্নে উপত্যকায় এক পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। আমি প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরে অনেক মনোযোগ

করিয়া দেখাতে বহু নিম্নে পর্ব্বত গাত্রে ছোট ছোট কতকগুলি মনুষ্য নড়িতেছে দেখিতে পাইলাম। দুই একবার জোরে ডাক দিলাম কিন্তু কোনই সাড়া পাইলাম না। সেইখানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহারা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল ও প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নিকটস্থ হইলে দেখিতে পাইলাম আমাদেরই দল। সতীশচন্দ্র দীর্ঘ পাহাড়ী লাঠি হস্তে আস্তে আস্তে উঠিতেছে পরে শৈলেন ও অপর সকলে উঠিতেছে। আমি যে রাস্তায় আসিয়াছিলাম তাহারা ঠিক সে রাস্তায় না আসিয়া একটি নীচের রাস্তা দিয়া আসিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নে আমার মেজাজটি অত্যন্ত গরম হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিরাপদে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ইচ্ছা হইল তাহাদের দু কথা শুনাইয়া দি। কিন্তু আমাকে দেখিয়া আমি কিছু বলিবার আগেই সতীশ আমারই উপর বাক্যবাণ ছাড়িয়া দিল, বলিল "এই যে দিব্য জ্যান্ত রহিয়াছ। আমারা ঠিক করিয়াছিলাম যে কোথাও খদে পড়িয়া আছ। বৃথা তোমায় অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। এমনকি সেইজন্য আজ ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই"। এই খাওয়ার কথা শুনিয়া আমি আমার রুদ্ধ বাক্যবাণ ছাড়িয়া দিলাম। যাহা হউক কিছুক্ষণ বচসার পর আমরা সকলে মুসূরী অভিমুখে চলিলাম।

প্রায় ১॥০ ঘণ্টা চলিবার পর আবার মুসূরীর পরিচিত দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা পূর্ব্বোক্ত বন্ধু বর্গের মুসূরীস্থ বাটিতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন আমরা দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শুনিলাম ফণী ও সত্যেন একদিনও অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার আগে আমারা শিকারী ও বয়টিকে এক একখানি সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দিলাম। শিকারী তাহার দেশের ঠিকানা আমাকে দিয়া বলিল "যদি এপথে আর আসেন ত আমাকে খবর দিবেন"। তাহাদের বিদায় দিতে কষ্ট হইতে লাগিল। এক মাসের উপর গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর দুর্গম পথে তাহারা আমাদের সঙ্গী ছিল, আমাদের সঙ্গেই পথের সকল রকম কষ্ট ও বিপদ সহ্য করিয়াছে এবং বিনা ওজর আপত্তিতে আমাদের কার্য্য করিয়াছে। এই দুইটি সঙ্গীই আমাদের বেশ মনোমত হইয়াছিল ও শিকরী সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। মনে হইল জীবনের দুর্গম পথে এরূপ সঙ্গী পাইলে জীবন যাত্রা অনেক লাঘব হইবে। আমাদের অপর কুলীরা রাজপুর পর্য্যন্ত আমাদের জিনিস পত্র লইয়া আসিল। সেইখানেই তাহাদের পাওনা ও বকসিস্ চুকাইয়া লইয়া আমাদের নিকট বিদায় লইল। এই সকল কুলীও বেশ নির্ব্বিবাদী ও কার্য্যক্ষম

ছিল। ইহাদেরও ছাড়িতে প্রাণে যেন একটু কষ্ট হইল। এইখানে আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিলাম। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দেখিয়া হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থস্থান দেখিবার ইচ্ছা রহিল কিন্তু সে ইচ্ছা কখনও সম্পূর্ণ হইবে কিনা তাহা কে বলিবে।

সম্পূর্ণ।